জান্নাত লাভের সহজ আমল

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সহীহ্ হাদীস অবলম্বনে

জান্নাত লাভের সহজ আমল

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ০২-৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯

সহীহ্ হাদীস অবলম্বনে
জান্নাত লাভের সহজ আমল

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ রাফীক বিন সাঈদী

অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল

প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ [illegible], মোবাইল ঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর-২০০৭

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ নাবিল কম্পিউটার
৫৩/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ ঃ মশিউর রহমান

মুদ্রণ ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ ২০০ টাকা মাত্র।

Sohih Hadis Obolambone Zannat Laver Shahoz Amol: Moulana Delawar Hossain Sayedee. Co-operated by Rafeeq bin Sayedee. Copyist : Abdus Salam Mitul. Published by Global publishing Network, Dhaka. 1st Edition: July 2007. 2nd Edition: December 2007. Price: 200 TK, Only in BD. 7 Doller in USA. 5 Pound in UK.

উ|ৎ|স|র্গ

আমার জীবন গড়ার পেছনে যাঁর স্নেহ-মমতা, বুকভরা প্রত্যাশা
এবং আল্লাহর আরশ স্পর্শকারী দোয়া ছিলো সর্বাধিক
আমার সম্মানিত পিতা
হযরত মাওলানা ইউসুফ সাঈদী (রাহঃ)
এর জান্নাতুল ফিরদাউস লাভের কামনায়।

পূর্বাভাষ

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ-

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ দোয়া ইবাদাতের মগজ। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ দোয়া নিজেই ইবাদাত। অর্থ বুঝে আন্তরিকতার সাথে একাগ্রচিত্তে দোয়া করলে বা আল্লাহ তা'য়ালার যিক্‌র করলে 'কালব' বা অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ, অন্তরে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি মুহাব্বাত, নির্ভরতা ও ভীতির সৃষ্টি হয়। আর অন্তর পরিশুদ্ধ হলে ব্যক্তির আচরণ, কর্মপদ্ধতি পরিশীলিত ও মার্জিত হয়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ-

নিশ্চয়ই মানুষের শরীরে এক টুকরা মাংস পিন্ড রয়েছে, যেটি পরিশুদ্ধ হলে গোটা শরীর ভালো হয়, আর সেটি বিনষ্ট হলে গোটা শরীর বিনষ্ট হয়। জেনে রাখো, সে মাংস পিন্ডটি হচ্ছে 'কালব' বা হৃদপিন্ড। (বোখারী, মুসলিম)

মানুষের গোটা শরীরে হৃদপিন্ডের অবস্থান ছোট হলেও মূলতঃ সে-ই গোটা শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর রাজত্ব চালায়। যেমন হৃদয় কৃপণ হলে হাত খরচ করে না, আবার মন উদার হলে হাত জনসেবায় দারাজ হয়ে যায়। আবার মন যদি হারাম থেকে বাঁচতে চায় তাহলে হাত অবৈধ অর্থ গ্রহণ করে না, মদ ও পর নারী স্পর্শ করে না, পা হারাম পথে চলে না, চোখ হারাম ও অশ্লীল দৃশ্য অবলোকন করে না, কান পরনিন্দা বা অশ্লীল গান ও অশ্রাব্য কথন শ্রবন করে না, তার জিহ্বা অসত্য বলা, গাল-মন্দ করা ও হারাম-আস্বাদন থেকে বিরত থাকে। অন্য দিকে এই মনের মধ্যে আল্লাহভীতি না থাকলে মন অসুস্থ ও পঙ্কিল হয়ে যায়। ফলে ব্যক্তির আচরণ ও চরিত্রে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য।

পক্ষান্তরে হাদীসে বর্ণিত ঐ মাংস পিন্ডকে 'কালব' দিল, মন বা হৃদপিন্ড যে নামই বলিনা কেনো একে পরিশুদ্ধ করতে পারলেই গোটা জীবন হবে পরিশুদ্ধ। আর এই মাংস পিন্ড তথা 'কালব' পরিশুদ্ধ করার একমাত্র হাতিয়ার আল্লাহ তা'য়ালার যিক্‌র বা আল্লাহর স্মরণ। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ- (رواه البخارى)

শয়তান আদম সন্তানের কালবের ওপর জেঁকে বসে থাকে। সে যখন আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে তখন শয়তান সরে যায়। আর যখন সে আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী হয় তখন শয়তান তার মনে কুমন্ত্রণার বীজ বপন করতে থাকে। (বোখারী)

সুতরাং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি মুহাব্বাত ও আনুগত্যপূর্ণ জীবন-যাপনের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌ তা'য়ালার যিক্‌র-ফিকিরে থাকা মুমিন ব্যক্তির সার্বক্ষণিক দায়িত্ব।

মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সর্বশেষ গন্তব্যস্থল দু'টি, জান্নাত অথবা জাহান্নাম। জান্নাতের অফুরন্ত ও অকল্পনীয় শান্তি এবং জাহান্নামের অবর্ণনীয় ভয়ঙ্কর পীড়াদায়ক শাস্তির কথা পবিত্র কোরআন-হাদীসে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের জন্য নবী করীম (সাঃ) যথেষ্ট দোয়া ও আমল শিখিয়েছেন। অথচ টিভির অর্থহীন অনুষ্ঠান দেখে, ভালো কিছুই শেখার নেই এমন সব রোমান্টিক গল্প-উপন্যাস ও সাহিত্য-কবিতা পড়ে এবং অশ্লীল ছবি দেখে, চায়ের আড্ডায় অনর্থক গল্প-গুজব করে মানুষের জীবনের মূল্যবান সময়গুলো বহমান নদীর স্রোতের মতোই চলে যাচ্ছে।

অথচ এ মহামূল্যবান সময় আমরা জান্নাত লাভের সুমহান কাজে লাগাতে পারি। এ উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখেই **'জান্নাত লাভের সহজ আমল'** বইটি পবিত্র কোরআন-হাদীস দিয়ে মণি-মুক্তার মালার মতো সাজানো হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌ তা'য়ালার অনুগ্রহে নবী করীম (সাঃ) নিঃসন্দেহে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স্থান লাভ করবেন। তিনি তাঁর উম্মতদেরকে সে চীরস্থায়ী সুখের আবাস জান্নাত লাভের জন্য অসংখ্য দোয়া ও আমল শিক্ষা দিয়েছেন। যেমনঃ–

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সকল প্রকার কল্যাণ কামনা করি, সেটা দ্রুত হোক অথবা বিলম্বে, যে বিষয় আমি জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত। হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই, সেটা দ্রুত হোক অথবা বিলম্বে, যে বিষয় আমি জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত।

হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার কাছে ঐসব কল্যাণ কামনা করি যেসব কল্যাণ কামনা করেছেন তোমার নবী (সাঃ) এবং ঐসব অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যেসব অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন তোমার নবী (সাঃ)।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাতের প্রার্থনা করি এবং এমন সব কথা ও কাজের যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিবে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই এবং এমন সব কথা ও কাজ থেকে যা জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দিবে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দরখাস্ত করছি, তুমি আমার জন্য যে ভাগ্যলিপি তৈরী করেছো, তা তোমার একান্ত অনুগ্রহে আমার জন্য কল্যাণকর করে দাও। (সুনানু ইবনু মাজাহ্, হাদীস নং-৩১০২)

এ ধরণের বহু-সংখ্যক দোয়া ও আমল এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রয়োজন শুধু মনোযোগ সহকারে পড়া এবং আমল করা। শুধু দোয়া-দরুদ আমল করেই অফুরন্ত সুখ-শান্তির আবাসস্থল জান্নাতে যাওয়া যাবে না। জান্নাতে যেতে হলে একই সাথে বাস্তব জীবনে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করতে হবে, সে কথাগুলোও কোরআন-হাদীসের দলীলসহ অত্র গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

অত্র গ্রন্থ রচনায় যাঁদের লেখা কিতাবাদী থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন।

এ গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে সংযুক্ত আরব আমীরাতের আবুধাবীতে বসবাসরত চট্টগ্রামের অধিবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মুহাম্মাদ আলী তাঁর সম্মানিত পিতা-মাতার সুস্বাস্থ্য ও ঈমান সমৃদ্ধ দীর্ঘ হায়াত কামনায় আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁদের জন্য দুনিয়া-আখিরাতের সাফল্য কামনা করছি।

পরিশেষে আবার শুরুর কথায় ফিরে যেতে চাই, 'কালব' বা মনকে প্রশান্ত ও পরিশুদ্ধ করার জন্য এবং সেভাবে উন্নত চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে পবিত্র কোরআন-হাদীস অবলম্বনে রচিত অত্র গ্রন্থটি পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনদের জন্য জান্নাত লাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে কোরআন-হাদীস অনুযায়ী সুন্দর জীবন গঠনের তাওফীক দান করুন।

আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহের একান্ত ভিখারী

সাঈদী

আলাফাত মনজিল

৯১৪ শহীদবাগ

ঢাকা

সহীহ্ হাদীস অবলম্বনে

জান্নাত লাভের সহজ আমল

বইটি প্রকাশের জন্য সহযোগিতা করেছেন

বায়তুশ্ শরফ মসজিদ বাড়ি, সীতাকুন্ড

চট্টগ্রাম নিবাসী

জনাব আলহাজ্জ নূরুল আলম

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ জন্যে তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

পৃষ্ঠা	আলোচিত বিষয়
	প্রথম অধ্যায়
১৩	নিয়তের বিশুদ্ধতাই আমল কবুলের প্রথম শর্ত
১৫	সৎকাজের ভিত্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি
১৭	নেক আমলের ফযিলত
২৪	নেক কাজের নগদ প্রাপ্তি
২৬	নেকীর পাল্লায় ওজন বৃদ্ধির পাঁচটি সহজ নেকী
২৭	সবসময় আল্লাহকে স্মরণে রাখা উত্তম ইবাদাত
২৯	আল্লাহর আনুগত্যই যিক্‌র এর প্রকৃত অর্থ
৩১	মহাবিশ্বের সকল অনু-পরমাণু আল্লাহর যিক্‌র করে
	দ্বিতীয় অধ্যায়
৩৩	দোয়ার আদব ও কবুলের শর্ত
৩৭	আল্লাহর কাছে দোয়া করা বান্দার অবশ্যই কর্তব্য
৪১	দোয়া ও তাকদীর সম্পর্কে যা না জানলেই নয়
৪৫	দোয়া জান্নাতের চাবি
৪৯	ইবাদাত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর-ই জন্যে
	তৃতীয় অধ্যায়
৫১	পাক-পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক
৫২	অযু অবস্থায় থাকার মধ্যে অসীম কল্যাণ
৫৮	দুনিয়া-আখিরাতে অযুর জন্যে ১৪টি নে'মাত
৫৯	সকল সমস্যার সমাধানে নামাজের অবদান
৬২	যুহরের চার রাকাআত সুন্নাত নামাজের ফযিলত
৬৭	জামায়াতে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব
৭১	জামায়াতবদ্ধ নামাজ কবুলের শর্ত
৭৪	জুমুআ'র নামাজের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ আদব
৭৬	বিলম্বে এসে প্রথম কাতারে বসার চেষ্টা নিন্দনীয়
৭৮	তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়কারীর মর্যাদা
৮০	একাগ্রতা ও একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায় করা

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

নিয়তের বিশুদ্ধতাই আমল কবুলের প্রথম শর্ত

ইখলাস্ আরবী শব্দ এবং এ শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় ক্ষেত্র বিশেষে এ শব্দটি আন্তরিকতা, ঘনিষ্ঠতা, অন্তরঙ্গতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইসলামী শরীয়াতে 'ইখলাস' শব্দটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (রাহঃ) ইখলাস শব্দ সম্পর্কে লিখেছেন-

تَدُلُّ عَلٰى تَنْقِيَةِ الشَّيْءِ وَتَهْذِيْبِهِ وَالْخَالِصُ كَالصَّافِيْ-

"কোনো বস্তুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তার প্রকৃত গুণ-বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত করা এবং খালেস শব্দের মধ্যেই এই ভাবধারা নিহিত রয়েছে।" (মুফরাদাত, পৃষ্ঠা নং- ১৫০)

এক কথায় ইখলাস এর অর্থ হলো, নিজের সকল কাজ শুধু মাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই আঞ্জাম দেয়া। যে কাজের মধ্যে সামান্যতম প্রদর্শনেচ্ছা, মিথ্যার আশ্রয়, নাম-যশ, খ্যাতি, প্রশংসা অর্জনের ইচ্ছা, বিখ্যাত বা প্রসিদ্ধ হবার আকাঙ্খা ইত্যাদির গন্ধও থাকবে না। নেকীর কাজ করার মধ্যে যদি কোনো ধরণের প্রদর্শনেচ্ছা, প্রশংসা অর্জন বা বিখ্যাতি হবার আকাঙ্খা, যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা জড়িত থাকে তাহলে সে কাজ করার শ্রমই বৃথা যাবে এবং তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এ ধরণের নেকীর কাজ মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হবার যোগ্য নয়।

ইসলামী চিন্তাবিদগণ যে কোনো নেকীর কাজ কবুল হবার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি শর্তের বিষয় উল্লেখ করেছেন, সে তিনটি শর্ত হলো-

(১) মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান।

(২) কেবলমাত্র আল্লাহরই প্রতি একনিষ্ঠতা বা আন্তরিকতা।

(৩) আনুগাত্য পরায়ণতা অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ)-এর আনুগত্য করা।

অর্থাৎ নেকীর কাজ যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, তাঁর প্রতি অবিচল বিশ্বাস থাকতে হবে। নেকীর কাজটি কেবলমাত্র তাঁকেই সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করতে হবে এবং সেই নেকীর কাজটি নবী করীম (সাঃ) যেভাবে করেছেন সেভাবেই করতে হবে।

কাজের মধ্যে নিয়তের বিশুদ্ধতা অবশ্যই থাকতে হবে। রাইসুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বোখারী (রাহঃ) তাঁর সঙ্কলিত বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ 'সহীহ্ আল বোখারীর প্রথমেই এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন–

انَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَانَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَانَوى–

"সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়ত অনুযায়ী হবে, আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই লাভ করবে যে জিনিসের সে নিয়ত করবে।" (বোখারী, হাদীস নং-১)

আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

انَّ اللّٰهَ لاَيَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ الاَّمَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتَغى بِهٖ وَجْهُهُ– (احمد)

"আল্লাহ্ তা'য়ালা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো নেকীর কাজ কবুল করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত কাজটি কেবলমাত্র আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত না হবে।" (মুসনাদে আহ্মাদ, চতুর্থ খন্ড, হাদীস নং-১২৬)

ইমাম ফুযায়েল ইবনে আয়ায (রাহঃ) বলেছেন–

انَّ الْعَمَلَ اِذَا كَانَ خَالِصًاوَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ، وَاِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًالَمْ يُقْبَلْ حَتّٰى يَكُوْنَ خَالِصًا صَوَابًا، اَلْخَالِصُ اَنْ يَكُوْنَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّوَابُ اَنْ يَكُوْنَ عَلَى السُّنَّةِ–

"কোনো নেকীর কাজ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবে করা হয়েছে, কিন্তু সে নেকীর কাজটি ইসলামী শরীয়াত তথা নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থা অনুসারে করা হয়নি, সে নেকীর কাজ কবুল হবার যোগ্য নয়। আবার কোনো নেকীর কাজ ইসলামী শরীয়াত তথা নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থা অনুসারেই করা

হয়েছে, কিন্তু সে নেকীর কাজ একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে আন্তরিকতার সাথে করা হয়নি সে নেকীর কাজও কবুল হবার যোগ্য নয়। ঠিক এ কারণে নেকীর কাজ কবুল হবার জন্যে একনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা থাকতে হবে এবং তা হতে হবে নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থা অনুসারে। আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার অর্থ হলো, কাজটি হতে হবে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং রাসূল (সাঃ) এর দেখানো পদ্ধতি অনুসারে।" (মাদারেজুস সালিকীন, ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রাহঃ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৩)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রাহঃ) ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে আল জুনাইদ (রাহঃ)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি উল্লেখ করেছেন–

اَلْاِخْلَاصُ سِرٌّ بَيْنَ اللّٰهِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ لَا يَعْلَمُهُ مَلَكٌ فَيَكْتُبَهُ وَلَا شَيْطَانٌ فَيُفْسِدَهُ وَلَا هَوًى فَيُمِيْلَهُ–

"ইখলাস এর অন্তর্নিহিত মর্ম হলো, যা কেবলমাত্র মহান আল্লাহ ও তাঁর বান্দার সাথেই সম্পর্কিত। যা শুধুমাত্র বান্দার হৃদয়ের গোপন কুঠুরিতেই সৃষ্টি হয়। বান্দার হৃদয়ের একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে ফিরিশ্তাও জানতে পারে না বিধায় তাঁরা এ সম্পর্কে আমলনামায় কিছুই লিখতে পারে না। শয়তানও এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনা, এ কারণে সে এর ক্ষতি করতে পারে না। এটা নিজের প্রবৃত্তির আকাংখার সাথেও সম্পর্কিত নয়, যা একে প্রবৃত্তির দিকে আকর্ষণ করতে পারে।" (মাদারেজুস সালিকীন, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৫)

সৎকাজের ভিত্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সৎকাজ কবুল হবার গুরুত্বপূর্ণ যে তিনটি শর্ত রয়েছে এর মধ্যে প্রথম শর্তই হলো ঈমান ও তাওহীদ। তাওহীদের সহজ-সরল অর্থ হলো মহান আল্লাহর দাসত্ব তথা ইবাদাত এমনভাবে করতে হবে, যার ভিত্তিই হবে কেবলমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি। কারণ যারা শির্ক করে তাদের ইবাদাত এবং কোনো ধরণের সৎকাজ কবুল হবে না, কারণ শির্ককারীর পক্ষে মুক্তি পাওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা নিসার ৪৮ নং আয়াতে বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ–

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ কখনো সে গুনাহ্ ক্ষমা করবেন না যেখানে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হয়, এ ছাড়া অন্য সকল গোনাহ্ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।"

যে ব্যক্তি আখিরাতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হবে বলে বিশ্বাস করে, আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে সওয়াবের অনুসন্ধানী ও প্রত্যাশী, তাকে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের জন্যে উত্তম কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে এবং একমাত্র তাঁরই জন্যে ইবাদাত করতে হবে। তাঁর ইবাদাতের সাথে সৃষ্টির কোনো কিছুকে শরীক করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ইমাম ইবনে কাসীর (রাহঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'য়ালাই হলেন স্রষ্টা এবং রিয্‌কদাতা, তিনি আকাশকে ছাদ ও যমীনকে বিছানা বানিয়েছেন এবং নিজের সৃষ্টির প্রতি রিয্‌ক উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনিই সেই সত্তা, যাঁর ইবাদাত করা প্রত্যেক মানুষের জন্যেই একান্ত প্রয়োজন। এটা মহান আল্লাহর অধিকার যে, কেউ কোনো কিছুকেই তাঁর অংশীদার বানাবে না। কেননা তাঁর অনুরূপ কেউ-ই নেই, তাঁর সমানও কেউ নেই, তাঁর অনুরূপ সম্মান-মর্যাদার অধিকারীও কেউ নয় এবং তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তাঁর মতোও কেউ নেই, তাঁর স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিও নেই, তাঁর সহযোগী বা পরামর্শদাতাও নেই। তিনি যে কোনো ধরণের বিতর্কিত গুণ-বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত, অতি উচ্চ সম্মান-মর্যাদাসম্পন্ন মহান সত্তা।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ–

"আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে মা'বুদ বানিয়ে তার গোলামীরত অবস্থায় যে ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (বোখারী, হাদীস নং- ৪৪৯৮)

আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ–

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাথে শিরক করা অবস্থায় ইন্তেকাল করেছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

ওলামায়ে কেরাম শিরকের বিভিন্ন শ্রেণী বর্ণনা করেছেন। যেমন শির্‌ক-এ আকবার, শির্‌ক-এ আসগার, শির্‌ক-এ খুফী ইত্যাদি। পক্ষান্তরে প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে এটা অবশ্য কর্তব্য যে, তারা যে কোনো প্রকারের শিরক থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করবে এবং অপর মুসলিম ভাইকেও শিরক থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিবে। আর অন্যকে শিক্ষা দেয়া অপরের প্রতি পালনীয় প্রাথমিক কর্তব্যসমূহের মধ্যে একটি কর্তব্য।

নেক আমলের ফযিলত

নেক আমল হচ্ছে ভালো কাজ। আর কাজ হচ্ছে যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোনো না কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে সম্পন্ন করা হয়। আমরা এ গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি মানব দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালিত হয় মনের ইচ্ছায়। সুতরাং মনটাকে ভালো রাখতে পারলে গোটা দেহ ভালো পথে ভালো কাজে পরিচালিত হবে। আর মনকে ভালো রাখার সর্বোত্তম পন্থা আল্লাহ তা'য়ালার যিক্র বা তাঁর সার্বক্ষণিক স্মরণ। আল্লাহ তা'য়ালার জন্য নিবেদিত সকল ইবাদাতই শর্তযুক্ত। যেমন নামাজের জন্য শারীরিক পবিত্রতা অর্জন শর্ত, পোষাক-পরিচ্ছদ, নামাজের স্থান ও সঠিক সময়, কিবলা মুখী হওয়া ইত্যাদি নামাজ আদায়ের পূর্বশর্ত। অনুরূপ রোজা, যাকাত ও হজ্জ প্রত্যেকটি ইবাদাতই বিভিন্ন ধরণের শর্তযুক্ত। কেবল মাত্র 'যিক্রুল্লাহ্' আল্লাহর যিক্র এমন এক ইবাদাত যার জন্য দৈহিক পাক-নাপাকী, স্থান বা সময়ের কোনো শর্ত নেই। যে কোনো অবস্থায় যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে আল্লাহর যিক্র করা যায়। এই নেক আমলটি এ জন্যই শর্তহীন করা হয়েছে যেনো সর্বক্ষণ বান্দার মনে ও মুখে আল্লাহর যিক্র বা স্মরণ চালু থাকে। তাহলে বান্দার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালো কাজে উৎসাহিত হবে এবং মন্দ কাজ করতে তার অন্তর তাকে বাধা প্রদান করবেই। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً– هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا–

"হে মুমীনগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করো এবং সকাল সন্ধ্যায় তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো। (এর ফল এই হবে) যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর করুণা বর্ষণ করবেন এবং ফিরিশ্তারা তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে দোয়া করবেন। এরই ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তোমাদেরকে (জাহিলিয়াতের) অন্ধকার থেকে বের করে (ইসলামের) আলোক উজ্জ্বল পথে পরিচালিত করবেন। তিনি মুমীনদের প্রতি বড়ই মেহেরবান।" (সূরা আহ্যাবঃ ৪১-৪৩)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেছেন–

رِجَالٌ، لَّاتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ

وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ–

"যারা ব্যবসায় ও বেচা-কেনার মধ্যেও আল্লাহর স্মরণ, নামাজ কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল হয়ে যায় না, তারা সেদিনকে ভয় করতে থাকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টিশক্তি ভীত বিহব্বল হয়ে পড়বে।" (সূরা নূরঃ ৩৭)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলেছেন–

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ–

"অতঃপর যখন নামাজ শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা (কাজ-কর্মে) পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিয্ক) অনুসন্ধান করো আর আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।" (সূরা জুমুয়াঃ ১০)

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ–

"হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদী যেনো কখনো তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে দেয়, (কারণ) যারাই এমন কাজ করবে তারা চরম ক্ষতিগ্রস্থ হবে।" (সূরা মুনাফিকুনঃ ৯)

আল্লাহ তা'য়ালা মুমিন পুরুষ ও নারীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন–

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ، اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا–

"সর্বোপরি আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, নিঃসন্দেহে এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার ঠিক করে রেখেছেন।" (সূরা আহ্যাবঃ ৩৫)

সার্বক্ষণিকভাবে মহান আল্লাহকে স্মরণ করার তাগিদ দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদেরকে বলেছেন–

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خُيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ-

"তোমার রবকে স্মরণ করো মনে মনে, সকাল-সন্ধ্যায়, স্ববিনয়ে ও সশংকচিত্তে, অনুচ্চ স্বরের কথা-বার্তা দিয়েও তাঁকে তুমি স্মরণ করো, কখনও তাঁর স্মরণ থেকে অমনোযোগী হয়ো না।" (সূরা আল আ'রাফঃ ২০৫)

মহান আল্লাহ্‌র যিক্র ঈমানদারদের হৃদয়ে প্রশান্তি বয়ে আনে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ، اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ-

"যারা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনে আল্লাহ্‌র যিক্‌রেই তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়, আর জেনে রাখো কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র যিক্রই অন্তরসমূহ প্রশান্ত করে।" (সূরা আল আ'রাফঃ ২৮)

পবিত্র কোরআন মজীদে আল্লাহ্‌র স্মরণ তথা আল্লাহ্‌র যিক্র সংক্রান্ত এরূপ বহু সংখ্যক আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এ সম্পর্কিত সকল আয়াত একত্রিত করা সম্ভব হলো না।

নবী করীম (সাঃ) দিনে-রাতে, নামাজের মধ্য, নামাজ শেষে, ওঠায়-বসায়, চলায় বলায়, শোকে-আনন্দে, সুখে-দুখে, সঙ্কটে-স্বস্তিতে জীবন পরিচালনার এমন কোনো মুহূর্ত ছিলো না যখন তিনি আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত থাকতেন। তিনি নিজে যেমন আল্লাহ্‌র যিক্‌রের গুরুত্ব দিতেন, অনুরূপ উম্মতকেও আল্লাহ্‌র যিক্র তথা নেক আমলের প্রতি সব সময় উৎসাহিত করতেন এবং যিক্র থেকে গাফেল থাকা ব্যক্তিদের সতর্কবাণী শোনাতেন। এখানে আমরা তেমন কিছু হাদীস উদ্ধৃত করছি।

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ

وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلاَءٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلاَءٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِنْ اَتَانِى يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً– متفق عليه

"হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমি আমার বান্দার বিশ্বাসের অনুরূপ হয়ে থাকি। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যখন সে আমাকে কোনো মজলিশে স্মরণ করে আমি তখন তাকে তার থেকে উত্তম মজলিশে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে আমি তখন তার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। সে যদি আমার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে আসে আমি তখন তার দিকে তার দুই বাহুর প্রশস্ততার পরিমাণ এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে (আমার রহমত) দৌড়ে যাই।" (বোখারী, হাদীস নং-৭৪০৫, মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭৫)

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ طُوْبٰى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَاوَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِاللّٰهِ–

"হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন বুসরিন (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে জানতে চাইলেন, উত্তম মানুষ কে? জবাবে নবী করীম (সাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছে আর সে নেক আমল করেছে। লোকটি পুনরায় জানতে চাইলো, কোন্ নেক আমল সব থেকে উত্তম? নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি যখন দুনিয়া থেকে চলে যাবে তখন আল্লাহর যিক্রে তোমার জিহ্বা সিক্ত থাকবে।" (আহ্মাদ, তিরমিযী)

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর যিক্রের অভ্যাস থাকা না থাকা জীবিত ও মৃত মানুষের তুল্য।

وَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِىْ لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ– (متفق عليه)

"হযরত আবি মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার রবের যিক্র করে আর যে ব্যক্তি করে না তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়।" (বোখারী, মুসলিম)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُكْثِرِ الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِّلْقَلْبِ وَاِنَّ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِىُّ (الترمذى)

"হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র যিক্র ব্যতীত অন্য কথা বেশী বলো না, কারণ আল্লাহ্র যিক্র ছাড়া অন্য কথা বেশী বললে হৃদয় কঠিন হয়ে যায়। আর কঠিন হৃদয় ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে বেশী দূরে।"

وَ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهٖ نَزَلَتْ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْعَلِمْنَا اَىُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ فَقَالَ اَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَ قَلْبٌ شَاكِرٌ وَ زَوْجَةٌ مُّؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهُ عَلٰى اِيْمَانِهٖ– (احمد، ترمذى و ابن ماجه)

"হযরত সাওবান (রাঃ) বলেছেন, যখন স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় সংক্রান্ত আয়াত নবী করীম (সাঃ)-এর ওপর নাযিল হচ্ছিলো আমরা তখন তাঁর সান্নিধ্যে ছিলাম। একজন সাহাবী নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট জানতে চাইলো, এ কথা তো স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয়

সংক্রান্ত। আমরা যদি জানতাম কোন্ সম্পদ উত্তম তবে তা আমরা অবশ্যই সঞ্চয় করতাম। জবাবে নবী করীম (সাঃ) বললেন, আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত জিহ্বা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হৃদয় এবং মুমিনা স্ত্রী। যে স্ত্রী ঈমানের দাবী পূরণে তার স্বামীকে সহযোগিতা করে।" (আহ্মাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাযাহ্)

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ بُسْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَاَخْبِرْنِيْ اَتَشَبَّثُ بِهٖ قَالَ لاَيَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًامِّنْ ذِكْرِاللّٰهِ-

"হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন বুসরিন (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমাদের ওপর ইসলামের অনেক নফল বিধি-বিধান রয়েছে। তাই সংক্ষেপে আমাকে এমন কিছু আমল জানিয়ে দিন যা আমি সব সময় করতে পারি। জবাবে নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি সব সময় আল্লাহ্র যিক্র দিয়ে তোমার জিহ্বাকে সিক্ত রাখবে।" (তিরমিযী, ইবনু মাযাহ্)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا مَعَ عَبْدِىْ اِذَا ذَكَرَنِيْ وَ تَحَرَّكَتْ شَفَتَاهُ- (رواه البخارى)

"হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমার বান্দাহ্ যখন আমার যিক্র করে এবং আমার জন্য তার ঠোঁট নড়ে, আমি তখন তার কাছে থাকি।" (বোখারী)

নবী করীম (সাঃ) মহান মালিক আল্লাহ্ তা'য়ালার যিক্র করার তাওফীক কামনা করে এভাবে দোয়া করতেন–

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ-(ابوداؤد)

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তোমার যিক্র করার, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং তোমার ইবাদাত সঠিক ও সুন্দরভাবে আদায় করার কাজে আমাকে সাহায্য করো।" (আবু দাউদ)

মহান আল্লাহর যিক্‌রকারীর গোনাহ্ গাছের শুষ্ক পাতার মতোই ঝরে যায়।

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى شَجَرَةٍ يَابِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَ بِهَا بِعَصَاهُ فَتَنَا ثَرَ الْوَرَقُ فَقَالَ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تُسَاقِطُ ذُنُوْبَ الْعَبْدِ كَمَا يَتَسَا قَطُ وَرَقُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ-

"হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) এমন একটি গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার পাতাগুলো ছিলো শুষ্ক। তিনি তাঁর লাঠি মোবারক দিয়ে গাছটিতে আঘাত করলেন, ফলে শুষ্ক পাতাগুলো ঝরে পড়লো। সাহাবায়ে কেরাম এ দৃশ্য দেখলেন। পরে নবী করীম (সাঃ) বললেন-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ-

'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার'।

এই কালেমা মানুষের গোনাহ্‌সমূহ এভাবে ঝেড়ে ফেলে দেয়, যেভাবে গাছের শুষ্ক পাতাগুলো ঝড়ে পড়লো।" (তিরমিযী)

পবিত্র কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে যিক্‌র সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস বিশ্লেষণ করলে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, সকল প্রকার নেক কাজসমূহের প্রাণশক্তি মহান আল্লাহ তা'য়ালার যিক্‌র। শোকে-দুঃখে, শান্তিতে-সঙ্কটে এমনকি যুদ্ধের ময়দানে সর্বাবস্থায় মুমীন ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে তার হৃদয় মহান আল্লাহর স্মরণে জাগ্রত রাখা। তাহলেই তার হৃদয় জীবিত থাকবে, অন্যথায় তার হৃদয় মৃত্যুবরণ করবে। একজন আরব কবি খুব সুন্দর কথা বলেছেন-

اِذَا مَرِضْنَا تَدَ اَوَيْنَا بِذِكْرِ كُمْ

فَنَتْرُكَ الذِّكْرَ اَحْيَانًا فَنَتَكَّسُ

অর্থাৎ "আমি যখন অসুস্থ হই তখন তোমার স্মরণ আমার চিকিৎসার কাজ করে। আর আমি কখনো যদি তোমার যিক্‌র থেকে গাফেল হই তখন তা আমার জন্য মৃত্যু তুল্য হয়ে যায়।"

প্রকৃতপক্ষে দ্বিপ্রহরের মেঘমুক্ত সূর্য্য যেমন সব কিছুকে আলোকিত করে দেয় অনুরূপভাবে আল্লাহর যিক্‌র মুমীনের হৃদয় ও তার জিহ্বাকে পবিত্র করে তার সকল কাজসমূহকে স্বচ্ছতায়-সততায় প্রাণবন্ত করে দেয়।

সুতরাং হৃদয় যাতে দ্বীনের ওপর অটল থাকে সে জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য কামনা করতে হবে। এ ব্যাপারে নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি প্রনিধান যোগ্য।

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرَ مَا يَقُوْلُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهٖ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ وَيْلَكَ اِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللّٰهِ يُقَلِّبُ كَيْفَ يَشَاءُ—

"হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) যে দোয়াটি সব থেকে বেশী উচ্চারণ করতেন তা হচ্ছে 'হে অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী! আমার দিল্‌কে তোমার দ্বীনের ওপর অটল রাখো'। আমি জানতে চাইলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমরা আপনার প্রতি এবং আপনার ওপরে নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি, আপনি কি আমাদের ঈমানের ওপর টিকে থাকার ব্যাপারে শঙ্কিত? জবাবে নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমার প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন, মানুষের হৃদয় আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝে। যেদিকে খুশী তিনি সেদিকে পরিবর্তন করে দেন।" (মুসলিম)

এ হাদীস অনুযায়ী প্রত্যেক মুমীন পুরুষ ও নারীকে দ্বীনের ওপর টিকে থাকার জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করা একান্তভাবে জরুরী। এ জন্যে প্রয়োজন অহঙ্কার মুক্ত বিনয়ে বিগলিত অন্তর। আর বিনয় সৃষ্টি হয় ভীতি ও আশা সহকারে সার্বক্ষণিক আল্লাহ্ তা'য়ালার যিক্‌র ও নেক আমলের মাধ্যমে।

নেক কাজের নগদ প্রাপ্তী

সকল মানুষই এ কথা বিশ্বাস করে যে পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী, কৃত্রিম, ধ্বংসশীল ও ভঙ্গুর। একদিন না একদিন মৃত্যু এসে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবে। কিন্তু এরপরেও মানুষ আকাঙ্খা করে যে, সে অধিক দিন পৃথিবীতে জীবিত থাকবে এবং তার জীবনকাল দীর্ঘ হবে। যেমন প্রাচীনকালে লোকজন 'আবে হায়াত' ও নানা ধরণের জিনিস আবিষ্কার করে চিরদিন জীবিত থাকার দর্শন উপস্থাপন করতো। এ পৃথিবীতে এমন যুগ অতিবাহিত হয়েছে যে, মানুষ প্রায় হাজার বছর জীবিত থাকতো। কিন্তু

এরপরেও মৃত্যু এসে জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিতো। ইসলাম তার অনুসারীদের সম্মুখে পৃথিবীর জীবন সম্পর্কে দুটো তাৎপর্যপূর্ণ দিক তুলে ধরেছে। একটি হলো মহান আল্লাহর দাসত্ব করা এবং অন্যটি হলো আখিরাত সম্পর্কে চিন্তা করা। এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি অবলম্বনেই পৃথিবীতে মুসলমানদের জীবনকাল অতিবাহিত হওয়া উচিত।

জীবনকাল দীর্ঘ বা কম করা সম্পূর্ণ মহান আল্লাহরই ইচ্ছাধীন। যদি তিনি চান তাহলে জীবনের ব্যাপারে সমাপ্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন এবং যদি তিনি চান তাহলে জীবনকাল বিস্তৃত করে দেন। জীবনকাল দীর্ঘ না কম হলো জীবনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সেটা নয়, মূল প্রশ্ন হলো মানুষ কোন্ পদ্ধতিতে জীবনকাল অতিবাহিত করেছে? মহান আল্লাহর নির্দেশের অধীন থেকে তাঁরই আনুগত্যের জীবন অতিবাহিত করেছে না তাঁর বিধানের সাথে বিদ্রোহমূলক জীবনকাল অতিবাহিত করেছে?

যে ব্যক্তি পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়েছে এবং আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করার তাওফীকও পেয়েছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীসে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর ঐ ব্যক্তি ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গিয়েছে যে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন লাভ করার পরও জীবনকে পাপাচার ও অবাধ্যতার মধ্যে অতিবাহিত করেছে। আল্লাহর আনুগত্য ও নির্দেশ পালনকারী ব্যক্তি সম্পর্কে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيَاةً طَيِّبَةً، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ–

"পুরুষ বা নারীর মধ্যে যে ব্যক্তিই কোনো নেক কাজ করবে এমতাবস্থায় যে, সে হবে যথার্থ মুমিন, তাহলে অবশ্যই তাকে আমি দুনিয়ার বুকে পবিত্র জীবন-যাপন করাবো এবং আখিরাতের জীবনেও তাদের দুনিয়ার জীবনের কার্যক্রমের অবশ্যই উত্তম বিনিময় দান করবো।" (সূরা নাহ্লঃ ৯৭)

এমন অনেক ধরণের নেকীর কাজ রয়েছে, যার অগণিত সওয়াব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষাকারীদের সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে–

صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِى الْعُمُرِوَصَدَقَةُ السِّرِ تُطْفِىءُ غَضَبَ الرَّبِّ،

"দুনিয়ার জীবনে আত্মীয়-স্বজনকে গোপনে দান করলে তা আল্লাহর গযবকে শীতল করে দেয়।" (জামেউস্ সাগীর, হাদীস নং- ৩৭৬৬)

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে–

صِلَةُ الرَّحْمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يُعَمِّرْنَ الدِّيَارَ وَيَزِدْنَ فِى الْاَعْمَارِ–

"আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা, উত্তম স্বভাব-চরিত্র এবং প্রতিবেশীদের সাথে সুন্দর আচরণ, এই তিনটি নেক কাজের কারণে সমাজ ও দেশ সমৃদ্ধ হয়। আর এই ধরণের নেকীর কাজ মানুষের জীবনকে উজ্জ্বল করে দেয়।" (জামেউস্ সাগীর, হাদীস নং- ৩৭৬৭)

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ নেক কাজের কারণে জীবন সমৃদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আলেমগণ বলেন, নেকীর কাজ থেকে আশা করা যায় যে জীবন ও জীবনকালে বরকত লাভ হয়। প্রত্যেক কাজই উত্তম ও কল্যাণকর পন্থায় সমাপ্ত হয় এবং মন মানসিকতা প্রশান্তি ও সন্তুষ্টির ওপর স্থিতিশীল থাকে।

এর দ্বিতীয় অর্থ হলো, নেকীর বা সৎকাজ ঘটনাবহুল জীবনকে উজ্জ্বলতা- পরিচ্ছন্নতা উপহার দেয়। কেননা এটা একমাত্র মহান আল্লাহরই ক্ষমতায় ও নিয়ন্ত্রণে যে, তিনি নিজের সৃষ্টির মধ্যে যাকে যখন খুশী তার জীবনকাল সঙ্কুচিত বা বিস্তৃত করে দেন।

এর তৃতীয় অর্থ হলো, যিনি পৃথিবীর জীবনে নেক কাজ করেন, তাঁর ইন্তেকালের পরেও সেই নেক কাজের ধারাবাহিকতা অব্যহত থাকে এবং সেই নেক্কার ব্যক্তিকে জীবিত মানুষদের জন্যে অনুসরণীয় বানিয়ে দেয়া হয়। (মাজমুউ'ল ফাত্ওয়া-শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া, খন্ড নং-১৪, পৃষ্ঠা নং- ৪৯০, ৫৪০, উমদাতুল কারী, শরহে বোখারী, ইমাম আইনি, খন্ড নং ১৮, পৃষ্ঠা নং- ১২৭, ফাতহুল বারী, শরহে বোখারী, ইমাম ইবনে হাজার, খন্ড নং ১০, পৃষ্ঠা নং- ৪২৯, শরহে মুসলিম ইমাম নববী, খন্ড নং-১৬, পৃষ্ঠা নং ১১৪)

নেকীর পাল্লায় ওজন বৃদ্ধির পাঁচটি সহজ নেকী

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কিয়ামতের দিন সকল বান্দার আমল ওজন দেয়ার জন্যে মিজান বা দাড়িপাল্লা স্থাপন করবেন। মানুষের প্রতি ন্যায় ও ইনসাফ করার জন্যেই দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। এই দাড়িপাল্লার একদিকে মানুষের নেকী ও অপর পাল্লায় যাবতীয় অসৎ কাজ ওজন দেয়া হবে। আর এভাবে প্রত্যেক মানুষের আমল অনুসারে বিনিময় দেয়া হবে।

অল্প সময়ে অর্জন করার মতো সহজসাধ্য নেকীর কাজের মধ্যে এমন অগণিত নেকী রয়েছে, যা আমাদের আমলকে ওজন দেয়ার সময় নেকীর পাল্লাকে ওজনে ভারী করতে পারে। যদি এসব নেকীর কাজ একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে করা হয়, তাহলে মহান আল্লাহর রহমতে আশা করা যেতে পারে যে, তিনি আমাদের প্রতি মেহেরবানী করে নমনীয় ব্যবহার করবেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁর পবিত্র ঘোষণার মধ্যে এমন পাঁচটি নেকীর কাজ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, যা অন্যান্য সকল নেকীর মোকাবেলায় ওজনে ভারী। তিনি বলেছেন–

لَخَمْسٌ مَا أَثْقَلُهُنَّ فِى الْمِيْزَانِ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفّٰى لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ– (ابن حبان)

"পাঁচটি নেকীর কাজ বড়ই বিস্ময়য়কর, যা ওজনে সবথেকে বেশী ভারী করে দিবে। সে নেকীর কাজগুলো (১) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু (২) সুবহানাল্লাহ (৩) ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহ (৪) আল্লাহু আকবার। এবং ৫ নম্বর নেকী হলো, সৎ ও আল্লাহভীরু সন্তান ইন্তেকাল করার কারণে যে মুসলমান সর্বোত্তম ধৈর্য অবলম্বন করেছে।" (ইবনে হাব্বান, হাদীস নং- ৮৩৩)

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত উল্লেখিত তাস্‌বীহ্‌সমূহ অধিক পরিমাণে পড়া। বিশেষ করে প্রত্যেক ফরজ নামাজ শেষে এ তাস্‌বীহ্‌সমূহ যত বেশী পড়া যাবে ততই আমলনামা সওয়াবে পূর্ণ হয়ে ভারী হতে থাকবে।

সবসময় আল্লাহকে স্মরণে রাখা উত্তম ইবাদাত

উত্তম ইবাদাতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদাত হলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিক্‌র করা। অর্থাৎ প্রত্যেক মুহূর্তে মহান আল্লাহকে স্মরণে রাখা একান্ত প্রয়োজনীয় ইবাদাত এবং এই ইবাদাতের মাধ্যমেই সকল ধরণের মন্দ কাজ ও আল্লাহর নাফরমানী থেকে নিজেকে দূরে রাখা যায়। আল্লাহর যে বান্দাহ্ তাঁকে স্মরণে রাখে তিনিও তাকে স্মরণে রাখেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ–

"(আমি যে অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছি) এর জন্যে আমাকেই স্মরণ করো তাহলে আমিও তোমাদের স্মরণ করবো।" (সূরা বাকারা-১৫২)

প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহ তা'য়ালার যিক্র করার অর্থ হলো, তাঁর নির্দেশ অনুসারে জীবন পরিচালনা করা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় ও রমজানের ফরজ রোজা রাখা, সামর্থ থাকলে যাকাত দেয়া ও হজ্জ আদায় করার পর আল্লাহ্র যিক্র করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো পবিত্র কোরআন সহীহ্ভাবে তিলাওয়াত করা। কারণ প্রকৃত যিক্র হলো পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত। কোরআনের প্রকৃত মর্ম ও অর্থ উপলব্ধি করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে একান্ত আবশ্যকীয় প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে কোরআন সহজে বুঝার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় অনূদিত পবিত্র কোরআনের তাফসীর গ্রন্থ 'তাফহীমুল কোরআন' এর বিকল্প নেই।

একইভাবে উঠতে, বসতে, সকাল-সন্ধ্যায় নবী করীম (সাঃ)-এর শিখানো দোয়া পড়াও আল্লাহ্র যিক্রের অন্তর্গত। তাসবীহ্, তাহমীদ, তাকবীর ও তাহলীলও যিক্রের অন্তর্ভুক্ত এবং এর বিনিময়ে অঢেল সওয়াব অর্জন করা যায়। সুবহানাল্লাহ্ হলো 'তাসবীহ্' এবং এ শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করা হয়। আলহামদু লিল্লাহ্ হলো 'তাহমীদ' এবং এ শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রশংসা করা হয়। আল্লাহু আকবার হলো 'তাকবীর' এবং এ শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হয়। আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ হলো 'তাহলীল'। এ শব্দের অর্থ হলো বিশ্লেষণ বা পৃথকীকরণ। অর্থাৎ অন্যান্য সকল সত্তা থেকে এ বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহর মহান সত্তাকে পৃথক করা হয় এবং তাঁকে শির্কমুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়।

আর লা হাওলা ওয়া লা কুউ-ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি হলো 'হাওকালাহ্' এবং এই বাক্যের মাধ্যমে এ কথাই ঘোষণা করা হয় যে, অন্যায় অসত্য কাজ থেকে বিরত থাকা ও সৎকাজ করা এক মাত্র মহান আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতীত সম্ভব নয়। উল্লেখিত শব্দ ও বাক্যসমূহ মুখে উচ্চারণ করা তেমন কঠিন কিছু নয় এবং এগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে খুব ছোট হলেও এর গুরুত্ব ও মর্যাদা মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত বেশী। এ জন্যে আল্লাহর স্মরণমূলক দোয়াসমূহ সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তেই পড়তে হবে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَاعَمِلَ اٰدَمِیٌّ عَمَلاً اَنْجٰی لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰی–

"আল্লাহ তা'য়ালার আযাব থেকে মানুষকে মুক্ত রাখার সবথেকে উত্তম আমল হলো আল্লাহর যিক্র করা।" (মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৭৪)

মহান আল্লাহর যিক্র করা, তাঁর গুণ বর্ণনা ও প্রশংসা করা সর্বাধিক নেকীর কাজ এবং বরকতময় আমল। সময়ের প্রক্যেতটি মুহূর্ত সমগ্র সৃষ্টির ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর

অস্তিত্ব সম্পন্ন সত্তাসমূহও সেই মহান সত্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের গুণ বর্ণনা ও প্রশংসায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَ اِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ، اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا–

"সাত আকাশ ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে তা সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, সৃষ্টিলোকে কোনো একটি জিনিসই এমন নেই যা তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মাহাত্ম ঘোষণা করে না, কিন্তু তাদের এ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না, অবশ্যই তিনি একান্ত সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ।" (সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৪৪)

যিক্‌র প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি মুহূর্তের জপমালা হওয়া উচিত। প্রত্যেক কথায়, কাজে-কর্মে, উঠা-বসা, চলাফেরা, শয়নে-স্বপনে এক কথায় জীবনের প্রত্যেক স্পন্দনেই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাকে স্মরণ করতে হবে। কখন কোন্ অবস্থায় কিভাবে কোন্ শব্দের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করতে হবে, তা হাদীসে মওজুদ রয়েছে এবং এ কিতাবেও উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহর আনুগত্যই যিক্‌র-এর প্রকৃত অর্থ

যিক্‌র আরবী শব্দ এবং এর অর্থ হলো, কাউকে স্মরণ করা বা কাউকে স্মরণে রাখা। সাধারণত মানুষ যে জিনিস বা যাকে পসন্দ করে, ভালোবাসে বা যার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তাকে সবসময় স্মরণে রাখে। মানুষ যাকে সবথেকে বেশী ভালোবাসে তার কথা শয়নে-স্বপনে জাগরণে অর্থাৎ সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্তে তাকে স্মরণ করে। যিক্‌র-এর আরেকটি অর্থ হলো, যাকে সর্বাধিক ভালোবাসা যায়, যার কথা সবথেকে বেশী স্মরণে থাকে, তার সন্তুষ্টি অর্জনই মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। তার পসন্দ-অপসন্দ, প্রিয়-অপ্রিয়, রুচি সকল কিছুই নিজের জীবনের সাথে একাকার হয়ে যায়।

মানুষ তার প্রিয়জনের সকল কিছুকেই প্রাধান্য দেয় এবং এটা মানুষের অন্তর্নিহিত ভালোবাসার দাবী। আমরা যারা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে ভালোবাসি বলে দাবী করি, তারা কি আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর প্রিয়-অপ্রিয় ও পসন্দ

অপসন্দকে নিজের প্রিয়-অপ্রিয় এবং পসন্দ-অপসন্দে পরিণত করতে পেরেছি? আমরা যদি প্রকৃত অর্থেই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে নিজ জীবনের সকল কিছুর তুলনায় অধিক প্রিয় মনে করতাম, তাহ্লে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলেরই আনুগত্য করতাম।

আনুগত্য সাধারণত দুই ধরণের হয়ে থাকে। প্রথম ধরণের আনুগত্য হলো, বিনিময় পাবার আশায় বা শাস্তির ভয়ে নির্দেশের ভিত্তিতে আনুগত্য করা। অর্থাৎ নির্দেশ না মানলে শাস্তি পেতে হবে এবং কোনো মজুরী বা বিনিময়ও পাওয়া যাবে না। এ জন্যেই আনুগত্য করা হয়। যেমন চাকরী, যথারীতি হাজিরা না দিলে, নির্ধারিত কর্ম না করলে চাকরীও থাকবে না এবং মাস শেষে বেতনও পাওয়া যাবে না।

আরেক ধরণের আনুগত্য হলো, ভালোবাসার ভিত্তিতে আনুগত্য করা। অর্থাৎ যাকে ভালোবাসা হয়, তার কথা, কাজ, রুচি, প্রিয়-অপ্রিয়, পসন্দ-অপসন্দকে প্রাধান্য দিয়ে প্রিয়জনের সকল কিছুকে অনুসরণ করা। এক কথায় প্রিয়জনের সন্তুষ্টি অর্জনই নিজের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পরিণত করে জীবনের সকল কাজকে প্রিয়জনের পসন্দ-অপসন্দের ভিত্তিতে করা। এখানে প্রিয়জনের নির্দেশকে প্রাধান্য দেয়া, তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তির আশঙ্কা করা বা তার পক্ষ থেকে বিনিময় পাবার প্রত্যাশাকে প্রাধান্য দেয়া হয় না, বরং তার প্রতি হৃদয়-মন উজাড় করা ভালোবাসা ও তার সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়।

প্রত্যেকটি মুসলমানকে মনে রাখতে হবে, নবী করীম (সাঃ)-এর আনুগত্য হতে হবে ভালোবাসার ভিত্তিতে। তাঁকে পৃথিবীর সকল কিছুর তুলনায় অধিক ভালোবাসতে হবে এবং সেই ভালোবাসার ভিত্তিতেই তাঁর আনুগত্য করতে হবে। তাঁর পসন্দকে নিজের পসন্দ, তাঁর অপসন্দকে নিজের অপসন্দ, তাঁর প্রিয় জিনিসকে নিজের প্রিয় জিনিসে, তাঁর অপসন্দ বা ঘৃণার বিষয়কে নিজের ঘৃণার বিষয়ে পরিণত করতে হবে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্যকেই তথা তাঁকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করার মাধ্যমেই মহান আল্লাহর যিক্র-এর হক আদায় হবে। একজন মুসলমান যখন তার জীবনের সকল বিভাগকে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের অধীন করে দেয়, তখনই সে যিক্‌রকারীদের উচ্চস্তরে উপনীত হয়।

বাস্তব জীবনে কোরআন-সুন্নাহর বিধান অনুসরণ না করে শুধুমাত্র 'আল্লাহু আল্লাহু' যিক্র এর গুরুত্ব নেই। ইসলামী শরীয়াতে যিক্র-এর অর্থই হলো, জীবনের সকল ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহর বিধান অনুসরণ করা অর্থাৎ সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্ত আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলকে স্মরণে রেখে জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়া। আর

এর প্রকৃত নাম হলো, 'আল্লাহর যিক্র করা'। ইমাম কুরতুবী (রাহঃ) বলেছেন, আল্লাহর যিক্র-এর প্রকৃত অর্থ হলো, তাঁর নির্দেশাবলী জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং তিনি যা কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে অবস্থান করা।

আল্লাহর যিক্র বলতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) স্পষ্ট বলে দিয়েছেন–

مَنْ أَطَاعَ اللّٰهَ فَقَدْ ذَكَرَ اللّٰهَ، وَاِنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ لِلْقُرْاٰنِ، وَمَنْ عَصَى اللّٰهَ فَلَمْ يَذْكُرْهُ وَاِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ لِلْقُرْاٰنِ–

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যের পথ অবলম্বন করেছে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর যিক্র করেছে, তার নামাজ, রোজা ও কোরআন তিলাওয়াত কম হোক না কেনো। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অমান্য করেছে, সে ব্যক্তি আল্লাহর যিক্র করেনি, তার নামাজ, রোজা ও কোরআন তিলাওয়াত বেশী হোক না কেনো।" (ফয়যুল কাদীর শরহে আল জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং-৮৪৬৩)

উল্লেখিত হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, যিক্র এর অর্থ শুধু মুখে মুখে 'আল্লাহু আল্লাহু' নাম উচ্চারণ করা নয়, বরং মহান আল্লাহ তা'য়ালা যা কিছু আদেশ করেছেন তা করা এবং যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে দূরে থাকা।

মহাবিশ্বের সকল অনু-পরমাণু আল্লাহর যিক্র করে

বিশ্বের সকল সৃষ্টি তথা প্রত্যেক অনু-পরমাণু সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে মহান আল্লাহ তা'য়ালার গুণ-কীর্তন করছে। উদিয়মান সূর্য ও অস্তমিত সূর্যসহ্ বিশ্বের সকল কিছুই মহান আল্লাহ্ নামের গুণ-কীর্তন করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ–

"সাত আকাশ ও যমীন এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। মহাবিশ্বে কোনো একটি জিনিস এমন নেই যা তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের এ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না।" (সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৪৪)

বিশ্বের সকল কিছুই মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে, কিন্তু এর তাৎপর্য বা মাহাত্ম্য ঘোষণার ধরণ কি? ইসলামী চিন্তাবিদগণ মহান আল্লাহর তাস্‌বীহ্ ঘোষণার বিষয়টিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথমটি হলো পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণার ক্ষমতা আর দ্বিতীয়টি হলো সৃষ্টিগতভাবে পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করা। প্রথমটি সকল ফিরিশ্‌তা, মুমিন, জ্বীন ও মানুষের জন্যে নির্ধারিত। আর দ্বিতীয়টি মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টির জন্যে নির্ধারিত যা অস্তিত্ব দান করার মুহূর্তেই তাদের স্বভাবের অন্তর্গত করা হয়েছে। এ জন্য সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু থেকে বৃহত্তর সকল কিছুই সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে অর্থাৎ সকল সৃষ্টি আল্লাহর তাস্‌বীহ্ করছে। এই তাস্‌বীহ্ সর্বসাধারণ শুনতে পায় না এবং সৃষ্টির সকল কিছুর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণার বিষয়টি সাময়িকও নয় বরং চিরন্তন। যা আমাদের বোধ, বুদ্ধি, দৃষ্টিজ্ঞান, অনুধাবন ও উপলব্ধির বাইরে।

মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে, এ জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ অন্যান্য সকল সৃষ্টির তুলনায় মানুষকেই সর্বাধিক পরিমাণে মহান মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করা উচিত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মানুষের একটি বিরাট অংশ নিজের মনিব-মালিক, প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রক আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছে। মহান আল্লাহ মানুষের প্রতি নিয়ামত দান করেছেন বিশেষ করে ইসলামের অনুসারী ঈমানদারদের প্রতি নিয়ামতের যে বৃষ্টিধারা জারি রেখেছেন, এর বিনিময়ে আমাদেরকে যথার্থ অর্থে আমাদের জীবনকে মহান আল্লাহর দাসত্বে নিয়োজিত রাখতে হবে। সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্ত একমাত্র তাঁরই প্রশংসা, পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণার মধ্য দিয়ে সময়ের ব্যবহার করলেও তাঁর প্রশংসা আদায়ের হক সামান্যই আদায় করা হবে।

আহা! আমরা কি যথার্থ অর্থে মহান আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শন করতে সক্ষম? একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

مَا تَسْتَقِلُّ الشَّمْسُ فَيَبْقَى شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ اِلاَّ سَبَّحَ اللّٰهَ بِحَمْدِهٖ اِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، وَاَغْبِيَاءِ بَنِىْ اٰدَمَ–

"প্রত্যহ সূর্য উদিত হয়ে বিশ্বজাহান আলোকিত করে তোলে, মহাবিশ্বে আল্লাহ তা'য়ালার সকল সৃষ্টির মধ্যে শয়তান ও গাফেল মানুষ ব্যতীত এমন একটি সৃষ্টিও অবশিষ্ট থাকে না, যে সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রশংসা, পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে না।" (ফয়যুল কাদীর, হাদীস নং- ৭৮৭৩, জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং- ৫৫৯৯)

দ্বিতীয় অধ্যায়

দোয়ার আদব ও কবুলের শর্ত

প্রকৃত মুমীন হিসেবে আল্লাহর দাসত্বের পূর্ণ হক আদায় করার জন্যে দোয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অন্য অর্থে একজন আনুগত্যশীল মুমীন বান্দাহ্কে আল্লাহ তা'য়ালার বিধান অনুযায়ী তার জীবন গড়তে হয়; আর এ পথে রয়েছে দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ ও জ্বীন-শয়তানদের প্রচন্ড বাধা ও পদে পদে ষড়যন্ত্র। কখনো কখনো এসব ষড়যন্ত্র দ্বীনি আন্দোলন ও তার কর্মীদের সামনে পাহাড়সম উঁচু হয়ে দাঁড়ায়। যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ– وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ– فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ– اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ–

"(আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টির জন্য) এরা এ চক্রান্তমূলক পন্থা অবলম্বন করেছে আর আল্লাহর কাছে তাদের সেসব চক্রান্ত (ষড়যন্ত্র) লিপিবদ্ধ আছে। যদিও তাদের সে চক্রান্ত (মনে হচ্ছিলো তা বুঝি) পাহাড় টলিয়ে দিতে পারবে। (হে নবী) আপনি কখনো আল্লাহ তা'য়ালাকে তাঁর নবীদের প্রতি দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মনে করবেন না। অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" (সূরা ইবরাহীমঃ ৪৬-৪৭)

সুতরাং বিপদে-আপদে, মহাসঙ্কটে, শোকে-দুঃখে, শুভ দিনে-দুর্দিনে, আনন্দ ও স্বস্তিতে সর্বাবস্থায় একজন মুমীন বান্দাহ্ বা বান্দী একান্ত অনুগত দাস-দাসীর মতো বিনয় অবনত চিত্তে নতশীরে তার রবের নিকট দোয়া করবে, আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আল্লাহর কাছে যে যতো চাইবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার প্রতি ততোই সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তার জীবন চলার পথ সুগম করবেন। আর যে দোয়া থেকে গাফেল থাকে আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হন। কবি বলেছেন–

ہر ہمیشہ دینیکو وہ تیّار ہے
جو نہ مانگے اس سے وہ بیزار ہے

হর হামেশা দেনে কো উয়ো তৈয়্যার হ্যায়
জো না মাঙ্গে উস্সে উয়ো বেজার হ্যায়।

"সদা সর্বদা তিনি দেয়ার জন্যে প্রস্তুত, যে তাঁর কাছে চায় না তার প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হন।"

কোনো অহঙ্কারী ও দাম্ভিক ব্যতীত আল্লাহ তা'য়ালার নিকট প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'বান্দাহ্ যখন আল্লাহর দরবারে হাত উঠায়, তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা লজ্জাবোধ করেন'। (আল হাদীস)

'দোয়া' নামক এ মহান ইবাদাতের জন্য পবিত্র হাদীস গ্রন্থগুলোয় দোয়া কবুলের শর্ত, আদব, স্থান ও সময়ের বর্ণনা রয়েছে। সংক্ষেপে আমরা এখানে তা উল্লেখ করছি।

দোয়ার আদব ঃ (১) অযু অবস্থায় দোয়া করা (২) কিবলামুখী হওয়া (৩) গুরুত্বপূর্ণ দোয়াসমূহ তিন বার উচ্চারণ করা (৪) দোয়া করার সময় দু'হাত সীনা (বক্ষদেশ) বরাবর উঁচু করে নতশীরে দোয়া করা (৫) কাকুতি-মিনতি ও ভয়-ভীতির সাথে দোয়া করা (৬) দোয়া করার সময় কণ্ঠস্বর খুব উঁচু অথবা একেবারে ক্ষীণ স্বরেও দোয়া না (৭) পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দোয়া করা।

দোয়া কবুলের শর্তঃ (১) হালাল উপার্জনের অর্থ দিয়ে খাদ্য সামগ্রী ও জীবন পরিচালনার যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে (২) একাগ্রচিত্তে- কায়মনো বাক্যে কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে চাইতে হবে (৩) আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম দিয়ে দোয়া শুরু করতে হবে ও একই পদ্ধতিতে শেষ করতে হবে। (৪) দোয়া করার সময় নিজকৃত অপরাধের স্বীকৃতি দিতে হবে, বিনয়ের সাথে গোনাহের জন্য লজ্জাবনত অবস্থায় ক্ষমা চাইতে হবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত নে'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে (৫) অন্যায়ভাবে সংগ্রহ করা ধন-সম্পদ এবং হকদারের হক ফেরৎ দিতে হবে ও তওবা করতে হবে (৬) দোয়া কবুলের দৃঢ় আশা পোষণ করতে হবে (৭) দোয়া কবুলের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা বা অস্থির হওয়া যাবে না (৮) মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার উত্তম নাম ও সুন্দর গুণাবলীর দ্বারা এবং নিজের নেক আমলের উসিলা সহকারে চাইতে হবে (৯) কোনো অবৈধ কাজের জন্য বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দোয়া করা যাবে না (১০) আল্লাহ্ ও তার রাসূলের সাথে নাফরমানী হয়, নির্দেশের বিপরীত হয়, এমন কাজ থেকে প্রার্থনাকারীকে বিরত থাকতে হবে।

যেসব স্থানে বা যে সময় দোয়া কবুল হয়ঃ (১) ফরজ বা নফল রোজা পালনের ক্ষেত্রে ইফতারির পূর্বক্ষণে (২) রমজান মাসের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোয় অর্থাৎ লাইলাতুল কদ্‌রে (৩) প্রত্যেক রাতের শেষ অংশে (৪) ফরজ নামাজের শেষে (৫) আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে (৬) জুময়ার দিনে একটি

বিশেষ মুহূর্তে। এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য অভিমত হলো, সময়টি জুময়ার দিনে আসরের সময় অথবা খুৎবা ও নামাজের সময়ও হতে পারে (৭) খালেস নিয়তে জমজম পান করার সময় (৮) সিজ্দারত অবস্থায় (৯) আল্লাহ তা'য়ালার ইস্মে আজম পড়ার সময়, যা পড়ে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করেন এবং কিছু চাইলে তিনি তা দিয়ে থাকেন (১০) আরাফার দিনে আরাফাতের ময়দানে (১১) কা'বা শরীফের ভেতরে (১২) মুলতাজিমে অর্থাৎ কা'বা ঘরের দরজায় (১৩) মিযাবে রহমতের নীচে অর্থাৎ কা'বা ঘরের ছাদ থেকে যেস্থান দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে (১৪) সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের ওপরে (১৫) মিনায় মসজিদে মাশয়ারে হারামের নিকটে (১৬) মসজিদে নববীতে 'রিয়াদুল জান্নাতে' (১৭) নবী করীম (সাঃ)-এর মোবারক যিয়ারতের স্থানে।

একজন মুমীন বান্দাহ্ তার প্রভুর নিকট সদা-সর্বদা এবং সর্বাবস্থায়ই দোয়া করতে পারে। তবে হাদীসের গ্রন্থগুলোয় বর্ণিত দোয়া করার ব্যাপারে উপরোল্লেখিত আদব, শর্ত, স্থান ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ– اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَالْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ–

"(হে নবী) আমার কোনো বান্দাহ্ যখন আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে (তাকে আপনি বলে দিবেন) আমি তার একান্ত কাছেই আছি, আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে। তাই তাদেরও উচিৎ আমার আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং সম্পূর্ণভাবে আমার ওপর ঈমান আনা, আশা করা যায় এতে করে তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে।" (সূরা বাকারাঃ ১৮৬)

যে কোনো ব্যাপারে সাহায্য কামনা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে। নবী করীম (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছে, কখন মানুষ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ হয়। তিনি বলেছেন, মানুষ যখন আল্লাহকে সিজদা দেয়, তখন মানুষ আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়ে যায়। সুতরাং কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে।

সুতরাং প্রকৃত মুমিন হিসেবে আল্লাহর দাসত্ব করার পূর্ণ হক আদায় করার জন্য দোয়ার প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যকীয়। অন্য অর্থে একজন আনুগত্যশীল মু'মিন বান্দাহ্কে আল্লাহ তা'য়ালার বিধান অনুযায়ী জীবন গড়তে হয়; আর এ পথে রয়েছে

মানুষ ও জ্বিন-শয়তানদের প্রচন্ড বাধা, এ জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার বান্দাহ্দেরকে এসব দুর্গম পথ অতিক্রমক করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তথা ইহ্কাল ও পরকালে মুক্তির উদ্দেশ্যে জীবনের সকল অবস্থায় কাকুতি-মিনতির সাথে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তাওফীক ও সাহায্য কামনা করার নামই হচ্ছে দোয়া।

পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্ধারিত হালাল হারামের সীমা অতিক্রম করে জীবন পরিচালিত করে, কোরআন-সুন্নাহ্র আনুগত্য বর্জিত জীবন-যাপন করে আর এ ধারণা মনে মনে পোষণ করে যে, কিছু যিকির আযকার ও দোয়া-দরুদ তিলাওয়াত করলেই আমি আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবো বা তাঁর নৈকট্যলাভ করতে পারবো তথা আল্লাহ্ তা'য়ালা পরকালীন জীবনে আমাকে জান্নাত দান করবেন, তাহলে সে ব্যক্তি মারাত্মক ভুল করবে।

এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) এক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "লোকটি দীর্ঘ সফরে পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত ও ধূলি ধূসরিত অবস্থায় দু'হাত আকাশপানে তুলে আবেদন করছে, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! অথচ তার খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয় বস্ত্র সবই হারাম পথে অর্জিত। এমন ব্যক্তির দোয়া কি করে কবুল হবে?" (মুসলিম)

উল্লেখিত হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত হলো কোরআন-সুন্নাহ্র বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করা। জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগে আল্লাহ্র বিধান অনুসরণ করতে হবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অপছন্দনীয় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন করতে হবে এবং সেই সাথে আল্লাহ্র তা'য়ালার কাছে দোয়া করতে হবে। হারাম পথ পরিহার করতে হবে এবং হালাল পথ অবলম্বন করতে হবে, তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ্ তা'য়ালা দোয়া কবুল করবেন।

তবে দোয়া করার পূর্বে ও পরে অবশ্যই দরুদ শরীফ পড়তে হবে এবং হযরত ইউনুস (আঃ) মহান আল্লাহ্র কাছে যে দোয়া করেছিলেন, সেই দোয়াটিও পাঠ করে দোয়া করতে হবে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

فَانَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا "لاَاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ

الظَّالِمِيْنَ" رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ الاَّ اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ–

"যখন কোনো মুসলমান নিজের প্রয়োজনের জন্যে এই দোয়াটি (লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনায্ যালিমীন) পড়ে নিজের প্রয়োজনের জন্যে আবেদন করবে, তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করা হবে।" (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০৫)

হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, দোয়া হচ্ছে ইবাদাতের উৎস। এরপর তিনি পবিত্র কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ–

"তোমাদের প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ হলো, তোমরা আমার কাছে দোয়া করো, আমি কবুল করবো। যেসব লোক অহঙ্কারে নিমজ্জিত হয়ে আমার গোলামী করা থেকে বিরত থাকবে, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে যেতে হবে।"

সুতরাং এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, মানুষের সমস্ত কাজের মধ্যে দোয়াই সব থেকে মর্যাদাপূর্ণ এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমত লাভের জন্য শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। এই পৃথিবীতে এমন ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই, যে ব্যক্তির কাছে না চাইলে সে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়। স্বয়ং মাতা-পিতার কাছেও বার বার চাইলে তাঁরাও অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর বান্দার প্রতি এতই মেহেরবান যে, তাঁর কাছে কেউ কিছু না চাইলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। তাঁর কাছে যে চাইতে থাকে, তার প্রতিই তিনি সন্তুষ্ট হন"। সুতরাং আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে প্রার্থনা বিমুখ যে ব্যক্তি, সে ব্যক্তি অহঙ্কারী এবং আল্লাহ্ রহমত থেকে বঞ্চিত।

আল্লাহর কাছে দোয়া করা বান্দার অবশ্যই কর্তব্য

নামাজ আদায়কালে মানুষ সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে নিজেকে নিবেদন করে বলে, 'আমরা একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি' অর্থাৎ যে কোন ব্যাপারে আমরা তোমারই কাছে দোয়া করি, তোমারই কাছে সাহায্য চাই, অন্য কারো কাছে নয়। আসলে মানুষ দোয়া করে কেবল সেই শক্তিরই কাছে, যে শক্তি সম্পর্কে সে ধারণা করে, 'আমি যার কাছে দোয়া করছি, তিনি সমস্ত কিছুই শোনেন, দেখেন এবং অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী। নীরবে-সরবে, নির্জনে,

প্রকাশ্যে, মনে মনে যে কোন অবস্থায়ই দোয়া করি না কেন, তিনি তা দেখছেন এবং শুনছেন।' মূলতঃ মানুষের আভ্যন্তরীণ এই অনুভূতি, এই চেতনাই তাকে দোয়া করতে প্রেরণা যোগায়-উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

এই পৃথিবী তথা বস্তুজগতের প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ যখন মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্ট নিবারণ অথবা প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয় বা যথেষ্ট বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না তখন কোনো অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী সত্তার কাছে ধর্ণা দেয়ার জন্য মানুষের অবচেতন মন অস্থির হয়ে ওঠে। বিষয়টি সে সময় মানুষের জন্য একান্তই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তখনই মানুষ দোয়া করে এবং সেই অদৃশ্য অথচ সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী সত্তাকে ডাকতে থাকে, সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি স্থানে এবং সর্বাবস্থায় ডাকে। নির্জনে একাকী ডাকে, উচ্চস্বরে ডাকে, নীরবে নিভৃতে ডাকে এবং মনে মনে একান্ত তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করে। একটি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মানুষ এভাবে তাঁর স্রষ্টাকে ডাকতে থাকে। সেই বিশ্বাসটি হলো, সে যে সত্তাকে ডাকছে, সেই সত্তা তাকে সর্বত্র সর্বাবস্থায় দেখছেন এবং তাঁর মনের গহীনে যে কথামালার গুঞ্জরণ সৃষ্টি হচ্ছে, সাহায্যের প্রত্যাশায় তার মন যেভাবে আর্তনাদ করছে, মনের জগতের এই আর্তচিৎকার পৃথিবীর কোন কান না শুনলেও তাঁর স্রষ্টার কুদরতী কান অবশ্যই শুনতে পাচ্ছে। সে যে সত্তাকে ডাকছে, তিনি এমন অসীম ক্ষমতার অধিকারী যে, তাঁর কাছে প্রার্থনাকারী যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তিনি তাকে সাহায্য করতে সক্ষম। তার বিপর্যস্ত ভাগ্যকে পুনরায় কল্যাণে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম।

আল্লাহর কাছে দোয়া করার, তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করার এই তাৎপর্য অনুধাবন করার পর মানুষের জন্য এ বিষয়টির মধ্যে আর কোনো জটিলতা থাকে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্তার কাছে দোয়া করে বা সাহায্যের আশায় ডাকে, তার নামে মানত করে সে প্রকৃত পক্ষেই নিরেট বোকা এবং সে নির্ভেজাল শির্কে লিপ্ত হয়। কারণ যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট তা সেসব সত্তার মধ্যেও রয়েছে বলে সে বিশ্বাস করে। আল্লাহর জন্য যেসব গুণাবলী নির্দিষ্ট, সে তাদেরকে ঐসব গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক না করতো তাহলে তার কাছে দোয়া করতো না এবং সাহায্য চাওয়ার কল্পনা পর্যন্ত তার মনে কখনো উদয় হতো না।

দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে যে, কোনো ব্যক্তি যদি কারো সম্পর্কে নিজের থেকেই এ কথা মনে করে বসে যে,

সে অনেক প্রচন্ড ক্ষমতার মালিক, তাহলে অনিবার্যভাবেই তার কল্পিত ব্যক্তি বা সত্তা ক্ষমতার মালিক হয়ে যায় না। ক্ষমতার মালিক হওয়া একটি অবিচল বাস্তবতা, একটি দৃশ্যমান বাস্তব বিষয় যা কারো মনে করা বা না করার ওপর নির্ভরশীল নয়।

প্রকৃত ক্ষমতার মালিককে কেউ মালিক মনে করুক বা না করুক, স্বীকৃতি দিক বা না দিক–তাতে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না, প্রকৃতই যে ক্ষমতার মালিক, সে সর্বাবস্থায়ই মালিক থাকবে। আর যে সত্তা কোনো ক্ষমতার মালিক নয়, কেউ তাকে ক্ষমতার মালিক মনে করলেও তার মনে করার কারণে সে সত্তা প্রকৃত অর্থেই ক্ষমতাবান হয়ে যায় না।

এটাই অটল বাস্তবতা যে, একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সত্ত্বাই সর্বশক্তিমান, গোটা বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপক, শাসক, প্রতিপালক, সংরক্ষণকারী, তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা, তিনিই সামগ্রিকভাবে যাবতীয় ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অধিপতি। সমগ্র বিশ্ব জগতে দ্বিতীয় এমন কোনো সত্তার অস্তিত্ব নেই, যে সত্তা দোয়া শোনার সামান্য যোগ্যতা রাখে, সাহায্য করার যোগ্যতা রাখে, বা তা মঞ্জুর করা বা না করার ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে।

মানুষ যদি এই অটল বাস্তবতার পরিপন্থী কোনো কাজ করে নিজের পক্ষ থেকে নবী-রাসূল, পীর-দরবেশ, ওলী-মাওলানা, জ্বিন-ফেরেশতা, গ্রহ-উপগ্রহ ও মাটির তৈরী দেব-দেবীদেরকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অংশীদার কল্পনা করে, তাহলে প্রকৃত বাস্তবতার কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটবে না। ক্ষমতার অধিকারী মালিক যিনি– তিনি মালিকই থাকবেন, তাঁর মালিকানায় এসব ব্যর্থ ও বাস্তবতা বর্জিত কল্পনা বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারে না। আর নির্বোধদের কল্পনা শক্তি কখনো ক্ষমতা ও ইখতিয়ারহীন গোলামকে মালিক বানাতে পারে না, গোলাম গোলামই থাকে।

দোয়া করা ও সাহায্য কামনা করার বিষয়টি সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। মনে করা যাক কোন রাজার দরবার থেকে সাহায্য দান করা হয় এবং রাজা প্রার্থনা শুনে থাকেন। সেখানে প্রজাদের মধ্য থেকে পার্থিব প্রয়োজন অনুসারে সাহায্যের আবেদন নিয়ে অনেকেই উপস্থিত হন। এই প্রজাদেরই একজন যদি সাহায্যের আবেদন নিয়ে রাজার দরবারে উপস্থিত হয়ে রাজার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, সাহায্য প্রত্যাশী অন্য প্রজাদের একজনের সামনে দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে তার গুণকীর্তন করতে থাকে এবং সাহায্যের জন্য তার কাছে কাতর কণ্ঠে অনুনয়-বিনয় করতে থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তির এই ধরনের আচরণকে কি বলা যেতে পারে? এর থেকে চরম ধৃষ্টতা কি আর হতে পারে?

বিষয়টি আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক, রাজার দরবারে রাজার উপস্থিতিতে তারই একজন প্রজা আরেকজন প্রজাকে রাজা কল্পনা করে তার কাছে কাতর কণ্ঠে দোয়া করছে, সাহায্য প্রার্থনা করছে, রাজার মধ্যে যেসব গুণাবলী রয়েছে তা ঐ প্রজা সম্পর্কে উল্লেখ করে তার কাছে সাহায্য চাচ্ছে। আর যে প্রজার কাছে এভাবে ঐ নির্বোধ প্রজা সাহায্য চাচ্ছে, সেই প্রজা বেচারী রাজার সামনে লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে পড়ছে, বিব্রতবোধ করছে এবং বারবার নির্বোধ প্রজাকে বলছে, 'তুমি আমার গুণকীর্তন কেনো করছো, আমার কাছে কেনো দোয়া করছো, কেনো আমার কাছে সাহায্য চাচ্ছো, আমি তো রাজা নই, তোমার মতো আমিও এই রাজার একজন প্রজা মাত্র এবং রাজ দরবারে তোমার মতো আমিও একজন সাহায্য প্রার্থী। আমাকে বাদ দিয়ে তোমার চোখের সামনে যে আসল রাজা দরবারে অধিষ্ঠিত আছেন, সাহায্য তার কাছে চাও।'

বেচারী এভাবে ঐ নির্বোধ প্রজাকে বার বার বুঝাচ্ছে, কিন্তু কে শোনে কার কথা! হতভাগা তবুও চোখ-কান বন্ধ করে তারই মতো সেই প্রজার কাছে স্বয়ং রাজার সামনে অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেই যাচ্ছে। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হয়েছে ঐ নির্বোধ হতভাগা প্রজার মতোই। আল্লাহর যেসব বাকহীন গোলামদের দাসত্ব, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা এরা করছে, তারা নীরবে অঙ্গুলি সঙ্কেতে জানিয়ে দিচ্ছে, আমরা তোমারই মতো এক গোলাম। আমাদের আনুগত্য না করে, আমাদের কাছে প্রার্থনা না করে, আমরা যার আনুগত্য করছি, যার কাছে সাহায্য কামনা করছি সেই আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাও।

দাসত্ব করতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং যে কোন প্রয়োজনে তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে। দোয়া করতে হবে শুধু তাঁরই কাছে। মনে রাখতে হবে, দোয়াও ঠিক ইবাদাত তথা ইবাদাতের প্রাণ। আল্লাহর কাছে দোয়া করা বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য ও পূজা-উপাসনারই অনিবার্য দাবী। যারা তাঁর কাছে দোয়া করে না, এর অর্থ হলো–তারা গর্ব আর অহঙ্কারে নিমজ্জিত। এ কারণে তারা নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের কাছে দাসত্বের স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এদের জন্য জাহান্নাম নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, সাহায্য চাইতে হবে। তাঁর কাছে দোয়া না করা, সাহায্য না চাওয়া চরম অপরাধ। হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'দোয়াই ইবাদাত।' আরেক হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, দোয়া হচ্ছে ইবাদাতের সারবস্তু। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে–

مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ– (رواه الترمذى)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে না, আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন।"

দোয়া ও তাকদীর সম্পর্কে যা না জানলেই নয়

দোয়া বা সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে একশ্রেণীর মানুষের মনে তাকদীর সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিছু সংখ্যক মানুষ ধারণা করে, 'কল্যাণ ও অকল্যাণ যাবতীয় কিছু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তিনিই তাকদীরের সমস্ত কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন, তিনি তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যে ফায়সালা করেছেন সেটাই তো অনিবার্যভাবে মানুষের জীবনে ঘটবেই। অতএব নতুন করে আবার আমরা দোয়া করবো কেন এবং দোয়া করলে কি আমাদের তাকদীরের কোন পরিবর্তন ঘটবে?' মানুষের এই ধারণা একটি মারাত্মক ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণা মানুষের মন থেকে সাহায্য চাওয়া ও দোয়ার সমস্ত গুরুত্ব মুছে দেয়। এই ভুল ধারণা হৃদয়-মনে পালন করে মানুষ যদি আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, দোয়া করে, তাহলে সেসব দোয়ার মধ্যেও যেমন আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় না তেমনি কোন প্রাণও থাকে না। অথচ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ–

"তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।" (সূরা মু'মিনঃ ৬০)

এভাবে পবিত্র কোরআনে অনেক স্থানেই বলা হয়েছে, আমি বান্দার অত্যন্ত কাছে অবস্থান করি, বান্দাহ্ যখন আমাকে ডাকে আমি সে ডাকের সাড়া দিয়ে থাকি। কোরআনের এসব ঘোষণা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বান্দার দোয়া ও আবেদন, নিবেদন ও কাকুতি-মিনতি শুনে আল্লাহ্ নিজে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা অবশ্যই সংরক্ষণ করেন। এ কথা চিরসত্য যে, বান্দাহ্ আল্লাহর সিদ্ধান্তসমূহ এড়িয়ে যেতে পারে না বা তাঁর কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার সামান্যতম ক্ষমতাও রাখে না। আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন।

সুতরাং দোয়া কবুল হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় দোয়ার অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে। কোন দোয়া-ই বৃথা যায় না। একটি না একটি কল্যাণ অবশ্যই লাভ করা যায়। সে কল্যাণের ধরণ হলো, বান্দাহ্ তার মালিক, মনিব, প্রভু, প্রতিপালকের সামনে নিজের

অভাব ও প্রয়োজন পেশ এবং দোয়া করে, সাহায্য কামনা করে তাঁর প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয় এবং নিজের দাসত্ব ও অক্ষমতা, অপারগতা ও দুর্বলতার কথা স্বীকার করে। নিজের দাসত্বের এই স্বীকৃতিই যথাস্থানে একটি ইবাদাত বা ইবাদাতের প্রাণসত্তা। বান্দাহ্ যে সাহায্য কামনা করলো বা যে উদ্দেশ্যে দোয়া করলো সেই বিশেষ জিনিসটি তাকে দেয়া হোক বা না হোক, তার আশা পূরণ হোক বা না হোক, কোন অবস্থায়ই তার দোয়ার প্রতিদান থেকে সে বঞ্চিত হবে না। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ الاَّ الدُّعَاءُ– (رواه الترمذى)

"দোয়া ব্যতীত আর কোন কিছুই তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না।"

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, কোনো কিছুর মধ্যেই আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই। কিন্তু আল্লাহ স্বয়ং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা তখনই তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন, যখন বান্দাহ্ কাতর কণ্ঠে তাঁর কাছে দোয়া করে, সাহায্য চায়। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْعُوْ بِدُعَاءٍ اِلاَّ اَتَاهُ اللّٰهُ مَا سَاَلَ اَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ–

"বান্দাহ্ যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ্ তখন হয় তার প্রার্থিত জিনিস তাকে দান করেন অথবা তার ওপরে সে পর্যায়ের বিপদ আসা বন্ধ করে দেন, যদি সে গোনাহের কাজে বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না করে।" (তিরমিযী)

হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا اِثْمٌ وَلاَ قَطِيْعَةُ رَحِمٍ اِلاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِحْدٰى ثَلٰثٍ–اِمَّا اَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ– وَاِمَّا اَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِى الاٰخِرَةِ وَاِمَّا اَنْ يَّصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا– (احمد)

"একজন মুসলমান যখনই কোনো দোয়া করে তা যদি কোনো গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তা তিনটি অবস্থার যে কোনো এক অবস্থায় কবুল করে থাকেন। হয় তার দোয়া এই পৃথিবীতেই কবুল করা হয়, নয় তো আখিরাতে প্রতিদান দেয়ার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় অথবা তার ওপরে ঐ পর্যায়ের কোনো বিপদ আসা বন্ধ করা হয়।"

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন–

اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنْ شِئْتَ، اِرْحَمْنِىْ اِنْ شِئْتَ-اُرْزُقْنِىْ اِنْ شِئْتَ-وَلْيُعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ-

"তোমাদের কোনো ব্যক্তি দোয়া করলে সে যেন এভাবে না বলে, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি চাইলে আমার প্রতি রহম করো এবং তুমি চাইলে আমাকে রিযিক দাও। বরং তাকে নির্দিষ্ট করে দৃঢ়তার সাথে বলতে হবে, হে আল্লাহ! আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করো।" (বোখারী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন–

اُدْعُو اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْاِجَابَةِ-

"আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দোয়া করো।" (তিরমিযী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) জানিয়েছেন–

يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ مَالَمْ يَسْتَعْجِلْ، قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ اَرَ يُسْتَجَابُ لِىْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذٰلِكَ وَ يَدَعُ الدُّعَاءَ-

"যদি গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় এবং তাড়াহুড়া না করা হয় তাহলে বান্দার দোয়া কবুল করা হয়। রাসূলের কাছে জানতে চাওয়া হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়োর বিষয়টি কি? তিনি জানালেন, তাড়াহুড়ো হচ্ছে ব্যক্তির এ কথা বলা যে, আমি অনেক দোয়া করেছি কিন্তু দেখছি আমার কোনো দোয়াই কবুল হচ্ছে না। এভাবে সে অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং দোয়া করা থেকে বিরত থাকে।" (মুসলিম)

তিরমিজী শরীফে একটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) জানিয়েছেন, "তোমাদের প্রত্যেকের উচিত রব-এর কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করা। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও তা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।" (তিরমিযী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন–

لَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ– (الترمذى)

"আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে অধিক সম্মানের জিনিস আর কিছুই নেই।"

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত ইবনে উমর ও মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) জানিয়েছেন–

اِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَ مِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ–

"যে বিপদ আপতিত হয়েছে তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী এবং যে বিপদ এখনো আপতিত হয়নি তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা, তোমাদের দোয়া করা কর্তব্য।" (তিরমিযী, আহ্‌মাদ)

হযরত ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

سَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُّسْاَلَ–

"আল্লাহর কাছে তার করুণা ও রহমত প্রার্থনা করো। কারণ, আল্লাহ তাঁর কাছে প্রার্থনা করা পছন্দ করেন।" (তিরমিযী)

দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করার ব্যাপারে এ ধরণের অনেক হাদীস রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে দোয়া করতে হবে, সাহায্য চাইতে হবে তা অনুগ্রহ করে তিনি তাঁর বান্দাকে শিখিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে এমন অনেক দোয়া রয়েছে। মানুষ যে বিষয়গুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিজের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে বলে ধারণা করে সে বিষয়েও ব্যবস্থা গ্রহণ বা কর্মে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে। কারণ, কোন বিষয়ে মানুষের কোন চেষ্টা-সাধনা-তদবীরই আল্লাহর রহমত, তাঁর সহযোগিতা ও তাওফিক এবং সাহায্য ব্যতিত সফল হতে পারে না। চেষ্টা-সাধনা শুরু করার পূর্বে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার অর্থ হলো,

বান্দা সর্বাবস্থায় তার নিজের অক্ষমতা ও আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছে। সে যে আল্লাহর বান্দা একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, ইবাদাত ও পূজা উপাসনা করছে এবং সেই সাথে মহান আল্লাহ্র কল্পনাতীত ক্ষমতা, সম্মান- মর্যাদার কথা দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অকপটে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এই কথাগুলোই সূরা ফাতিহার মধ্য দিয়ে বান্দা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে নামাজে বারবার বিনয়ের সাথে বলতে থাকে, হে আল্লাহ ! আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি।

দোয়া জান্নাতের চাবি

মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্যে ইবাদাতের প্রাণশক্তি হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মুখাপেক্ষীতা, তাঁর শাহী দরবারে মনে প্রাণে নিজেকে একান্তই ফকীর মিসকীন, নিঃস্ব-অসহায়, দুর্বল, শক্তিহীন দীনহীন ভিক্ষুকের মতো করুণাপ্রার্থী হয়ে দুই হাত পেতে আবেগভরা কান্না বিজড়িত কণ্ঠে ধর্ণা দেয়া। এ জন্যে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ–

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট চাওয়াটাও ইবাদাত।"

নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে আলীশানে কিভাবে চাইতেন, তিনি কিভাবে নিজেকে রাব্বুল আলামীনের শাহী দরবারে সোপর্দ করে দিয়ে করুণ কণ্ঠে আবেদন জানাতেন, তিনি মায়া-মমতা, করুণা, দয়া, অনুগ্রহ উদ্রেককারী শব্দ চয়ন করে কিভাবে শ্রাবণের বারি ধারার মতো অশ্রু ঝরিয়ে সমগ্র সৃষ্টি জগতের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মহান মালিকের দরবারে বিনীত নিবেদন করতেন তার একটি নমুনা দেখুন–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَسْمَعُ كَلَامِىْ وَتَرٰى مَكَانِىْ وَتَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ لَايَخْفٰى عَلَيْكَ شَىْءٌ مِنْ اَمْرِىْ اَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ الْوَاجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِىْ اِلَيْكَ اَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَاَبْتَهِلُ اِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَادْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ دُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ

لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عِبْرَتُهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ

اَنْفُهُ- اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْنِى بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَ كُنْ بِى رَؤُفًا

رَّحِيْمًا يَا خَيْرَالْمَسْؤُلِيْنَ وَيَا خَيْرَا الْمُعْطِيْنَ- (كنز

العمال، طبرانى، عن ابن عباس (رض) ابن جعفر رض)

"হে আল্লাহ! তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো, আমি কোথায় এবং আমার অবস্থা তুমি দেখতে পাচ্ছো। আমার প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয় তুমি অবগত রয়েছো। তোমার কাছে আমার কোনো বিষয়ই অজ্ঞাত নয়। আমি বিপদগ্রস্ত, অসহায়, আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি ভীত সন্ত্রস্ত্র, আমার ভুল-ক্রটির জন্য আমি অনুতপ্ত- লজ্জিত। আমি তোমার দরবারে সেভাবে অসহায়ত্ব পেশ করছি যেভাবে কোনো অপরাধী ব্যক্তি নিজের অপরাধের জন্য বিনয় পেশ করে থাকে। আমি তোমাকে সেভাবে ডাকছি, যেভাবে একজন ভীত সন্ত্রস্ত্র ব্যক্তি নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ডাকতে থাকে।এ ডাক এমন ব্যক্তির, যার গর্দান তোমার দরবারে নত হয়ে রয়েছে। যার চোখের পানি তোমার দৃষ্টির সম্মুখে ঝরে গড়িয়ে যাচ্ছে, যার দেহ-মন (আপাদ-মস্তক) তোমারই সম্মুখে অবনমিত, যার নাক তোমার সম্মুখে ধূলায় ধূসরিত।

হে আল্লাহ! তুমি এমনটি করোনা যে, আমি তোমার কাছে চাওয়ার পরেও বঞ্চিত থাকি। আমার জন্য তুমি পরম করুণময় দয়াবান হয়ে যাও। তুমি সেই মহান সত্তা– যিনি প্রার্থনাকারীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।" (কানযুল উম্মাল, তাবারাণী)

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! বিশ্বনবী রাসূলে করীম (সাঃ)-এর অসংখ্য দোয়া থেকে একটি দোয়া এখানে নমুনা হিসেবে পেশ করা হলো। উল্লেখিত এই দোয়াটি কোন্ মহামানব মহান আল্লাহর দরবারে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিয়ে অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় করুণা বিগলিত কণ্ঠে, হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি-ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা উজাড় করে দিয়ে, নিজের সুউচ্চ মস্তক ও নাসিকা ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে অনুতাপের অশ্রুধারা প্রবাহিত করে নিজের দাড়ি মোবারক ভিজিয়ে দিতেন। তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর পবিত্র জীবন চরিতের সকল ইতিহাস কিছুক্ষণের জন্যে চোখ দুটো বন্ধ করে কল্পনা করে দেখুন।

তাঁর পুত ও পবিত্র জীবনের ছোট-বড় সকল ঘটনা, গৃহের অভ্যন্তরে ও গৃহের বাইরের, একাকী অবস্থার ও অগণিত লোকজনের সাথে, সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের

সাথে, নিকট আত্মীয় ও দূরবর্তী পরিচিত-অপরিচিত লোকদের সাথে, যুদ্ধের ময়দানে সিপাহ্সালার হিসেবে, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে, সমাজ সংস্কারক, বিজ্ঞানী ও বিশ্বনেতা হিসেবে, পিতা ও স্বামী হিসেবে, একজন শ্রমজীবী হিসেবে এবং সাড়ে বার লক্ষ বর্গ মাইল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক সর্বোপরি বিশ্বনবী হিসেবে, যেখানে যে অবস্থায় তিনি যত কথা ও কাজ করেছেন, এসব কথা ও কাজের মধ্যে সামান্যতম কোনো ভুল বা অসামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

বিগত পনের শত বছরব্যাপী সারা দুনিয়া জুড়ে চিন্তাবিদ-গবেষকগণ তাঁকে কেন্দ্র করে যত গবেষণা করেছেন, পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষকে কেন্দ্র করে এর শত ভাগের একভাগ গবেষণাও করেছে কিনা সন্দেহ। তবুও তাঁর জীবন চরিতে সামান্যতম কালো দাগও কেউ খুঁজে পায়নি। যাঁর জীবন কর্ম ও কথায় সুচাগ্র পরিমাণ ভুলও কেউ-ই আবিষ্কার করতে পারেনি। তিনি ছিলেন মাসুম, বেগুনাহ্, নিষ্পাপ, কলুষ কালিমামুক্ত। ভুল, অক্ষমতা, গোনাহ্ ও ব্যর্থতা, লজ্জিত হওয়া বা অনুতপ্ত-অনুশোচনা নামক বিশেষণসমূহের একটি দাড়ি-কমাও তাঁর পুত ও পবিত্র জীবনে অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেছেন এবং যে সকল ওহী একান্তই তাঁর সাথে সম্পর্কিত, পবিত্র কোরআনের সেই বাক্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, দেখতে পাবেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবের সাথে উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে কত সম্মান-মর্যাদার সাথে তাঁর সাথে কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক নবী-রাসূলকে নামসহ ডাকলেও কখনো নবী করীম (সাঃ) কে নাম ধরে সম্বোধন করেননি। অন্যান্য সকল নবী-রাসূলকে নির্দিষ্ট স্থানে আহ্বান করে তারপর ওহী প্রদান করেছেন। কিন্তু তাঁকে নির্দিষ্ট কোনো স্থানে আহ্বান করার প্রয়োজনীয়তা আল্লাহ তা'য়ালা অনুভব করেননি। যেখানে যে অবস্থায় তিনি অবস্থান করেছেন, সেখানেই তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করে সম্মানিত করেছেন। সেই মহামানবের কত সম্মান কত বিরাট বিশাল উচ্চ মর্যাদা তা সাধারণ কোনো মানুষের পক্ষে কল্পনাও করা অসম্ভব।

তবুও সেই মহামানব নবী করীম (সাঃ) মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে নিজের আকাশ চুম্বি উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন মস্তক-নাসিকা সিজদায় অবনত করে দিয়ে ধূলায় ধূসরিত হয়ে নিজের অক্ষমতা বারবার প্রকাশ করে কিভাবে অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, তা কল্পনা করে দেখুন। সকল ভুল-ত্রুটি ও গোনাহের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেও তিনি কিভাবে মহান মালিকের দরবারে ধর্ণা দিয়ে

নিতান্তই অসহায়ভাবে করুণ কণ্ঠে হৃদয় মথিত কান্নায় সিজদার স্থান ভিজিয়ে দিয়েছেন কল্পনা করুন। যিনি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান আল্লাহ্র পরেই যাঁর পবিত্র অবস্থান, মহান মালিকের পরেই যাঁর সুউচ্চ মর্যাদা, সেই মহামানবের প্রার্থনা-দোয়া সমূহের প্রত্যেকটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন, বারবার পড়ুন এবং অনুধাবন করুন নিজেদের পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত অবস্থার কথা।

আমাদের মতো গোনাহ্গার বান্দা, যারা দিনরাত অহর্নিশ অসংখ্য অপরাধ করছি, পাপের সমুদ্রে বারবার অবগাহন করছি, চিন্তা-চেতনায়, কথাবার্তায় ও কর্মে প্রত্যেক দিন অসংখ্য অপরাধের সাগরে সিক্ত হচ্ছি, তাহলে আমাদেরকে কিভাবে, কতটা বিনয় ও নম্রতার সাথে, কি পরিমাণ লজ্জা ও অনুতাপের সাথে মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সিজদায় অবনত হয়ে অশ্রুধারায় সিজদার স্থান ভিজিয়ে দিয়ে ইস্তেগফার ও দোয়া করা প্রয়োজন, তা কল্পনা করে দেখুন তো!

আমাদের জীবনকাল সূর্যের প্রখর উত্তাপে রাখা বরফ খন্ডের মতোই গলে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, যেটুকু জীবনকাল অবশিষ্ট রয়েছে, এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টুকু অবহেলায় নষ্ট না করে যত্নের সাথে কাজে লাগাতে হবে। অধিক তাওবা-ইস্তেগফার করা, শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করা, নফল রোজা রাখা, নফল নামাজ আদায় করা, কোরআন মজীদ তিলাওয়াত করা, নিতান্তই অপরাধী ও দীনহীন ভিখারীর মতো দুই হাত মহান মালিকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে করুণ কান্নায় নিজেকে সিক্ত করার এখনই সময়।

চলে যাওয়া সময় আর ফিরে আসবে না। এই চোখ দুটো একবার চির নিদ্রায় নিদ্রিত হলে পৃথিবীর সকল চিকিৎসক একত্রিত হয়ে প্রচেষ্টা চালালেও সেই বন্ধ চোখে স্পন্দন ফিরিয়ে আনতে পারবে না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত নাক থেকে নিঃশ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে, চোখের তারায় স্পন্দন রয়েছে, হৃদয়ে কল্পনা শক্তি রয়েছে, ততক্ষণই মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর বিধান নিজে- নিজ পরিবারে অনুসরণ করতে হবে এবং সমাজ ও দেশে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আমৃত্যু প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্তই মহান মালিকের সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করতে হবে। আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে কোরআন-হাদীসের বিধান অনুসরণ করে আখিরাতের অনন্ত জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করার তাওফীক মহান আল্লাহ তা'য়ালা সকলকে দান করুন।

ইবাদাত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর-ই জন্যে

একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইবাদাত, দাসত্ব ও বন্দেগী করা জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও প্রকৃতিরই দাবী। মানুষের সৃষ্টি ও তার প্রতিপালনের ব্যাপারে যাদের কোনই ভূমিকা নেই এবং থাকতে পারে না, তাদের ইবাদাত করা মূর্খতার নামান্তর এবং অযৌক্তিক। মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, মানুষ কেবলমাত্র তাঁরই বন্দেগী করবে এটাই হলো যুক্তি ও বিবেকের দাবী। বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত মালিক ও শাসনকর্তাই হলেন আল্লাহ্ এবং তিনিই হলেন প্রকৃত মা'বুদ। তিনিই প্রকৃত মা'বুদ হতে পারেন এবং তাঁরই মা'বুদ হওয়া উচিত।

রব অর্থাৎ মালিক, মনিব, শাসনকর্তা এবং প্রতিপালক হবেন একজন আর ইলাহ্ অর্থাৎ আনুগত্য, বন্দেগী ও দাসত্ব বা ইবাদাত লাভের অধিকারী হবেন অন্যজন, এটা সম্পূর্ণ জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধির অগম্য যুক্তি। মানুষের লাভ-ক্ষতি, কল্যাণ অকল্যাণ, তার অভাব ও প্রয়োজন পূরণ হওয়া, তার ভাগ্য ভাঙা-গড়া, তার নিজের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বই যার ক্ষমতার অধীন–তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করা এবং তাঁরই সামনে আনুগত্যের মাথানত করা মানব প্রকৃতিরই মৌলিক দাবী। এটাই তার ইবাদাত তথা দাসত্বের মৌলিক কারণ। মানুষ যখন একথাটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, ক্ষমতার অধিকারীর ইবাদাত বা দাসত্ব না করা এবং ক্ষমতাহীনের আনুগত্য বা ইবাদাত করা দুটোই জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও প্রকৃতির সুস্পষ্ট বিরোধী।

কর্তৃত্বশালী–ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগকারী আনুগত্য, দাসত্ব বা ইবাদাত লাভের অধিকারী হন। যাদের কোনো ক্ষমতা নেই, কর্তৃত্ব নেই, কোনো কিছু করার স্বাধীন ক্ষমতা নেই, তারা আনুগত্য বা দাসত্ব লাভের অধিকারী হন না। এসব দুর্বল সত্তার দাসত্ব বা আনুগত্য করে এবং তাদের কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করে শুধু নিরাশই হতে হয়–কিছু পাওয়া যায় না। কারণ একজন ভিখারী আরেকজন ভিখারীর চাহিদা মেটাতে পারে না। মানুষের কোনো আবেদনের ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোনো ক্ষমতাই দুর্বল সত্তাদের নেই।

এদের সামনে বিনয়, দীনতা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে মাথানত করা এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা ঠিক তেমনিই নির্বুদ্ধিতার কাজ, যেমন কোনো ব্যক্তি শাসনকর্তার সামনে উপস্থিত হয়ে তার কাছে আবেদন পেশ করার পরিবর্তে তারই মতো অন্য আবেদনকারীগণ সেখানে আবেদন-পত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে কারো সামনে দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা।

দাসত্ব লাভ ও প্রার্থনা মঞ্জুর করার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। তিনি শুধু পৃথিবী সৃষ্টিই করেননি বরং তিনিই এর সব জিনিসের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। পৃথিবীর সমস্ত বস্তু যেমন তাঁর সৃষ্টি করার কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেছে তেমনি তাঁর টিকিয়ে রাখার কারণেই টিকে আছে। তাঁর প্রতিপালনের কারণেই সমস্ত কিছু বিকশিত হচ্ছে এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের অসীম কল্যাণে তা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে–

لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ–

"আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক। পৃথিবী ও আকাশের ভান্ডারের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে।" (সূরা আয যুমারঃ ৬৩)

যিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষক, প্রতিপালক এবং যাঁর হাতে রয়েছে সবকিছুর চাবিকাঠি, তাঁরই ইবাদাত লাভের যোগ্যতা রয়েছে, আর মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাদের ইবাদাত করছে, তারা সবই ঐ আল্লাহরই গোলাম। গোলাম হয়ে যারা গোলামদের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দিয়েছে, এদেরকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মূর্খ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ–

"এদেরকে বলে দাও, হে মূর্খেরা, তাহলে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দাসত্ব করতে বলো আমাকে?" (সূরা যুমারঃ ৬৪)

মহান আল্লাহর ক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তিনি সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র অধিকারী, প্রার্থনা মঞ্জুরকারী এবং এ জন্যই তাঁরই দাসত্ব করতে হবে। তাঁরই কাছে প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ–اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ
عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ–

"তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। যেসব মানুষ অহঙ্কার বশতঃ আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সূরা মু'মিনঃ ৬০)

তৃতীয় অধ্যায়

পাক-পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক

ইসলামে পাক-পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে এবং এ কারণেই মুসলমানগণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পসন্দ করে। একজন মুসলমানের আল্লাহভীরুতা যত উচ্চ পর্যায়ে উপনীত হবে সে মুসলমান বাহ্যিক দিক থেকে দৈহিকভাবেও ততটা পাক-পবিত্রতা অবলম্বন করবে। এ জন্যে নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বার বার গোসল করা, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্রতা অবলম্বনকারী ও পবিত্র বস্ত্র পরিধানকারী লোককে আল্লাহ তা'য়ালা অত্যধিক পসন্দ করেন এবং এই ধরণের লোককে তিনি ভালোবাসেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ–

"আল্লাহ্ অবশ্যই সেসব লোকদের ভালোবাসেন যারা আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে এবং যারা পাক-পবিত্রতা অবলম্বন করে।" (সূরা বাকারাঃ ২২২)

দৈহিক দিক থেকে পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করলে তা মন-মানসিকতার ওপর প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আর ঠিক এ কারণেই ইসলাম শুধুমাত্র পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনেরই আদেশ দেয়নি, এ জন্যে বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতিরও দিক নির্দেশনা দিয়েছে। যেমন প্রত্যেক দিন কমপক্ষে পাঁচ বার অযু করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে, প্রত্যেক দিন সম্ভব না হলেও দুই তিন দিন পর গোসল করা মুস্তাহাব করেছে এবং প্রত্যেক জুম্'আ'র দিন গোসল করা চিরস্থায়ী সুন্নাতে পরিণত করেছে।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার সাথে সাথে ইস্তেনজা করা, দিন-রাতে নামাজের জন্যে অযু করা, অযুর সময় প্রয়োজনীয় বাহিক্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা, নাকে পানি প্রবেশ করানো, কুলি করা, দাঁত পরিষ্কার করা, হাত ও পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকসমূহ ধৌত করা, দেহের বিশেষ বিশেষ স্থানের পশম পরিষ্কার করা এবং হাত-পায়ের নখ পরিষ্কার করাসহ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করে এসবকে পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার অন্তর্গত বলে ঘোষণা করেছে। নবী করীম (সাঃ) পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অর্ধেক বলে গণ্য করে বলেছেন–

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ–

"পবিত্রতা ঈমানের শর্ত।" (মুসলিম, হাদীস নং- ২২৩)

অযু অবস্থায় থাকার মধ্যে অসীম কল্যাণ

মুসলমানদের কাছে অযুর বিষয়টি একান্তই পরিচিত এবং এ কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেকীর কাজ। অযু করা পবিত্রতা অর্জনের অন্তর্গত এবং খুবই সহজ পন্থাই নেকী অর্জনের মাধ্যম বিশেষ। অযু সকল নবী-রাসূলগণের সুন্নাত এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে এ সুন্নাত আমল করা একান্ত আবশ্যক। আমরা সাধারণত দিনরাতে অনেক বার হাত মুখ ধুয়ে থাকি। হাত মুখ ধোয়ার নিয়মটি একটু পরিবর্তনের মাধ্যমে অযুর নিয়মে পরিণত করে হাত মুখ ধুলেই আমরা অযুর সওয়াব পেতে পারি। এই সহজ নেকীর কাজটি করে আমলনামার ওজন বৃদ্ধি করার জন্যে শুধুমাত্র ইচ্ছাই যথেষ্ট।

পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক এবং অযু করা অত্যন্ত বরকতময় আমল। যে ব্যক্তি সর্বদা অযু অবস্থায় থাকে সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর হেফাজতে থাকে। ঘুমানোর পূর্বে অযু করা, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বিছানায় শোয়া, ঘুমানোর পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ সূরা ও দোয়াসমূহ পড়া গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতী আমল। রাতে ঘুমানোর পূর্বে যে মুসলমান অযু করে তার নিরাপত্তার জন্যে একজন ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত করা হয়। ঐ মুসলমান যতক্ষণ ঘুম থেকে না জাগে বা রাতে যখনই সে জাগে, তখন উক্ত ফিরিশ্‌তা ঐ ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্যে দোয়া করে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِيْ شِعَارِهِ مَلَكٌ فَلاَ يَسْتَيْقِظُ اِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلاَنٍ فَاِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا–

"যে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে তার জন্যে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করা হয়। যখন সে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগে, সে ফিরিশ্‌তা বলতে থাকে, 'হে আল্লাহ! তুমি তোমার পক্ষ থেকে এই বান্দাকে পুরস্কৃত করো। কারণ সে পবিত্র অবস্থায় শুয়েছিলো।" (ইবনে হাব্বান, হাদীস নং- ১০৪৮)

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, যে মুসলমান রাতে ঘুমানের পূর্বে অযু করে ঘুমিয়েছে এবং ঘুমের মধ্যে যতবার সে পার্শ্ব পরিবর্তন করেছে, ততবারই ফিরিশ্‌তা তার মাগফিরাতের জন্যে দোয়া করে।

لاَيَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ اِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ: أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَاِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا–

"রাতের যে কোনো অংশে যখন সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে ফিরিশ্‌তা বলতে থাকে, 'হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাকে মাগ্‌ফিরাত দান করো, কারণ সে পবিত্র অবস্থায় রাত অতিবাহিত করেছে।" (মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৮)

যে মুসলমান অযু করে ঘুমায় তার জন্যে মহান আল্লাহ বরকত ও কল্যাণের ফায়সালা করে তাকে সম্মানিত করেন। এর মধ্যে সবথেকে বড় ফযিলত হলো, রাতে যখনই ঐ বান্দা ঘুম থেকে সজাগ হয়ে যে দোয়াই করে তা কবুল করা হয়। দুনিয়া-আখিরাতের যে কল্যাণ সে কামনা করে, রাতে যা সে চাইতে পারে তা দান করা হয়। কারণ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, অযু অবস্থায় যারা রাতে ঘুমায় তাদের দোয়া কবুল করা হয়। যে ব্যক্তি অযু করে এবং অযুর হেফাজত করে, নবী করীম (সাঃ) তার প্রশংসা করে বলেছেন, অযুর হেফাজতকারী মুমিন। (ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং- ২৭১)

দিনরাতে অধিকাংশ সময় আমাদেরকে অযু অবস্থায় থাকা উচিত। অযুর মধ্যে দুটো দিক রয়েছে, একটি হলো প্রকাশ্য ও আরেকটি গোপনীয়। প্রকাশ্য দিকটি হলো, অযু থাকার ফলে বাহ্যিক দিক থেকে পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে। আর গোপনীয় দিকটি হলো, অযু বজায় থাকার কারণে হৃদয়ে ঈমানের আলো বিকশিত হতে থাকে এবং নবী করীম (সাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণের কারণে বরকত লাভ হয়। বাহ্যিক দিক থেকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়াই শুধু অযুর উদ্দেশ্য নয়, বরং রুহ্ বা কালব্-এর পবিত্রতা অর্জনই এর মূল লক্ষ্য। প্রত্যেক মুমিনের জন্যে এটা সম্মান-মর্যাদার কারণ যে, তারা সবসময় অযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করবে।

শীত প্রধান দেশে বা পানির স্পর্শে গেলেই যাদের সর্দি-জ্বর বা অন্য কোনো সমস্যা হয়, তাদের জন্যে ইসলাম তায়াম্মুমের ব্যবস্থা দিয়েছে। কিন্তু একটু কষ্ট স্বীকার করে হলেও অযু করাই উত্তম এবং এ কষ্টের কারণে আল্লাহ তা'য়ালা বিপুল বিনিময় দান করবেন। নবী করীম (সাঃ) এ সম্পর্কে বলেন, যে সকল কাজে গোনাহের কাফ্‌ফারা আদায় হয় তার মধ্যে কষ্ট স্বীকার করে অযু করা অন্যতম এবং নেকীর কাজ। (জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং-৩০৪৫)

এ বিষয়ে অন্যত্র আরেক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, পানির স্পর্শে গেলে সমস্যা সৃষ্টি বা জ্বর-সর্দি হবার সম্ভাবনা থাকার পরও অযু করা, নামাজ আদায়ের জন্যে মসজিদের দিকে যাওয়া এবং এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে আরেক ওয়াক্তের জন্যে উদগ্রীব থাকা এমনই উচ্চ পর্যায়ের নেকীর কাজ, যা সকল গোনাহ্‌কে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয়। (মুসনাদে আবি ইয়া'লা, হাদীস নং-৪৮৮, মাজমাউ'য যাওয়ায়েদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬)

অযু করতে হলে পানির স্পর্শে যেতেই হবে এবং পানির স্পর্শে গেলে কেউ যদি অসুবিধা অনুভব করে এবং অসুবিধার মাত্রা যদি সহনীয় না হয়, তাহলে অযু না করে তায়াম্মুম করাই উত্তম। কিন্তু অসুবিধা যদি সহনীয় পর্যায় অতিক্রম না করে, তাহলে অযু করাই উচিত এবং এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে–

أَلاَادُلُّكُمْ عَلى مَا يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ–

"আমি কি তোমাদেরকে এমন নেকীর কাজের কথা বলবো না, যে কাজ করলে আল্লাহ্ তা'য়ালা গোনাহ্ মুছে দিবেন এবং সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন? (সে কাজ হলো) সর্দি বা অন্য কোনো অসুস্থতা থাকার পরও অযু করা, দ্রুত মসজিদের দিকে যাওয়া এবং এক ওয়াক্তের নামাজ আদায় করে পরবর্তী ওয়াক্তের নামাজ আদায় করার জন্য উদগ্রীব থাকা। এই তিনটি নেকীর কাজই তোমাদের জন্যে জিহাদ, জিহাদ এবং জিহাদ।" (মুসলিম, হাদীস নং-২৫১, তিরমিযী, হাদীস নং-৫১, ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং-৪২৮)

সর্দি-জ্বর হলে, বরফের দেশে বা শীত প্রধান এলাকায় অবস্থান করলে অযু করলে কিছুটা অসুবিধা অনুভব হয়। কিন্তু এসব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অযু করলে অনেক বেশী নেকী অর্জন কর যায়। হাদীসে বলা হয়েছে–

مَنْ اَسْبَغَ الْوُضُوْءَ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيْدِكَانَ لَهٗ كِفْلاَنِ مِنَ الأَجْرِ–

"যে ব্যক্তি প্রবল সর্দি রোগে আক্রান্ত হবার পরও অযু করে তার জন্যে বিপুল পরিমাণ নেকী রয়েছে।" (মাজমাউ'য যাওয়ায়েদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৩৭)

অযু শুধু মাত্র নামাজ আদায় বা কোরআন তিলাওয়াতের জন্যেই নয়, সবসময় অযু অবস্থায় থাকা খুবই নেকীর কাজ। প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমরা কেউ-ই কামনা করি না যে, আমাদের মৃত্যু অপবিত্র অবস্থায় বা অযুহীন অবস্থায় হোক। মৃত্যু যে কোনো সময় হানা দিতে পারে। রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ বা কোনো ধরণের দুর্ঘটনার মাধ্যমেও মৃত্যু হতে পারে এবং এ মৃত্যু

কখন কি অবস্থায় আসবে, তা কারোই জানা নেই। সুতরাং মলমূত্র ত্যাগের পরেই অযু করা নবী-রাসূলদের নীতি এবং এভাবে অযু অবস্থায় যে মৃত্যুবরণ করলো সে অবশ্যই পবিত্র অবস্থায় মহান আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিলো। মৃত্যু মানুষের খুবই কাছে অবস্থান করে, মানুষ যদি দেখতে পেতো যে মৃত্যু তার কত কাছে, তাহলে সে মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে জীবন-যাপনের জন্যে কোনো ধরণের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হতো না।

ইসলাম অযুকে তার বুনিয়াদী আরকানসমূহের সাথেই বর্ণনা করেছে। 'হাদীসে জিবরাঈল' একটি বিখ্যাত হাদীস, হাদীসটির মধ্যে অযু সম্পর্কে বলা হয়েছে, নিজের অযুকে সহীহ্ এবং পরিপূর্ণ করো। (ইবনে খুযাইমা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪, হাদীস নং-১)

অযুর গুরুত্ব মুসলমানদেরকে বুঝাতে গিয়ে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ–

"কিয়ামতের ময়দানে যখন আমার উম্মতদেরকে আহ্বান জানানো হবে, তখন তাদের অযুর স্থান থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। সুতরাং নিজেদের জন্য যদি অধিক পরিমাণে আলো কামনা করো, তাহলে সবসময় অযু অবস্থায় থাকো।" (বোখারী, হাদীস নং-১৩৬)

অযু করার সময় দেহের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া হয়, কিয়ামতের ময়দানে ঐ দেহের ঐ সকল স্থান থেকে আলো বা নূর চমকাতে থাকবে। আর এটা হবে একমাত্র অযুর কল্যাণের কারণে। সুতরাং এই সুযোগ কোনো মুসলমানেরই হারানো উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হায়াতে রেখেছেন ততক্ষণ অযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করতে হবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ–

"মুমিন ঐ পর্যন্ত অলঙ্কারে সজ্জিত থাকবে, যে পর্যন্ত তার অযু থাকবে।" (মুসলিম, হাদীস নং- ২৫০, বোখারী, হাদীস নং-৫৯৫৩)

ইমাম মানযুরী (রাহঃ) বলেছেন, যে অলঙ্কার মুমিনদেরকে অযুর কারণে পরানো হবে, তা জান্নাতীদের অলঙ্কার। (তারগীব, হাদীস নং-২৮৭)

স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) অযুর কারণে কিয়ামতের দিনে তাঁর নিজ উম্মতকে চিনতে পারবেন। এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ اُمَّتِكَ؟ قَالَ غُرٌّ مُحَجَّلُوْنَ بُلْقٌ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ-

"হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি আপনার ঐ সকল উম্মতকে কিয়ামতের ময়দানে চিনবেন কিভাবে, যাদেরকে আপনি পৃথিবীতে দেখেননি? জবাবে তিনি বললেন, তাদের অযুর স্থান থেকে সাদা শুভ্র আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকবে আর এটা দেখেই আমি তাদেরকে চিনবো।" (ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং-২৮৪)

অযু করার নগদ প্রাপ্তি হলো, অযু করার সাথে সাথে ক্ষমারযোগ্য গোনাহ্ ঝরে যায় অর্থাৎ অযু করার পূর্ব পর্যন্ত বান্দার মাধ্যমে যে সব গোনাহ্ সংঘটিত হয়, একবার অযু করলে তা ঝরে যায়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهٖ-

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আশাবাদী হয়ে যথাযথ প্রক্রিয়ায় অযু করে তার দেহ থেকে সকল গোনাহ্ ঝরে যায়, এমনকি তার নখের নীচে যেসব গোনাহ্ থাকে তা-ও ঝরে যায়।" (মুসলিম, হাদীস নং-২৪৫, ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং-২৮৫)

অযু করা তেমন কোনো পরিশ্রমের কাজ নয়, সামান্য একটু সময় ব্যয় হয় মাত্র। অথচ এই কাজটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর বিনিময়ে কত অসীম সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায় তা মানুষের কল্পনারও অতীত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

لَايُسْبِغُ عَبْدٌ الْوُضُوْءَ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَأَخَّرَ-

"যে বান্দা সঠিক পদ্ধতিতে পরিপূর্ণভাবে অযু করে আল্লাহ তা'য়ালা তার পূর্বের ও পরের সকল গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন।" (বায্যার, হাদীস নং-২৬২, মুজমাউয যাওয়ায়েদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৩৬)

সহীহভাবে অযু করা এবং অযু সংরক্ষণ করা ঈমানের পরিচয়। অযু করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া প্রয়োজন তা যথাযথভাবে ধোয়া হলো কিনা। অযু সংরক্ষণ বলতে সবসময় অযু বহাল রাখার চেষ্টা করা। বান্দা যতক্ষণ সময় অযু অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ তার আমলনামায় সওয়াব পূর্ণ হতে থাকে। নবী করীম (সাঃ) বলেন-

لَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوْءِ اِلاَّ مُؤْمِنٌ-

"মুমিন ব্যতীত আর কেউ-ই অযুর হেফাজত করে না অর্থাৎ অযু সংরক্ষণ করে না।" (ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং-২৭৭)

যারা অযুর হেফাজত করবে তথা সবসময় অযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করবে, তাদের লক্ষ্য করে নবী করীম (সাঃ) চরম বিপদের দিনে এক মহাসুসংবাদ শুনিয়েছেন-

فَاِنَّهُمْ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَاَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ-

"যারা অযু করে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে শুভ্রতা প্রকাশ পাবে তথা নূর চমকাতে থাকবে। আর আমি হাউজে কাউসারে তাদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকবো।" (মুসলিম, হাদীস নং-২৪৯, ইবনে হাব্বান, হাদীস নং-১০৪৩)

হাদীসে বলা হয়েছে পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ, সুতরাং অযু করাও ঈমানের অঙ্গ বিশেষ। হযরত বিলাল (রাঃ) সবসময় অযু অবস্থায় থাকতেন। যখন তাঁর অযু ভঙ্গের কারণ ঘটতো, সাথে সাথে তিনি অযু করে দুই রাকাআত 'তাহ্ইয়াতুল অযু' নামাজ আদায় করতেন। অতি সাধারণ এই আমলের কারণে নবী করীম (সাঃ) জান্নাতে হযরত বিলাল (রাঃ)-এর হাঁটার শব্দ শুনেছিলেন। সবসময় অযু অবস্থায় থাকা প্রত্যেক মুসলমানেরই অভ্যাসে পরিণত করা উচিত এবং অযু করার সাথে সাথে সম্ভব হলে আকাশের দিকে তাকিয়ে কালেমা তাওহীদ পড়া উচিত। হাদীসে বলা হয়েছে-

مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ-

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমভাবে অযু করে এই দোয়াটি পড়বে-

أَشْهَدُ أَنْ لاَّاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ্ তা'য়ালা, তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত করো।

فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ-

তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। যে দরজা দিয়ে খুশী সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী, হাদীস নং-৫৫)

মৃত্যু আমাদের তাড়া করে ফিরছে, আমাদের হায়াত ক্রমশ শেষ হয়ে যাচ্ছে, কবর আমাদের দিকে মুখ ব্যদন করে রয়েছে, কিন্তু আমাদের কোনো অনুভূতিই নেই। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মগ্ন রয়েছি, বিশাল ধন-ঐশ্বর্য্য রয়েছে, তারপরেও তৃপ্তি নেই, আরো অধিক সম্পদের জন্যে নানা ধরণের ছল-চাতুরী ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে। মৃত্যু ও পরকালে জবাবদীহীর অনুভূতি না থাকার কারণেই বর্তমানে একশ্রেণীর লোকজন দ্বিধাহীন চিত্তে জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করছে। সুতরাং মৃত্যুর চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেকে সংশোধন করতে হবে।

এমনকি ঘুমানোর পূর্বেও অযু করে বিছানায় যেতে হবে। মৃত্যুকে যখন বরণ করতেই হবে, তখন মহান আল্লাহর একটি নির্দেশ পালনরত অবস্থায় অর্থাৎ অযু অবস্থাতেই মৃত্যু হোক। যেনো মহান মালিক আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে এতটুকু কথা বলতে পারি, হে আল্লাহ! তোমার নির্দেশ পালনরত অবস্থায় আমার জীবনের সমাপ্তি রেখা টানা হয়েছে, এই উসিলায় তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

দুনিয়া-আখিরাতে অযুর জন্যে ১৪টি নে'মাত

অযু সম্পর্কিত সকল হাদীস বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, যারা যথাযথ পন্থায় উত্তমরূপে অযু আদায় ও সংরক্ষণ করে, তাদের জন্যে দুনিয়া-আখিরাতে ১৪টি কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

১। অযু করলে গোনাহ্ ঝরে যায়।

২। গোনাহ্ হলো অপবিত্র, অযুর মাধ্যমে এই অপবিত্রতা ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করা হয় অর্থাৎ অযু করলে গোনাহ্ মুছে দেয়া হয় এবং সেই সাথে ক্ষমাও করা হয়। (এখানে গোনাহ্ বলতে ছোট ছোট গোনাহ্কে বুঝানো হয়েছে)

৩। অযু মুমিনের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ ঘটায়।

৪। অযু করার মধ্যে যে নেকী রয়েছে, তা জিহাদের সমতুল্য।

৫। অযু করার সময় যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া হয়, কিয়ামতের দিন উক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকবে।

৬। অযুর সময় যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয় হয়, উক্ত অঙ্গসমূহ কিয়ামতের দিন জান্নাতের অলঙ্কারে সজ্জিত করা হবে।

৭। অযু আদায়কারীকে কিয়ামতের দিন নবী করীম (সাঃ) চিনতে পারবেন। যাকে তিনি চিনতে পারবেন, বলা-বাহুল্য সেই ব্যক্তি নাজাত পাবে।

৮। নবী করীম (সাঃ) অযু আদায়কারীর জন্যে কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসারে অপেক্ষা করবেন।

৯। অযু করলে হাত-পায়ের নখের নীচের গোনাহ্সমূহও ঝরে যায়।

১০। অযুর হেফাজত তথা অযুর সংরক্ষণ করা ঈমানের লক্ষন।

১১। অযু করা ঈমানের অংশ।

১২। অযু করে দোয়া পড়লে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়।

১৩। অযু আদায় করে যে প্রার্থনা করা হবে, তা কবুল হবার সম্ভাবনা অধিক।

১৪। অযু করার কারণে দেহ ও চেহারা কান্তিময় হয়।

সকল সমস্যার সমাধানে নামাজের অবদান

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে পৃথিবীতে পাপ-পঙ্কিলতার মধ্যে নিক্ষেপ করেননি, বরং প্রত্যেক পদক্ষেপে সত্য-সঠিক ও কল্যাণময় পথ প্রদর্শন করে অপরিসীম সাহায্য করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি একান্ত অনুগ্রহ করে তাঁর কাছে কিভাবে চাইতে হবে তা-ও শিখিয়েছেন। 'দোয়া এবং নামাজ' এটি একই আমলের দুটো নাম মাত্র। কারণ নামাজ ফার্সী। পবিত্র কোরআন-হাদীসে নামাজকে 'সালাত' বলা হয়েছে। আর সালাত শব্দের অর্থ হলো দোয়া। ঈমানদারদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, জীবন চলার পথে যে কোনো বিপদ-মুসিবতে ও সমস্যায় আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো হলো নামাজ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ-

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাজের মাধ্যমে প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা বাকারাঃ ১৫৩)

নবী করীম (সাঃ) এটি সাধারণ নিয়মে পরিণত করেছিলেন যে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ, বিশেষ প্রয়োজন অথবা জটিল কোনো সমস্যার মুখোমুখী হলেই তিনি দ্রুত দুই রাকাআত নামাজ আদায় করতেন। ঠিক এ কারণেই একটি হাদীসে এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে-

اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلّٰى–

"যখনই কেউ গুরুত্বপূর্ণ কাজের মুখোমুখী হবে তখনই সে যেনো নামাজ আদায় করে।" (আবু দাউদ, হাদীস নং- ১৩১৯)

ঘটনাক্রমে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর পেটে ব্যথা হলে তিনি বিষয়টি নবী করীম (সাঃ)-কে জানালে রাসূল (সাঃ) বললেন–

قُمْ فَصَلِّ فَاِنَّ فِى الصَّلَاةِ شِفَاءٌ–

"ওঠো এবং (দুই রাকাআত নফল) নামাজ আদায় করো, কারণ নামাজের মধ্যে আরোগ্য রয়েছে।" (ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং- ৩৪৫৮)

নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন যে, তাঁরা ছোট-বড় যে কোনো কাজ এবং দুনিয়া-আখিরাতের যে কোনো প্রয়োজনে দুই রাকাআত নফল নামাজ আদায় করে মহান আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজনের জন্যে আবেদন করতেন। সাহায্য লাভের জন্যে বা যে কোনো প্রয়োজন দেখা দিলেই যে দুই রাকাআত নফল নামাজ আদায় করা হয় তাকে 'সালাতুল হাজাত' বলে।

এ সম্পর্কে হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ রয়েছে যদিও কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ এই হাদীসকে সনদের দিক থেকে 'দুর্বল' বলেছেন। অপরদিকে অন্যান্য চিন্তাবিদগণ একে 'উত্তম' হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, যখন তুমি কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় নিপতিত হবে, তোমার কোনো বিশেষ প্রয়োজনের মুখোমুখী হবে তখন ভালোভাবে অযু করে দুটো সূরার মাধ্যমে দুই রাকাআত নামাজ (সালাতুল হাজাত) আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করে নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি দরুদ পড়ে মহান আল্লাহর কাছে এই দোয়ার মাধ্যমে আবেদন জানাবে–

لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَاتَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلَاحَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلاَّ قَضَيْتَهَا يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ–

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালিমুল কারীম। সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আ'রশেল আযীম। আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আসআলুকা মুজিবাতি রাহ্মাতিকা ওয়া আ'যায়িমা মাগ্ফিরাতিকা ওয়াল গানিমাতা মিন কুল্লে বিররা ওয়াস্ সালামাতা মিন কুল্লে ইছ্মেন লা তাদউ' লিয়ী যাম্বান ইল্লা গাফারতাহ্ ওয়া লা হাম্মা ইল্লা ফার রাজতাহ্ ওয়া লা হাজাতান হি ইয়া লাকা রিদ্বা ইল্লা কাদ্বাইতাহা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থাৎ "আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি ধৈর্য্যশীল, মেহেরবান এবং মহান আরশে আযীমের অধিপতি, সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই যিনি সমগ্র বিশ্বলোকের পালনকর্তা। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সেই জিনিস চাই যার ওপর তোমার রহমত ও ক্ষমা রয়েছে। আমি সেই উপকরণ তোমার কাছে চাই এবং সকল কল্যাণের মধ্যে তুমি আমার জন্যে যা নির্ধারিত রেখেছো, তা তোমার কাছে কামনা করি। আমি তোমার কাছে সকল অকল্যাণ ও গোনাহ্ থেকে নিরাপত্তা কামনা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমার সকল গোনাহ্ ক্ষমা করে দাও, আমার সকল দুঃখ দুর্দশা, যন্ত্রণা-কষ্ট ও মানসিক অস্থিরতা দূর করে দাও, তুমি আমার জন্যে যে কল্যাণ পসন্দ করো তা আমাকে দান করো। নিশ্চয়ই তুমি পরমদাতা ও দয়ালু।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ৪৭৯, ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং- ১৩৮৪, হাকেম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৩২০)

এই হাদীস ব্যতীতও আরেক হাদীস 'তাহ্‌ইয়াতুল অযু' অধ্যায়ে রয়েছে, সেখানেও দুই রাকাআত নামাজের কথা বলা হয়েছে। যে কেউ ইচ্ছে করলে নিজের প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যে উক্ত দুই রাকআত নামাজও আদায় করতে পারেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন, হে লোক সকল! আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে দুই রাকাআত নামাজ আদায় করে (এবং মহান আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজনের জন্যে আবেদন করে) আল্লাহ্ তা'য়ালা সে ব্যক্তির প্রার্থিত সকল প্রয়োজন অত্যন্ত দ্রুত পূরণ করে দেন। (মুসনাদে আহ্মাদ, ফতহুর রাব্বানী, হাদীস নং- ২১০)

উল্লেখিত হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আমাদের যে কোনো প্রয়োজনে দুই রাকাআত সালাতুল হাজাত তথা দুই রাকাআত নফল নামাজ আদায় করে নিজের বিপদ-মুসিবত, মানসিক অস্থিরতা দূর করার ও প্রয়োজন পূরণের জন্যে মহান আল্লাহর কাছে আবেদন জানাতে হবে এবং একমাত্র তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের জন্যে সবথেকে বড় বেদনার বিষয় হলো আমরা মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করা ছেড়ে দিয়েছি। আমরা আমাদের পরম করুণাময় দাতা মহান প্রতিপালকের কাছে চাই না– ফলে আমরা হতভাগ্য হয়ে পড়েছি।

নবী করীম (সাঃ) মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। আমাদেরকে দোয়া করার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। যেমন সকাল হলে কোন্ দোয়া পড়তে হবে, সন্ধ্যায় কোন্ দোয়া পড়তে হবে, ঘুমানোর সময়, খাদ্য গ্রহণের সময়, টয়লেটে প্রবেশের সময়, বাজারে যাবার সময় তথা সকল কাজের সময় কোন্ দোয়া পড়তে হবে তিনি তা শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎ বান্দা যেনো প্রত্যেক পদক্ষেপে তার আপন স্রষ্টা-প্রতিপালক মহান আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে, এ জন্যে নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক কাজের শুরুতেই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন।

যুহরের চার রাকাআত সুন্নাত নামাজের ফযিলত

দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে বার রাকাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ নামাজ আদায় করা হয়। নবী করীম (সাঃ) এই বার রাকাআত নামাজ সবসময়ই আদায় করেছেন বলে একে মুয়াক্কাদাহ্ বলা হয়েছে। ঠিক এ কারণেই প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে ঐ বার রাকাআত নামাজ আদায় করতে হবে। সূর্য পশ্চিম আকাশে সামান্য গড়িয়ে যাবার পরেই যুহরের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়। যুহরের চার রাকাআত ফরজ নামাজ আদায়ের পূর্বে চার রাকাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ নামাজ আদায় করতে হয়।

এই চার রাকাআত সুন্নাত নামাজ আদায়ে সবথেকে বড় পাওনা হলো, সূর্য পশ্চিম আকাশে গড়িয়ে যাবার পরের সময়টি অত্যন্ত বরকতময় সময়। ইমাম তিরমিযী (রাহঃ) নিজ গ্রন্থে পবিত্র কোরআনের ঐ আয়াত উল্লেখ করেছেন–

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَٓائِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ–

"এরা কি আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তার ছায়া আল্লাহর সম্মুখে সিজদা অবনত অবস্থায় কখনো ডান দিক থেকে কখনো বাম দিক থেকে তাঁরই উদ্দেশ্যে ঢলে পড়ে, এরা সবাই তাঁর সম্মুখে অসহায়ত্ব প্রকাশ করে যাচ্ছে।" (সূরা নাহ্লঃ ৪৮)

এরপর তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন, সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাবার পরে যুহরের ফরজ চার রাকাআতের পূর্বে চার রাকাআত নামাজ তাহাজ্জুদ নামাজের অনুরূপ। (এরপর তিনি সূরা নাহ্ল এর উল্লেখিত আয়াত পড়ে বললেন) এটা সেই সময় যখন পৃথিবীর সকল কিছুই মহান আল্লাহর তাস্বীহ্ বর্ণনা করতে থাকে। (তিরমিযী, হাদীস নং- ৩১২৭)

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, যুহরের চার রাকাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ নামাজ ফযিলতের দিক থেকে তাহাজ্জুদ নামাজের অনুরূপ এবং এটা সেই বরকতময় সময়, যখন প্রত্যেক বস্তুই মহান আল্লাহর দরবারে সিজ্‌দা অবনত হয়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لَيْسَ شَيْءٌ يَعْدِلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ اِلَّا أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ–

"দিনের কোনো নামাজই রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাজের সমান নয়, ব্যতিক্রম হলো সেই চার রাকাআত নামাজ, যা যুহরের (ফরজের) পূর্বে আদায় করা হয়।" (মাজ্‌মাউয্ যাওয়ায়েদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২২১)

ঐ সময়ের দ্বিতীয় ফযিলত হলো, এটা এতই বরকতময় সময় যে, যখন আকাশের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা আপন সৃষ্টির প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এই নামাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই চার রাকাআত নামাজ হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ্ (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) আদায় করেছেন। ইমাম বায্‌যার (রাঃ) উল্লেখ করেছেন–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُّصَلِّيَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَرَاكَ تَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ؟ قَالَ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَنْظُرُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِالرَّحْمَةِ اِلٰى خَلْقِهٖ وَهِيَ صَلَاةٌ كَانَ يُحَافِظُ عَلَيْهَا اٰدَمُ وَنُوْحٌ وَاِبْرَاهِيْمُ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى (صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ)

"নবী করীম (সাঃ) দিনে কিছু সময় অতিবাহিত হবার পরে (যুহরের ওয়াক্তে) নামাজ আদায় করা পসন্দ করতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাঃ) আবেদন করলেন, আপনি ঐ সময়ে এই নামাজ (যুহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাআত) আদায়ে খুবই আগ্রহী? রাসূল (সাঃ) বললেন, এটা সেই সময় যখন আকাশের দরজা

উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং আল্লাহ তা'য়ালা ঐ সময় তাঁর সৃষ্টির প্রতি রহমত বর্ষণ করতে থাকেন। আর এই (চার রাকাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্) নামাজ, যা আদম (আঃ), নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) সবসময় আদায় করতেন।" (আল বায্যার, হাদীস নং- ৭৭০)

এই চার রাকাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ নামাজের চতুর্থ তাৎপর্যপূর্ণ ফযিলত হলো, ঐ চার রাকাআত নামাজ যিনি আদায় করবেন তার প্রতি জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেয়া হবে। কেননা নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ يُحَافِظْ عَلَى اَرْبَعِ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ–

"যে ব্যক্তি যুহরের নামাজের পূর্বে ও পরে চার চার রাকাআত সুন্নাত (নামাজ) আদায় করবে তার জন্যে জাহান্নাম হারাম করে দেয়া হবে।" (মুসনাদে আহ্মাদ, খন্ড নং- ৬, হাদীস নং- ৪২৬, আবু দাউদ, হাদীস নং- ১২৬৯, নাসায়ী, ৩য় খন্ড, হাদীস নং- ২৬৫)

যুহরের নামাজের ফরজ নামাজের পূর্বে চার রাকাআত সুন্নাত নামাজের পঞ্চম ফযিলত হলো, নবী করীম (সাঃ) ঐ চার রাকাআত নামাজ সবসময়ই আদায় করেছেন। হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বলেছেন–

لَمَّا نَزَلَ أَيْ هَاجَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ رَاَيْتُهُ يُدِيْمُ هُمْ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ–

"নবী করীম (সাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর থেকে আমি দেখেছি যে, তিনি যুহরের (ফরজের) পূর্বে চার রাকাআত সবসময়ই আদায় করেছেন।" (মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২১৯, আবু দাউদ, হাদীস নং- ১২৭০, ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং- ১১৫৭)

যুহরের ফরজ চার রাকাআত নামাজের পূর্বে চার রাকাআত সুন্নাত নামাজের গুরুত্বপূর্ণ ষষ্ঠ ফযিলত হলো, ঐ সময়ে আকাশের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং মানুষের আমল মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করা হয়। এ জন্যে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَاُحِبُّ اَنْ يَّصْعَدَلِى فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ–

"ঐ সময় আকাশের দরজা উন্মুক্ত করা হয় আর এটা আমি চাই যে, সে সময় আমার কোনো ভালো কাজ (আল্লাহর দরবারে পেশ করার জন্যে) উঠিয়ে নেয়া হোক।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ৪৭৮, মুসনাদে আহ্মাদ, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং- ৪১১)

আরেক হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ–

"যুহরের (ফরজ) নামাজের পূর্বে চার রাকাআত, যার মধ্যে সালাম ফিরানো হয়নি, (দুই রাকাআতের পরে সালাম ফিরানো) ঐ চার রাকাআতের জন্যে আকাশের সকল দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।" (আবু দাউদ, হাদীস নং- ১২৭০, ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং- ১১৬০, জামিউ'স্ সাগীর, হাদীস নং- ৮৮৫)

এসব হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, যুহরের ফরজ চার রাকাআত নামাজের পূর্বে যে চার রাকাআত সুন্নাত নামাজ আদায় করতে হবে, তা দুই রাকাআত করে নয়, একবারেই আদায় করতে হবে। অর্থাৎ দুই রাকাআত আদায় করে সালাম না ফিরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পুনরায় দুই রাকাআত আদায় করে সালাম ফিরাতে হবে। ইমাম তিরমিযী (রাহঃ) নিজের গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) সম্পর্কে লিখেছেন–

كَانَ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَبِالنَّهَارِ أَرْبَعًا–

"তিনি রাতে সুন্নাত বা নফল নামাজ দুই রাকাআত দুই রাকাআত করে আদায় করতেন। কিন্তু দিনে সুন্নাত বা নফল নামাজ চার রাকাআত চার রাকাআত করে আদায় করতেন।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ৫৯৭)

ইমাম তিরমিযী (রাঃ) আরো লিখেছেন, 'ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রাহঃ), ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রাহঃ) ও ইমাম ঈস্হাক (রাহঃ) বলেছেন, ওলামায়ে কেরামের কিছু সংখ্যক রাতে সুন্নাত বা নফল নামাজ দুই রাকাআত দুই রাকাআত করে আদায় করার পক্ষপাতী এবং তাঁরা বলেন, দিনে সুন্নাত ও নফল নামাজ চার রাকাআত চার রাকাআত করে আদায় করতে হবে। যেমন যুহরের (ফরজ) পূর্বে এক সালামে চার রাকাআত আদায় করা হয়।'

তিরমিযী (রাহঃ) যুহরের ফরজ নামাজের পূর্বে চার রাকাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ নামাজ এক সালামে আদায় করা সম্পর্কে প্রমাণ উল্লেখ করে আসর নামাজের চার রাকাআত সুন্নাতে গাইরি মুয়াক্কাদাহ্ নামাজ সম্পর্কে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন,

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) আসরের (ফরজ নামাজের) পূর্বে চার রাকাআতে বিরতি দিতেন। এ সময় তিনি ফিরিশ্তা মন্ডলী, সকল মুসলমান ও মুমিনদের প্রতি সালাম প্রেরণ করতেন। (তিরমিযী, হাদীস নং-৪২৯)

ইমাম তিরমিযী (রাহঃ) এই হাদীসকে 'হাদীসে হাসান' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম ইস্হাক (রাহঃ) বলেছেন, ঐ 'বিরতির' অর্থ হলো প্রথম তাশাহুদ অর্থাৎ দুই রাকাআত আদায় করে বসা।

যুহরের ফরজ নামাজের পূর্বে চার রাকাআত সুন্নাত নামাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসৃত নীতি উল্লেখ করা যথেষ্ট যা হযরত আয়িশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত–

قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَاتَتْهُ
الْاَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ–

"হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, যুহরের চার রাকাআত সুন্নাত নামাজ নবী করীম (সাঃ) যদি (ফরজের পূর্বে) আদায় করার সুযোগ না পেতেন, তাহলে তিনি যুহরের পরে (চার রাকাআত ফরজের পরে) দুই রাকাআত সুন্নাত আদায় করার পরে উক্ত চার রাকাআত সুন্নাত আদায় করতেন।" (আবু দাউদ, হাদীস নং- ১১৫৮)

প্রকাশ থাকে যে, শুধুমাত্র ফযিলতের কারণেই নবী করীম (সাঃ) যুহরের চার রাকাআত সুন্নাত নামাজ যে কোনো অবস্থাতেই আদায় করতেন। কখনো যদি ফরজ আদায়ের পূর্বে উক্ত চার রাকাআত সুন্নাত নামাজ আদায় করার সুযোগ না পেতেন, তাহলে তিনি ফরজের পরে দুই রাকাআত সুন্নাত নামাজ আদায় করার পরে উক্ত চার রাকাআত সুন্নাত নামাজ আদায় করতেন। হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, যুহরের ওয়াক্ত অত্যন্ত বরকতময় সময়। এটা দোয়া কবুল ও বান্দার আমলকে উর্ধ্বে উঠানোর সময়। সুতরাং আমাদেরকে উক্ত সময়ের পরিপূর্ণ বরকত লাভের চেষ্টা করা উচিত।

এ সময় সকল মুসলিম পুরুষগণ মসজিদে এবং নারীগণ নিজের ঘরে অবস্থান করে উক্ত বরকতময় সময়ে কল্যাণ লাভের লক্ষ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা করতে হবে। উক্ত মহামূল্যবান সময়ে কোরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর যিক্র করা ও তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং বিশেষ বিশেষ দোয়া করার ধারাবাহিকতা জারী রাখতে হবে। কারণ যুহরের সময় দোয়া কবুল করা হয়।

জামায়াতে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইবাদাতসমূহের নানা পদ্ধতির মধ্যে সর্বোত্তম পদ্ধতি এবং আকৃতিগত দিক থেকে সুন্দর হলো নামাজ। একমাত্র নামাজই মহান আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার মধ্যে গভীর সুসম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করে। মানব দেহের মধ্যে মস্তিষ্কের স্থান ও গুরুত্ব যেমন তেমনি ইসলামেও নামাজের গুরুত্ব ও অবস্থানও ঠিক তেমন। নবী করীম (সাঃ) বিশেষ এক ঘটনা উপলক্ষ্যে বলেছেন–

لاَاِيْمَانَ لِمَنْ لاَأَمَانَةَ لَهُ وَلاَصَلاَةَ لِمَنْ لاَ طُهُوْرَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ صَلاَةَ لَهُ اِنَّمَا مَوْضَعُ الصَّلاَةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضَعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ–

"ঐ ব্যক্তির ঈমান গ্রহণযোগ্য নয় যার মধ্যে আমানতদারী নেই, ঐ ব্যক্তির নামাজ হয় না যে পবিত্রতা অর্জন করেনি, ঐ ব্যক্তির দ্বীন (ইসলাম) গ্রহণযোগ্য নয় যার মধ্যে নামাজ নেই এবং দ্বীনে (ইসলামে) নামাজের মর্যাদা ঠিক তেমন, মানবদেহে যেমন মস্তিষ্কের মর্যাদা।" (তাবারাণী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৩১৩)

নামাজ প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর ওপর ফরজে আইন বা অবশ্য পালনীয়। কিশোর, তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ, সুস্থ-অসুস্থ সকলের প্রতি নামাজ আদায় ফরজ করা হয়েছে। নামাজ হলো সেই ইবাদাত যার ব্যাপারে সার্বিক তত্ত্বাবধান করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং সন্তান-সন্ততি যখন ফরজ পালনের বয়সে উপনীত হবে, তখন থেকেই তাদেরকে সর্বপ্রথমে নামাজে অভ্যস্ত করার জন্যে জোর তাগিদ করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مُرُوْا أَوْلاَدَ كُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْ هُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ–

"নিজের সন্তান যখন সাত বছর বয়সী হবে তখন তাদেরকে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দাও এবং দশ বছরে পদার্পণ করলে নামাজ যদি আদায় না করে তাহলে প্রহার করো।" (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৪৯৫)

এই নির্দেশ এ জন্যে দেয়া হয়েছে যে, ফরজ নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অন্যান্য নির্দেশ পালনের অভ্যাস গড়ে তোলা যায়। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ এবং কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম নামাজের

হিসাব গ্রহণ করা হবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

أَوَّلُ مَايُحَاسَبُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ–

"কিয়ামতের দিনে সর্বপ্রথম বান্দার কাছ থেকে নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে।" (মাজমাউ'য যাওয়ায়েদ, ১ম খন্ড, হাদীস নং- ২৯১-৯২)

এক হাদীসে নামাজকে 'চক্ষু শীতলকারী' ও অন্য হাদীসে নামাজকে ইসলামের স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। (নাসাঈ, ৭ম খন্ড, হাদীস নং- ৬১, তিরমিযী, হাদীস নং- ২৬১৬)

নামাজের প্রত্যেক আরকানের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ কথা স্পষ্টতই প্রতিভাত হয় যে, নামাজ প্রকৃত অর্থেই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধানের সমন্বিত রূপ। মানুষ যখন নামাজ আদায় করে তখন সে মহান আল্লাহর রুবুবিয়াত ও উলুহিয়াত তথা মহান আল্লাহই একমাত্র আইনদাতা, বিধানদাতা, প্রতিপালক, মালিক, দাসত্ব লাভের উপযোগী একমাত্র সত্তা, রিয্কদাতা, পুরস্কার ও শাস্তিদাতা, বিপদ-মুসিবতে উদ্ধারকারী ইত্যাদী বিষয়সমূহের প্রতি বিনয়ের সাথে স্বীকৃতি প্রদান করে। রুকু-সিজদার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে মহান আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে। নামাজের মাধ্যমে মানুষ বার বার মহান আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করতে থাকে।

মুসলমান যতটুকু মূল্যবান সময় ব্যয়ের মাধ্যমে নামাজ আদায় করে, সে যেনো তাঁর মূল্যবান সময় থেকে ঐ পরিমাণ সময় যাকাত প্রদান করে। ধন-সম্পদের যাকাত দিয়ে যেভাবে সে তার সম্পদকে পাক-পবিত্র ও সম্পদে বরকত বৃদ্ধি করে, ঠিক একইভাবে মুসলমান নামাজ আদায় করে সময়ের যাকাত দেয়, সময়কে পবিত্র করে এবং সময়ে সে বরকত পায়। এভাবে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মানুষ আত্মিক দিক থেকেও পবিত্রতা অর্জন করে। একমাত্র নামাজের কারণেই কৃপণতা, অহঙ্কার, আত্মম্ভরীতা, কপটতা, হিংসা-বিদ্বেষ, রাগ-ক্ষোভ, ঘৃণা ও দূরারোগ্য রোগ থেকে নাজাত পাওয়া যায়।

জামায়াতে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে কঠোর তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং সেই সাথে এর ফযিলতও বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

صَلاَةُ الْجَمِيْعِ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِيْ سُوْقِهِ
خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَفَأَحْسَنَ وَأَتَى

الْمَسْجِدَ لاَيُرِيْدُ الاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً الاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ خَطِيْئَةً حَتّٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِيْ صَلاَتِهِ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّىْ (يَعْنِىْ عَلَيْهِ) الْمَلاَئِكَةُ مَادَامَ فِيْ مَجْلِسِهِ الَّذِىْ يُصَلِّىْ فِيْهِ، أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، أَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ مَالَمْ يُحْدِثْ-

"জামায়াতের নামায ঘরের ও বাজারের নামাযের তুলনায় (সওয়াবের দিক থেকে) পঁচিশগুণ অধিক মর্যাদার অধিকারী। কারণ তোমাদের যে ব্যক্তি ভালোভাবে অযু করার পর একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে, আল্লাহ্ তার প্রতি কদমে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন। তার মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। মসজিদে প্রবেশ করার পর যতক্ষণ সেখানে অবস্থান করে, তাকে নামাযের মধ্যে শামিল করা হয় এবং যতক্ষণ সে নামাযের জায়গায় থাকে, ফিরিশতারা তার জন্য তার অযু না ভাঙা পর্যন্ত দোয়া করতে থাকে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করো! হে আল্লাহ তার প্রতি রহম করো!" (বোখারী, হাদীস নং- ৪৭৭)

জামায়াতে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে হাদীসে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বিধায় অধিকাংশ আলেম-ওলামা মতামত দিয়েছেন, জামায়াতে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। কোনো ধরণের অসুবিধা ব্যতীত জামায়াত ছাড়া নামাজ আদায় করার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে, কেনো ধরণের অসুবিধা ব্যতীত জামায়াতে নামাজ আদায় না করলে নামাজই হবে না। কোনো হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, জামায়াত ত্যাগ করা মুনাফেকীর নিদর্শন। এমনকি নবী করীম (সাঃ) এ কথাও বলেছেন যে, আমার মন চায় যারা জামায়াতে অংশগ্রহণ করে না তাদের ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিই। বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে রাসূল (সাঃ) এ কথাও বলেছেন, ওজর ব্যতীত যারা জামায়াতে অংশগ্রহণ করে না কিয়ামতের ময়দানে তারা জাহান্নামের আগুনে শাস্তি ভোগ করবে (হে আল্লাহ! আমাদেরকে রক্ষা করো)। পক্ষান্তরে নারীদের জন্যে নিজের ঘরেই নামাজ আদায় করাকে সর্বোত্তম বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

এমনিতেই সকল নামাজই মসজিদে এসে জামায়াতের সাথে আদায় করলে অত্যধিক ফযিলত পাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষ করে ফজর ও আসরের নামাজ মসজিদে

এসে যথাসময়ে জামায়াতে আদায় করার ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ প্রত্যেক মানুষের সাথে যে ফিরিশ্‌তা রয়েছে, এ দুটো সময়ে তাদের পালা বদল হয়। আসরের সময় যে ফিরিশ্‌তা আসেন তিনি ফজরের সময় বিদায় নেন এবং ফজরের সময় যে ফিরিশ্‌তা আসেন তিনি আসরের সময় বিদায় নেন। উভয় সময়েই এসে যখন তারা মানুষকে নামাজরত অবস্থায় পান, তখন তারা মহান আল্লাহর দরবারে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে প্রকৃত নামাজী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালাকে তাঁরা বলেন, 'আমরা যখন তাঁর কাছে গিয়েছি তখন তাকে নামাজরত পেয়েছি এবং যখন তাঁকে ছেড়ে এসেছি তখনও তাঁকে নামাজরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। সুতরাং আপনি ঐ বান্দাকে ক্ষমা করে দিন।' নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ أَتَيْنَا هُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَتَرَكْنَا هُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ فَاغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ–

(আল্লাহ তাঁর বান্দা সম্পর্কে সবই জানেন, এরপরও) "আল্লাহ তা'য়ালা ফিরিশ্‌তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি আমার বান্দাকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো? জবাবে ফিরিশ্‌তা বলেন, যখন আমি তার কাছে গিয়েছি তখন তাকে নামাজরত অবস্থায় পেয়েছি, আবার যখন তাকে ছেড়ে এসেছি তখনও তাকে নামাজরত অবস্থাতেই ছেড়ে এসেছি। সুতরাং হে আল্লাহ! তুমি তাকে কিয়ামতের দিন বিনিময় দান করো।" (বোখারী, হাদীস নং- ৫৫৫, তারগীব, হাদীস নং- ৬৪৯, মুসলিম, হাদীস নং- ৬৩২)

মহান আল্লাহর কোনো বান্দা যখন একনিষ্ঠভাবে দুই হাত বেঁধে মহান আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ায়, রুকু-সিজদার মাধ্যমে নিজেকে যখন মহান আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে তখন ফিরিশ্‌তা পর্যন্ত সেই বান্দার প্রতি ঈর্ষান্বিত হন। এ জন্যে আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই জামায়াতের সাথে আদায় করা উচিত। এর মধ্যেই দুনিয়া আখিরাতের সফলতার চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে। আমরা যখন নামাজ আদায় করবোই, তাহলে কিছু সময় ব্যয় করে মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথেই আদায় করার চেষ্টা করবো। আর এটাই হবে আমাদের জন্যে সবদিক থেকে সর্বাধিক উত্তম কাজ। হযরত উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَيَعْجَبُ مِنَ الصَّلَاةِ فِى الْجُمَعِ–

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা জামায়াতে নামাজ আদায় করাকে অত্যন্ত বেশী পসন্দ করেন।" (মুসনাদে আহ্‌মাদ, ২য় খন্ড, হাদীস নং- ৫০)

এই 'আমল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চ মর্যাদা ও ফযিলতসম্পন্ন' তা এ থেকেই অনুভব করা যায় যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা উক্ত আমলকে পসন্দ করেছেন। মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামাজ আদায়কারীর জন্যে এর থেকে আর কি মহাসুসংবাদ হতে পারে যে, মহাবিশ্বের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালা জামায়াতে নামাজ আদায়কারীকে অত্যন্ত মমতার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। জামায়াতে নামাজ আদায়ের ফযিলত সম্পর্কে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসে বলা হয়েছে–

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشٰى اِلٰى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلاَّهَا مَعَ الاِمَامِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ–

"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে ফরজ নামাজ আদায়ের জন্যে গিয়েছে এবং ইমামের সাথে জামায়াতে নামাজ আদায় করেছে, সেই ব্যক্তির সকল গোনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।" (ইবনে খুযাইমা, ২য় খন্ড, হাদীস নং- ৩৭৩)

মহান আল্লাহর কাছে আকুল আবেদন, আমাদের সকলে জামায়াতে নামাজ আদায় করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

জামায়াতবদ্ধ নামাজ কবুলের শর্ত

মসজিদে জামায়াতবদ্ধ হয়ে নামাজ আদায় করা খুবই সওয়াবের কাজ। ইসলাম নির্দেশিত অত্যাবশ্যকীয় ওয়াজিব কাজসমূহের মধ্যে জামায়াতে নামাজ আদায় করাও একটি ওয়াজিব কাজ। ইসলামী শরীয়াতে গ্রহণযোগ্য বাধ্যবাধকতা ব্যতীত মসজিদে উপস্থিত না হওয়া এবং জামায়াতে নামাজ আদায় না করা শুধু বড় ধরণের হতাশাব্য ক কাজই নয়, বরং এটা বড় ধরণের গোনাহের শামিল। সাহাবায়ে কেরামের যুগে তাঁরা জামায়াতে নামাজে উপস্থিত না হওয়াকেই মুনাফেকীর চিহ্ন বলে বিবেচনা করতেন। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন–

لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلاَّ مُنَافِقٌ بَيِّنُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَأَنَّ الرَّجُلَ لَيُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ اِلاَّ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِىْ بَيْتِهِ وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَ كُمْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَكَفَرْتُمْ–

"আমরা এটাই দেখতাম, মুনাফীক ব্যতীত জামায়াত থেকে কেউ-ই অনুপস্থিত থাকতো না। সর্বসাধারণের কাছেও জামায়াতে অনুপস্থিত লোকদের মুনাফীক হওয়া সম্পর্কে দ্বিধা ছিলো না। সকলে দেখতো, শারীরিকভাবে অক্ষম-দুর্বল লোকজনকে অন্যদের সহযোগিতায় মসজিদে এনে জামায়াতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো। এখন তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার বাড়ির কাছে মসজিদ নেই। যদি তোমরা মসজিদ ত্যাগ করে বাড়িতে নামাজ আদায় করো, তাহলে তোমরা নবী করীম (সাঃ)-এর আদর্শ পরিত্যাগ করলে। আর যদি তোমরা (শরয়ী ওজর ব্যতীত) নবী করীম (সাঃ)-এর আদর্শ ত্যাগ করো তাহলে তোমরা কুফরী করবে।" (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৫৫০)

মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামায়াতবদ্ধভাবে নামাজ আদায়ের চিরস্থায়ী কিছু নিয়মাবলী রয়েছে, যা হাদীসভিত্তিক গবেষণা কর্মের মাধ্যমে রচিত কিতাবসমূহে মওজুদ রয়েছে। সেসব নিয়মাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হলো, জামায়াতের প্রথম কাতারকে পরিপূর্ণ করতে হবে। তারপরে দ্বিতীয় কাতার পূর্ণ করতে হবে। কোনো নামাজী যদি এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হয়, যখন জামায়াত দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তখন কাতারের শেষ স্থানে শূন্যস্থান থাকলে সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের নামাজ শুরু করবে।

কাতারবদ্ধ হবার পরে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে যে, কাতারে দাঁড়ানো লোকদের মধ্যে কোথাও যেনো শূন্যস্থান না থাকে। পরস্পরে কাঁধে কাধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়াবে। কাতারবদ্ধ হবার নিয়ম হলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরস্পরে মিলিত হয়ে দাঁড়ানো। কাতারে একে অপরের কাছ থেকে পৃথক থাকা বা উভয়ের মধ্যে শূন্যস্থান রেখে দাঁড়ানো কাতারবদ্ধ হবার নিয়মেরই বিপরীত নয়, বরং এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যথাযথভাবে কাতারবদ্ধ হওয়া, কাতার সম্পূর্ণ সোজা করা এবং পরস্পরে মিলেমিশে দাঁড়ানোই সফল ও পরিপূর্ণ নামাজের অন্যতম চিহ্ন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, নিজের কাতার যথাযথ ও সোজা রাখো, কারণ কাতার সোজা ও যথাযথ রাখা পরিপূর্ণ নামাজের অন্তর্ভুক্ত। (বোখারী, হাদীস নং- ৭২৩, মুসলিম, হাদীস নং- ৪৩৩, আবু দাউদ, হাদীস নং- ৬৬৭, ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং- ৯৯৩)

জামায়াতবদ্ধ নামাজ আদায়কালে কাতারের মধ্যে কোনো স্থান যদি শূন্য থাকে এবং কোনো নামাজী যদি সে স্থান পূর্ণ না করে, তাহলে শয়তান সে স্থানে প্রবেশ করে। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, যখন নামাজের কাতারের মধ্যে শূন্যস্থান রাখা হবে এবং পরস্পরে মিলেমিশে না দাঁড়াবে, তখন পরস্পরের হৃদয়কেও পরস্পর থেকে দূরে রাখা হবে। কারণ কাতারে পরস্পরে মিলেমিশে দাঁড়ালে আল্লাহ তা'য়ালা

পরস্পরের হৃদয়কেও পরস্পরের সাথে জুড়ে দেন। (মুসনাদে আহ্‌মাদ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৬২, আবু দাউদ, হাদীস নং-৬৬৭)

প্রত্যেক মসজিদের ইমাম ও খতিব এবং দায়িত্ববান মুসল্লীর এটা অবশ্যই কর্তব্য যে, ইকামাত হবার পূর্বে বা পরে নামাজ শুরুর আগে কাতার যথাযথ করবে এবং পরস্পরের সাথে মিলেমিশে দাঁড়ানোর দিকনির্দেশনা দিবে। কাতারের মধ্যে কোনো স্থান যেনো শূন্য না থাকে সেদিকে লক্ষ্য করবে।

মুসল্লীদেরকে ঐ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিতে হবে যে, যদি ভুলেও কোনো কাতারের মধ্যে বা পরস্পরের মধ্যে কোনো শূন্যস্থান থেকে যায়, তাহলে নামাজরত অবস্থাতেও মুসল্লী সরে গিয়ে সে শূন্যস্থান পূরণ করবে। নামাজের কাতারে ডানে-বামে দেখে দাঁড়াতে হবে। ডানে বা বামে যদি শূন্যস্থান রয়ে যায় এবং কেউ এসে পাশে দাঁড়ালে উক্ত শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যে নামাজরত অবস্থাতেও সহযোগিতা করতে হবে এমনকি ডানে বা বামে সরে এসেও শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। এরপরেও কাতার যদি কোনো দিকে অপূর্ণ থাকে তাহলে পরে যারা আসবে তারা কাতার পূর্ণ করবে। আর এ ব্যাপারে প্রথম থেকে যারা কাতারে ছিলো, তারা পরে আসা লোককে কাতারে শামিল হবার জন্যে সহযোগিতা করবে।

নবী করীম (সাঃ) যখন জামায়াতে নামাজে ইমামতী করার পূর্বে নিজে কাতারে এসে কাতার সোজা করে দিতেন এবং বলতেন, একজন আরেকজনের কাছ থেকে দূরে থেকো না, যদি তোমরা নামাজের কাতারে একজন আরেকজনের কাছ থেকে দূরে থাকো, তাহলে তোমাদের হৃদয় পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। (ইবনে খুযাইমাহ্, ৩য় খন্ড, হাদীস নং-২৬, আবু দাউদ, হাদীস নং-৬৬৪, আহ্‌মাদ, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৫)

আমাদের মধ্যে একটি বড় দুর্বলতা রয়েছে যে, আমরা মনে করি নামাজরত অবস্থায় কাতার সঠিক বা পূর্ণ করার জন্যে নড়াচড়া করা যাবে না বা এটা গোনাহের কাজ। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো বৈধ কারণে নামাজরত অবস্থাতেও নড়াচড়া যাবে। যেমন নামাজরত অবস্থায় কাতার সোজা করা। যে ব্যক্তি কাতারের শূন্যস্থান পূর্ণ করবে তার জন্যে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বড় ধরণের সুসংবাদ রয়েছে। সে সুসংবাদ হলো–

১। যে ব্যক্তি কাতার পরিপূর্ণ করবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে কল্যাণ ও বরকত দিবেন এবং তার সকল বৈধ কাজে সহযোগিতা করবেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৬৬৬, ইবনে খুযাইমাহ্, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২৩, মুসনাদে আহ্‌মাদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৯৮, নাসাঈ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৯৩)

২। নেকীর অন্বেষণে চলতে গিয়ে যে সওয়াব পাওয়া যায়, এর থেকে অধিক সওয়াব পাওয়া যায় নামাজের কাতারে শূন্যস্থান দেখে সরে গিয়ে কাতারের সে শূন্যস্থান যে

ব্যক্তি পূরণ করে দেয়। (মুসনাদে বায্যার, হাদীস নং- ৫১২, ইবনে হাব্বান, হাদীস নং- ৬৯৪, মুজ্‌মাউয্ যাওয়ায়েদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৯০)

৩। যে ব্যক্তি জামায়াতে নামাজের কাতারে শূন্যস্থান দেখে পূর্ণ করে দেয় আল্লাহ তা'য়ালা তার সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং জান্নাতে তার জন্যে ঘর বানিয়ে দেন। (মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৯১)

৪। যে ব্যক্তি কাতারের শূন্যস্থান পূর্ণ করে তার গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মুসনাদে বায্যার, হাদীস নং- ৫১১, মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৯১)

৫। (নামাজের মধ্যে) ঐ ব্যক্তির নড়াচড়া মহান আল্লাহ্ অধিক পসন্দ করেন, যে ব্যক্তি কাতারের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যে নড়াচড়া করে। (মুস্তাদরাকে হাকীম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২৭২)

উচ্চ মর্যাদা, সুসংবাদ ও অধিক সওয়াবের বর্ণনা সম্বলিত উল্লেখিত হাদীস থেকে আমাদেরকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে, আমরা আমাদের মসজিদসমূহে জামায়াতে নামাজে কাতারের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখবো। কারণ মুসলিম জীবনে একতাবদ্ধ হওয়া, আত্মশুদ্ধি করা, একত্রে মিলেমিশে মায়া-মমতা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সম্মান-মর্যাদার সাথে বসবাস করার মূল প্রেরণা অন্তর্নিহিত রয়েছে নামাজে কাতার সোজা ও সঠিক করার মধ্যে। যদি মসজিদে নামাজের কাতারে বিশৃংখলা ও ব্যবধান রয়ে যায়, তাহলে মানুষের হৃদয়কেও একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে।

ফলে সমাজ জীবনে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাহীনতার কারণে বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে তা আমাদের জীবনে আযাব হিসেবে দেখা দিবে। আর এই আযাব আমাদেরই দুর্বলতা ও নাফরমানীর কারণে আমাদের ওপর বিজয়ী হবে। আসুন একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে আমরা নামাজের কাতারে যেভাবে দাঁড়াই, ঠিক সেভাবেই সকলে মিলেমিশে পরস্পরকে সম্মান-মর্যাদা দিয়ে পরস্পরের হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করি। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের প্রতি রহম করুন এবং আমাদের সকলের হৃদয়কে পরস্পরের সাথে মিলিত করে দিন।

জুমুআ'র নামাজের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ আদব

দিনসমূহের মধ্যে জুমুআ'র দিন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বরকতময় দিন। এই দিনে সর্বাধিক পরিমাণে মহান আল্লাহর যিক্র ও দরুদ শরীফ পাঠের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ দিনে গোসল করা সুন্নাত। জুমুআ'র দিনে দৃঢ় সঙ্কল্প ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে ঈমান ও একনিষ্ঠভাবে জুমুআ'র নামাজ আদায়ের প্রতি মনোযোগী হলে সারা বছরের

ইবাদাতের সমান সওয়াব পাওয়া যাবে। জুমুআ'র দিন গোসল শেষে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে দ্রুত মসজিদে যাওয়া চিরস্থায়ী সুন্নাত।

উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী জুমুআ'র দিনে সর্বাগ্রে মসজিদে উপস্থিত হয়ে প্রথম কাতারে ডান দিকে বসে নীরবে ইমামের খুতবা শোনা এবং একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায় করা সেই আমল, যা আমলনামাকে ওজনে অত্যন্ত ভারী করে দেয়। এমনকি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, জুমুআ'র দিনে যথাযথ নিয়ম অনুসারে মসজিদে যাবার পথে প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বছরের নফল রোজা ও এক বছরব্যাপী রাত জেগে নফল নামাজ আদায়ের সমান সওয়াব আমলনামায় লেখা হয়।

বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করুন, সামান্য একটু সতর্কতার সাথে ইচ্ছে করলেই খুবই ছোট্ট ও স্বল্প শ্রম দিয়ে আমল করলে বহু সংখ্যক বছরের ইবাদাতের সমান সওয়াব অর্জন করা যায়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ اَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا–

"যে ব্যক্তি জুমুআ'র দিনে যত্নের সাথে গোসল করে, কোনো বাহন ব্যবহার না করে পায়ে হেঁটে দ্রুত অর্থাৎ সর্বাগ্রে মসজিদে পৌছে ইমামের সম্মুখে বসে নিরর্থক কাজ না করে খুতবা শুনবে, সে ব্যক্তির প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বছর রোজা রাখা ও এক বছর রাত জেগে নামাজ আদায় করার সমান সওয়াব নির্ধারিত রয়েছে।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ৪৯৬, ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং- ১০৮৭)

উল্লেখিত বরকতময় হাদীসে জুমুআর নামাজ সম্পর্কে ছয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে–

(১) উত্তমরূপে গোসল করা

(২) মসজিদের উদ্দেশ্যে সর্বাগ্রে বাড়ি থেকে বের হওয়া

(৩) মসজিদের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে যাওয়া

(৪) মসজিদে যাবার জন্যে বাহন ব্যবহার না করা

(৫) ইমামের সম্মুখে অর্থাৎ প্রথম কাতারে বসা

(৬) খুতবা শোনা ও নামাজ আদায়ের সময় কোনো ধরণের নিরর্থক কাজ না করা

এই ছয়টি নিয়ম যথাযথভাবে পালন করলে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বিনিময় এবং অসীম সওয়াব দান করবেন। যদি নিজ বাসস্থান থেকে মসজিদ দূরে হয় তাহলে বাহন ব্যবহার করা জায়েয এবং মসজিদ থেকে সামান্য দূরে বাহন থেকে নেমে কিছুটা পায়ে হেঁটে মসিজদে উপস্থিত হলে হাদীসটির প্রতি পরিপূর্ণ আমল করা হবে এবং বর্ণিত সওয়াবও পাওয়া যাবে। জুমুআর দিন আনন্দ এবং শোকর আদায়ের দিন। মুসলমানদের জন্যে এ দিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তারা গোসল শেষে সুগন্ধি ব্যবহার করবে, যথানিয়মে খুতবা শুনবে, নামাজ আদায় করবে এবং যিক্র ও তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে দিনটি অতিবাহিত করবে। পূর্ববর্তী মুসলমান অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম এবং তৎপরবর্তী মুসলমানদের কাছে জুমুআর দিনটি গণিমত এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দিন ছিলো। তাঁরা যেভাবে জুমুআর দিনের হক আদায় করতেন বর্তমানে আমাদেরকেও স্বচেষ্ট হতে হবে, আমরাও যেনো জুমুআর দিনের প্রতি অনুরূপ গুরুত্ব প্রদান করতে পারি।

বিলম্বে এসে প্রথম কাতারে বসার চেষ্টা নিন্দনীয়

জুমুআ'র দিনে দেরী করে মসজিদে আসা উদাসীনতা, অবহেলা, খাম-খেয়ালীপনা ও দুঃসাহসের কাজ। একে তো দেরী করে মসজিদে আসা, তারপর সওয়াবের আশায় লোকজনের ঘাড়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামাজীদের কষ্ট দিয়ে এবং বিরক্তি উৎপন্ন করে সম্মুখের কাতারে পৌঁছানোর চেষ্টা করা গোনাহের কাজ। সওয়াবের আশায় এ ধরণের কাজ যারা করবে তারা সওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ্র বোঝা মাথায় নিয়ে মসজিদ থেকে বিদায় নিবে। যে মুসলমান সর্বপ্রথমে মসজিদে আসবে তার জন্যে অপরিসীম সওয়াব রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রাঃ) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন–

عَنْ أَوُسِ بْنِ أَوُسٍ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا–

"হযরত আউস ইবনে আউস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, জুমুআর দিনে যে ব্যক্তি গোসল করে প্রথম ওয়াক্তে মসজিদে গিয়ে খতীবের কাছে বসে নীরবে খুতবা শোনে, তার প্রত্যেক পদক্ষেপে এক বছরের রোজা রাখা ও রাতে নফল নামাজ আদায়ের সমান সওয়াব দেয়া হয়।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ৪৯৬)

যে সকল লোক দেরী করে মসজিদে যায় এবং সম্মুখের কাতারে যাবার জন্যে লোকজনের অসুবিধা সৃষ্টি করে, ঘাড়ের ওপর দিয়ে বা দুই জনের মাঝখান দিয়ে পা বাড়িয়ে যায়, এই ধরণের নামাজীর জন্যে কঠিন শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ সিজতানী (রাহঃ) একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন–

جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ فَقَدْ اٰذَيْتَ وَاٰنَيْتَ–

"এক ব্যক্তি জুমুআ'র নামাজে দেরীতে এসে উপস্থিত লোকদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে পা বাড়িয়ে সম্মুখের দিকে যাবার চেষ্টা করছিলো। এ সময় নবী করীম (সাঃ) খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি এ দৃশ্য দেখে খুতবা থামিয়ে লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন, বসে পড়ো! তুমি দেরী করে এসে এবং লোকদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে সম্মুখে আসার চেষ্টা করে আমাদের সকলকে কষ্ট দিয়েছো।" (আবু দাউদ, হাদীস নং- ১১১৮, ইবনে হাব্বান, হাদীস নং-২৭৭৯)

আরেক হাদীসে এই ধরণের লোকদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, জুমুআ'র দিনে দেরী করে এসে যারা লোকজনকে কষ্টে নিক্ষেপ করে তাদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে পা বাড়িয়ে সম্মুখে আসার চেষ্টা করে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেন–

مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِتُّخِذَ جِسْرًا اِلٰى جَهَنَّمَ–

"জমুআ'র দিনে যারা লোকজনের কাতারের মধ্য দিয়ে অথবা তাদের ঘাড়ের ওপর পা বাড়িয়ে দিয়ে সম্মুখে আসার চেষ্টা করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশকারী লোকদের জন্যে সেতু বানিয়ে দেয়া হবে।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ৫১৩, ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং- ১১১৬)

এ সম্পর্কে তৃতীয় আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا–

"যে ব্যক্তি জুমুআ'র দিনে খুতবার সময় নিরবে খুতবা না শুনে অর্থহীন কথাবার্তায় লিপ্ত থাকবে এবং যারা দেরীতে মসজিদে এসে লোকজনকে কষ্ট দিয়ে ঘাড়ের

ওপর দিয়ে পা বাড়িয়ে সম্মুখে আসার চেষ্টা করবে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের নামাজ হলেও জুমুআ'র ফযিলত থেকে তারা বঞ্চিত হবে অর্থাৎ তাদের জুমুআ' যোহরে পরিণত হবে।" (আবু দাউদ, হাদিস নং- ৩৪৭, ইবনে খুযাইমাহ্, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫৬)

আমরা এ বিষয়ে আলোচনার সুত্রপাত এ জন্যেই প্রয়োজন মনে করেছি যে, সাধারণত মুসলমানদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোকজন দেরী করে জুমুআ'র দিনে মসজিদে এসে পূর্ব থেকে বসে থাকা লোকদের কষ্ট দিয়ে বা লোকজনের ঘাড়ের ওপর দিয়ে পা বাড়িয়ে সম্মুখের দিকে যাবার চেষ্টা করে। এতে করে পূর্ব থেকে বসে থাকা লোকজন মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও মনে মনে বিরক্তি বোধ করে। নবী করীম (সাঃ) এই শ্রেণীর লোকজনের উদ্দেশ্যে যে বদদোয়া করেছেন, সেই বদদোয়ার মধ্যেও এসব লোকজন নিজেদেরকে শামিল করে।

জুমুআ'র দিনে যারা এমন কাজ কারে তারা অবশ্যই জুমুআ'র বিরাট ফযিলত থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধুমাত্র যোহর নামাজ আদায়ের সওয়াব পেয়ে থাকে। জুমুআ'র দিনের অসীম ফযিলত, বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্যে পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করে মসজিদে এসে ইমামের কাছাকাছি বা সম্মুখের কাতারে ডান দিকে বসে সম্মুখের কাতার পূর্ণ করে নীরবে খুতবা শুনে জুমুআ'র নামাজের সকল হক আদায় করা তেমন কোনো কঠিন কাজই নয়, বরং এটা অত্যন্ত সহজ নেকীর কাজ। শুধুমাত্র প্রয়োজন একটু সতর্ক ও সচেতন হওয়া এবং একটু সচেতনতার পরিচয় দিলেই অসীম সওয়াব ও কল্যাণ লাভ করা যায়। আর অসতর্কতার পরিচয় দিলে সওয়াবের পরিবর্তে আমলনামার অনেকগুলো পৃষ্ঠা অকল্যাণ ও গোনাহ দিয়ে পূর্ণ হয়।

তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়কারীর মর্যাদা

মানুষের প্রবণতা হলো, সহজ পন্থায় এবং অল্প শ্রমে অধিক উপার্জন করা। এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে মানব জাতির সম্মুখে এমন সহজসাধ্য নেকীর কাজ পেশ করেছেন, যা আঞ্জাম দিয়ে তারা আমলনামা পরিপূর্ণ করতে পারে। ঠিক এ কারণেই ইসলাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ইসলাম হলো মানুষের অভ্যন্তরীণ ভাব-প্রবণতা ও স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান'। এবং এটাও ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট যে, ইসলাম মানুষের বহনের অতিরিক্ত বা সাধ্যের অতীত অথবা মানুষের জন্যে পালন করা কষ্টসাধ্য কোনো কিছুই মানুষকে করতে নির্দেশ দেয়নি।

ইসলামের প্রত্যেকটি বিধানই পালন করা অত্যন্ত সহজসাধ্য এবং নেকীর কাজ। ইসলামের বিধান অসুরণ করলে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপন হয়।

সাধারণত মানুষ আট ঘন্টা ডিউটি করলে নির্ধারিত বেতন পায় কিন্তু অতিরিক্ত কাজ করলে তথা ওভার টাইম করলে নির্ধারিত বেতনের সাথে সাথে অতিরিক্ত বিনিময়ও পেয়ে থাকে। সেই সাথে অতিরিক্ত কর্ম সম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টির আওতায় থাকে। ঠিক একইভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে সাথে যারা রাতের শেষ প্রহরে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে, তাদের সাথে মহান আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং সে ব্যক্তি মহান মালিকের মমতার দৃষ্টির আওতায় থাকে।

ওভার টাইম বা অতিরিক্ত কাজ করা যেমন সকল মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়, তেমনি আরামের শয্যা ত্যাগ করে শেষ রাতে মহান মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দুই হাত বেঁধে দাঁড়ানো একটু কষ্টকর কাজই বটে। কিন্তু এই কাজটি যে কত উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন কাজ, মানুষ যদি তা অনুভব করতো তাহলে শেষ রাতে নামাজ আদায় করার জন্যে প্রয়োজনে সারা রাত জেগে থাকতো। জান্নাতে যারা উচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন হবে, তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে বলেছেন, 'এরা হলো সেইসব লোক, যারা শেষ রাতে নিজ মালিকের কাছে কাকুতি-মিনতি জানায়, ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, তারা রাতে খুব কমই ঘুমায়, বিছানা থেকে তাদের পিঠ পৃথক থাকতো, আল্লাহর দরবারে কান্নার মধ্য দিয়েই তাদের রাত অতিবাহিত হতো, এরা হাসতো কম কাঁদতো বেশী।'

এটা অভ্যাসের ব্যাপার এবং অভ্যাসকে নিজের দাসে পরিণত করতে হবে। তাহাজ্জুদের নামাজের অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে, প্রথম দিকে একটু কষ্ট হলে তা যখন অভ্যাসে পরিণত হবে তখন একদিন তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতে না পারলে সেই দিনটিতে এক বিমর্ষতা বা বিষন্নভাব সমগ্র দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। তাহাজ্জুদ নামাজের মধ্যে যে তৃপ্তি রয়েছে, স্বাদ রয়েছে একজন মানুষ যখন সেই তৃপ্তি ও স্বাদের সন্ধান পায় তখন সেই মানুষ শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকে।

তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের সাথে সাথে ইশা ও ফজর নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করার অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে। হাদীস শরীফে এই দুই ওয়াক্ত নামাজের প্রতি অবহেলাকারীকে মুনাফিক বলা হয়েছে। মুনাফিকদের জন্যে ইশা ও ফজরের নামাজ আদায় করা খুবই কষ্টকর বলে নবী করীম (সাঃ) উল্লেখ করেছেন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ
وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ–

"যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামায়াতে আদায় করলো, সে ব্যক্তি যেনো অর্ধেক রাত নামাজে দাঁড়িয়ে ইবাদাত করলো, আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামায়াতে আদায় করলো সে ব্যক্তি যেনো সারা রাত ইবাদাতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করলো।" (মুসলিম, হাদীস নং-৬৫৬)

এই হাদীসের অর্থ এটা নয় যে, শুধু ফজরের নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করতে হবে এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পরিত্যাগ করতে হবে। ফজরের নামাজ তো অবশ্যই জামায়াতের সাথে আদায় করতে হবে, সেই সাথে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়েরও অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে। কারণ তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়কারীর সম্মান-মর্যাদা মহান আল্লাহর কাছে অনেক অনেক উচ্চে। ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষকেই ঘুমানোর সময় শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের প্রবল ইচ্ছা-আকাঙ্খা নিয়ে বিছানায় যেতে হবে। যথাসময়ে ঘুম থেকে জাগলে অবশ্যই তাহাজ্জুদ আদায় করতে হবে। আর যদি ঘুম থেকে জাগতে না পারে, তাহলেও শুধু মাত্র নিয়তের কারণে তার আমলনামায় তাহাজ্জুদ আদায়ের সওয়াব লিখে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

যেসব মুসলিম নারী-পুরুষের জন্যে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা কষ্টকর, তাদেরকে অবশ্যই এই উত্তম অভ্যাস সৃষ্টির মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক সৃষ্টি করা উচিত। প্রত্যেক দিন আদায় করতে না পারলেও প্রত্যেক দিন ঘুমানোর সময় অন্তত তাহাজ্জুদ আদায়ের নিয়ত করে ঘুমানো উচিত। সেই সাথে ইশা ও ফজরের নামাজ যথাসময়ে আদায় করার অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে। এতে করেও আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার নিয়তের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তার আমলনামায় তাহাজ্জুদ আদায়ের সওয়াব লিখে দিতে পারেন। কারণ তিনি তাঁর বান্দার আন্তরিক ইচ্ছাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁর রহমত সমগ্র সৃষ্টি জগতকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। তিনি ইচ্ছে করলে বান্দার নিয়তের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিয়ে বান্দার আমলনামা নেকীতে পরিপূর্ণ করে দিতে পারেন।

একাগ্রতা ও একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায় করা

দুনিয়া-আখিরাতে যাবতীয় সফলতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে 'ফালাহ্' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সূরা মুমিনুন এর সূচনাতেই ঐ সকল ঈমানদারদের জন্যে ফালাহ্ তথা সফলতা ও কল্যাণ এর সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে, যারা বিনয় অবনত চিত্তে, একাগ্রতার সাথে ও একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায় করে।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ–

"নিঃসন্দেহে সেসব ঈমানদার মানুষরা মুক্তি পেয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাজে একান্ত বিনয়াবনত হয়।" (সূরা আল মুমিনুনঃ ১-২)

বিনয়াবনত চিত্ত, একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার আরেকটি তাৎপর্য হলো, 'হুযুরে কালবী' সহকারে নামাজ আদায় করতে হবে। অর্থাৎ নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরজ আদায় করার সময় হৃদয়-মন মস্তিষ্ককে একান্তভাবেই নামাজের প্রতি অনুরক্ত রাখতে হবে এবং সকল মনোযোগের কেন্দ্র হতে হবে একমাত্র নামাজ। নামাজ আদায়রত অবস্থায় ভিন্ন কোনো চিন্তা-চেতনা, কল্পনা, আবেগ-উচ্ছাস ও ধ্যান-ধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। নামাজ আদায়কালে নামাজের বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, নামাজের মধ্যে যেসব প্রয়োজনীয় সূরা, দোয়া-দরুদ পড়া হচ্ছে এসবের অর্থ, ব্যাখ্যা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য জেনে নিয়ে এগুলোর প্রতি মনোযোগ নিবিষ্ট রেখে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর অসীম শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করতে হবে। তিনি আমার সম্মুখে উপস্থিত রয়েছেন। নবী করীম (সাঃ) বিষয়টি এভাবে উপস্থাপন করেছেন–

اَنْ تَعْبُدَاللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ–

"মহান আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করো যেনো তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। আর মনে যদি এই অবস্থার সৃষ্টি করতে না পারো, তাহলে মনে এ অবস্থা সৃষ্টি করো যে, তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।" (মুসলিম, হাদীস নং- ৮)

নামাজের প্রতি একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন তুমি নামাজ আদায় করো তখন মনে মনে এ কথা চিন্তা করো, সম্ভবত এটাই তোমার জীবনের শেষ নামাজ। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ–

"নামাজ এমনভাবে আদায় করো যে, এটাই তোমার জীবনের শেষ নামাজ।" (মাজমাউ'য যাওয়ায়েদ, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৯, তারগীব ওয়াত্ তারহীব, হাদীস নং- ৪৯০৮)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) একদিন মসজিদে গেলেন। সে সময় অন্য একজন লোকও মসজিদে প্রবেশ করলো। লোকটি নামাজ পড়লো এবং আল্লাহ রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম জানালো। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, যাও আবার নামাজ পড়ো, তোমার নামাজ হয়নি। সুতরাং সে গিয়ে আবার নামাজ পড়লো এবং ফিরে এসে নবী করীম (সাঃ)-কে সালাম জানালো।

তিনি এবারও বললেন, আবার নামাজ পড়ো, তোমার নামাজ হয়নি। এবার লোকটি বললো, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, এর চেয়ে সুন্দর করে নামাজ পড়তে আমি জানি না। সুতরাং আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন–

اذَا قُمْتَ الَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَاتَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَالِكَ فِىْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا–

"যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে, তখন তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা) বলে আরম্ভ করবে এবং কোরআনের যেখান থেকে পাঠ করা তোমার জন্য সহজ হয় সেখান থেকে পাঠ করবে। এরপর ততক্ষণ পর্যন্ত এমনভাবে রুকূ করবে যেন রুকূতে প্রশান্তি আসে। রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। প্রশান্তভাবে সোজা হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর সিজদা এমনভাবে করবে যাতে সিজদায় প্রশান্তি আসে। এরপর সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে প্রশান্তভাবে কিছুক্ষণ বসবে। এরপর আবার প্রশান্তভাবে সিজদা করবে এবং এভাবে তোমার সকল নামাজ আদায় পূর্ণ করবে।" (বোখারী, হাদীস নং- ৭৫৭, মুসলিম, হাদীস নং- ৩৯৭)

এই হাদীসে রুকু থেকে উঠে এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আদেশ দেয়া হয়েছে যে, সম্পূর্ণ দেহ যেনো সোজা হয়ে যায় এবং দেহের অস্থিসমূহ যথাস্থানে মিলিত হতে পারে। এরপর দুই সিজদার মধ্যে এমন প্রশান্তির সাথে বসতে বলা হয়েছে, যাকে ফিকাহ্র পরিভাষায় 'সমতা বিধান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটা ওয়াজিব। আল্লামা শামী (রাহঃ) উল্লেখ করেছেন, রুকু থেকে সোজা হওয়া অর্থাৎ দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মধ্যে বৈঠকে সমতা বিধান করা অর্থাৎ পরিপূর্ণ প্রশান্তির সাথে বসে ধীরস্থিরভাবে দাঁড়ানো ওয়াজিব। (দুররুল মুখতার, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৩২, ফতহুল কাদীর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১২)

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি জেনে বুঝে 'তা'দীলে আরকান' তথা সমতা বিধানের নিয়ম-কানুন পরিত্যাগ করে দ্রুততার সাথে নামাজ আদায় করে, তাহলে সে ব্যক্তির নামাজ হবে না। তবে ভুলে যদি কেউ নামাজের সমতা বিধানের নিয়ম-কানুন ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে সহু সিজদা দিতে হবে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, সাধারণ মুসল্লি বা নামাজীগণ দূরে থাক, ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো ইমাম-খতীবদের অবস্থাও এমন যে, যখন তাঁরা জামায়াতে নামাজ আদায় করান, তখন হাদীসে বর্ণিত নামাজ আদায়ের যথাযথ নিময়-কানুন, 'তা'দীলে আরকান' তথা নামাজে সমতা বিধানের কথা ভুলে যান। প্রত্যেক ইমাম-খতীবদের এটা দায়িত্ব যে, তাঁরা পরিপূর্ণ ও যথাযথ নিয়ম পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করাবেন এবং ক্রমাগতভাবে মুসল্লিদের দৃষ্টি এ বিষয়টিও দিকে আকৃষ্ট করবেন। প্রয়োজনে স্বয়ং প্রশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সাধারণ নামাজী লোকদেরকে এ ব্যাপারে বাস্তবে প্রশিক্ষণ দিবেন।

নামাজ আদায়কালে দাঁড়ানো ও বসার ক্ষেত্রে ধিরস্থিরতা ও প্রশান্তি অবলম্বনের এক উত্তম পদ্ধতি রয়েছে। সেটা হলো, রুকু এবং রুকু থেকে দাঁড়িয়ে, সিজ্দায় এবং দুই সিজদার মাঝে বসে ঐ সকল মাসনুন দোয়া পড়া, যা নবী করীম (সাঃ) পড়তেন। এসব দোয়ার অর্থ বুঝে সহীহ্-শুদ্ধভাবে পড়লে এমনিতেই ধিরস্থিরভাবে ও প্রশান্তির সাথে নামাজ আদায় করা যাবে। নতুবা নামাজ আদায় করতে গিয়ে বড় ধরণের ক্ষতির মুখোমুখী হতে হবে।

রুকু থেকে পরিপূর্ণভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শুদ্ধভাবে স্পষ্ট উচ্চারণে পড়তে হবে-

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ-حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ-

রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ, হাম্দান কাছিরান ত্বাইয়িবান মুবারাকান ফিহী।

"হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা কেবলমাত্র তোমারই জন্যে নিবেদিত, অনেক অনেক বেশী প্রশংসা তোমার। তুমি পবিত্র ও বরকতসম্পন্ন।" (মুসলিম, হাদীস নং- ৭৭২)

এক সিজদা দিয়ে উঠে বসে দ্বিতীয় সিজদায় যাবার পূর্বে এই দোয়া পড়তে হবে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ، وَارْحَمْنِیْ، وَاهْدِنِیْ، وَاجْبُرْنِیْ، وَارْفَعْنِیْ، وَعَافِنِیْ، وَارْزُقْنِیْ-

আল্লাহুম্ মাগ্‌ফিরলী ওয়ার হামনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়াজ্‌বুরনী ওয়ারফা'নী ওয়া'আফিনী ওয়ারযুক্নী।

"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি রহম করো, আমাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করো, আমার প্রয়োজন পূরণ করে দাও, আমার সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও, আমাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করো, আমাকে মাফ করে দাও এবং আমাকে রিয্ক দান করো।" (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৮৫০)

নামাজ শেষে দোয়া পড়ার ফযিলত

নামাজের শেষ বৈঠকে দরূদ পড়ার পরে সুন্নাত দোয়াসমূহের কথা হাদীসে মওজুদ রয়েছে। বিশেষ করে এই দোয়াটি–

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ-وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ-وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ-اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ-

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিন আযাবিল ক্বাব্‌রি, ওয়া আউ'যুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জাল, ওয়া আউ'যুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাহ্‌ইয়া ওয়াল মামাত, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল মা'ছামি ওয়াল মাগরাম।

"হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবর আযাব থেকে, আশ্রয় চাই মাসীহে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে, আশ্রয় চাই জীবন মৃত্যুর ফিৎনা থেকে, হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই পাপাচার ও ঋণভার হতে।" (বোখারী, হাদীস নং- ৮৩২, মুসলিম, হাদীস নং- ৫৮৯)

উল্লেখিত দোয়াটি পড়া সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন–

اَنَّ رَسُوْلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ-

"নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যেমন তিনি কোরআনের কোনো সূরা শিক্ষা দিতেন।" (মুসলিম, হাদীস নং- ৫৯০)

বিখ্যাত তাবেঈ' তাউস (রাহঃ) সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (রাহঃ) লিখেছেন যে, 'তিনি একবার তাঁর নিজের সন্তানকে বললেন, তুমি কি তোমার নামাজে ঐ দোয়া পড়েছো? সন্তান জবাবে অস্বীকৃতি জানালে তিনি সন্তানকে বললেন, তুমি নিজের নামাজ পুনরায় আদায় করো।' তাঁর এ কথা বলার অর্থ এটা নয় যে, এ দোয়া ব্যতীত নামাজ হয় না। বরং দোয়াটির গুরুত্ব বুঝানোর জন্যেই তিনি তাঁর সন্তানকে এ কথা বলেছিলেন।

এখানে নামাজের শেষ বৈঠকে দরুদের পরে দোয়া পড়ার কথাই শুধু বলা হয়েছে, কিন্তু নামাজের শেষে বিশেষ করে ফরজ নামাজের শেষে শরীয়াত সম্মত দোয়া

চাওয়া সুন্নাত। শুধু তাই নয়, স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবকে নামাজ থেকে ফারেগ হবার পরে দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। ইমাম বোখারী (রাহঃ) তাঁর রচিত কিতাব সহীহ্ বোখারীতে কিতাবুদ্দাওয়াতে ১৮ নং অধ্যায়ে 'নামাজের পরে দোয়া করার বর্ণনা' নামে পৃথক একটি শিরোণাম সন্নিবেশিত করেছেন। ইমাম ইবনে হাজার (রাহঃ) ফতহুল বারিতে এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'ঐসব লোক যারা মনে করে নামাজের পরে দোয়া করা যাবে না, তাদের ভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে এই শিরোণাম উল্লেখ করেছেন।' (ফতহুল বারী, ১১ খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ১৩৩)

ইমাম তিরমিযী (রাঃ) আবু ইমামাহ্ বাহেলী (রাঃ) থেকে এ সম্পর্কিত একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন–

قِيْلَ يَا رَسُوْلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَعَقِبَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ–

"নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কোন্ দোয়া সবথেকে বেশী কবুল হয়? জবাবে তিনি বললেন, রাতের শেষ অংশে এবং ফরজ নামাজ পরের দোয়া।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৪৯৯, জামেউ'স্ সাগীর, হাদীস নং- ৫৯, আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, ৩০৭, ৫৭৯, মিশকাতুল মাসাবীহ্, হাদীস নং- ৭২৬)

উল্লেখিত বরকতময় হাদীসটি একটি বড় হাদীসের নীচের অংশ এবং এ হাদীসের এক স্থানে মহান আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সাঃ)-কে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! যখন নামাজ থেকে অবসর নিবে তখন বলবে, (অর্থাৎ ফরজ নামাজ শেষেই এই দোয়া পড়ো)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاَنْ تَغْفِرَلِىْ وَتَرْحَمَنِىْ وَتَتُوْبَ عَلَىَّ وَاِذَا اَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ–

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ফি'লাল খাইরাতি, ওয়া তারকাল মুন্‌কারাতি ওয়া হুব্বাল মাসাকি-নি ওয়া আন তাগ্‌ফিরালি ওয়া তার হামানী, ওয়া তাতুবা আলাই ইয়া ওয়া ইযা আরাদতা বিই'বাদিকা ফিত্‌নাতান ফাক্ব বিদ্বনী ইলাইকা গাইরা মাফতুন।

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে যাবতীয় কল্যাণ কামনা করছি, সকল প্রকার অশুভ কাজ পরিত্যাগ করার তাওফীক প্রার্থনা করছি, দরিদ্রদের প্রতি ভালোবাসা

কামনা করছি, আমি তোমার কাছে মাগফিরাত কামনা করছি, তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করো এবং আমার তাওবা কবুল করো। তুমি যখন তোমার বান্দাদেরকে ফিতনায় নিমজ্জিত করতে চাইবে, তখন ঐ ফিতনায় আমি জড়িত হবার পূর্বেই আমাকে তুমি তোমার নিজের কাছে ডেকে নিও।" (জামিউ'স্ সাগীর, হাদীস নং- ৫৯)

আমরা ঐসব দোয়াকে পবিত্র দোয়া এ জন্যেই বলেছি যে, এই দোয়া আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং নবী করীম (সাঃ)-কে শিখিয়েছেন। কারণ এই দোয়ার মধ্যে মানুষকে স্বচ্ছ, পবিত্রকরণ ও শ্রেষ্ঠকরণের দৃষ্টিকোণ নিহিত রয়েছে। এই দোয়ার অর্থ ও তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা কত উচ্চ, শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান শব্দসমূহের সমন্বয়ে এই দোয়া শিখিয়েছেন এবং এর মধ্যে দুনিয়া-আখিরাতের প্রত্যেক দিকে কল্যাণ অনুসন্ধান ও প্রত্যেক অশুভ জিনিস থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার আবেদন রয়েছে।

উল্লেখিত বরকতময় হাদীসে গরীব ও দরিদ্র লোকদের প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা পোষণের আবেদন রয়েছে এবং এই মহান কাজ আঞ্জাম দেয়ার মধ্য দিয়ে সমাজের অসহায়, গরীব ও অবহেলিত লোকদের প্রতি হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। এই দোয়ার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর কাছে তাঁর রহমত ও ক্ষমার জন্য আবেদন এবং তওবা করার তাওফীক কামনা করা হয়েছে। সেই সাথে মানুষ হিসেবে নিজের দুর্বলতার স্বীকৃতি দিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আবেদন করা হয়েছে যে, আমি বড় দুর্বল, আমার অপরাধ নিও না, আমার প্রতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি নিক্ষেপ করো।

দোয়ার শেষের বাক্যসমূহে নিজের অসহায়ত্ব ফুটিয়ে তুলে আবেদন করা হয়েছে, পৃথিবীর সকল কিছুই যখন অবাধ্যতা, বিদ্রোহ, সীমালংঘন, বিপর্যয় ও পাপাচারে কলুষিত হতে থাকবে, তখন পাপাচারের গন্ধ আমাকে স্পর্শ করার পূর্বেই তুমি ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখে তোমার কাছে আমাকে উঠিয়ে নিও।

উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী (রাহঃ) লিখেছেন, 'ইমাম ইবনে হাজার (রাহঃ) বলেছেন, এর উদ্দেশ্যে এটাই যে নামাজ থেকে অবসর নেয়ার পরই এই দোয়া পড়তে হবে।' (শরহুল মিশকাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২১১)

এসব হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ফরজ নামাজের পরে দোয়া করা প্রমাণিত সুন্নাত এবং এটা আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং তাঁর নবী (সাঃ)-কে এই আদেশ দিয়েছেন যে, যখন নামাজ থেকে অবসর নিবে তখন দোয়া করবে। ইমাম ইবনে কাসীর (রাহঃ) 'সূরা আলাম নাশরাহ্-এর ফা ইযা

ফারাগতা ফানসাব ওয়া ইলা রাব্বিকা ফারগাব' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা নামাজ থেকে অবসর নিবে তখন ঐ স্থানেই বসে দোয়া করবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা ইনশিরাহ্)

ইমাম কুরতুবী (রাহঃ) নিজ তাফসীরে লিখেছেন, ফাইযা ফারাগ্তা আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও কাদাতাহ্ (রাহঃ) বলেছেন, অর্থাৎ যখন তুমি নামাজ থেকে অবসর নিবে ফানসাব অর্থাৎ বেশী বেশী দোয়া করবে।

ইমাম বাগভী (রাহঃ), যার তাফসীর সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রাহঃ) উচ্চ প্রশংসা করেছেন; উক্ত তাফসীরে সূরা আলাম নাশরাহ্-এর শেষ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, ইবনে আব্বাস (রাহঃ), কাতাদাহ্, যাহাক, মুকাতিল এবং কালবী (রাহঃ)-সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মতামত হলো, যখন ফরজ নামাজ থেকে অবসর নেয়া হবে তখন নিজের মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে দোয়া করা এবং অত্যন্ত কাকুতি মিনতির সাথে আবেদন করলে তা অবশ্যই দান করা হবে। (মায়আ'লিমুত তানযিল লিল বাগবী)

ফরজ নামাজের পরে দোয়া করা সম্পর্কে তথা সাধারণভাবে যে কোনো নামাজ, যদিও তা নফল হয়, নামাজের পরে দোয়া করা সম্পর্কে হাদীস মওজুদ রয়েছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি একজন লোককে দেখলেন, সে নামাজের মধ্যে নিজের হাত উঁচু করে দোয়া করছে। তিনি বললেন, নবী করীম (সাঃ) নামাজ থেকে অবসর না নিয়ে নিজের হাত উঁচু করে দোয়া করেননি। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) নামাজ শেষে দুই হাত তুলে দোয়া করতেন। (জামেউয্ যাওয়ায়েদ, দশম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ১৬৯, ফজলুদ দোয়া, হাদীস নং- ৪২)

নামাজ শেষ করেই দোয়া করা সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আহ্মাদ (রাহঃ) আরেক হাদীস উল্লেখ করেছেন, নামাজ দুই রাকাআত। প্রত্যেক দুই রাকাআতের পরে তাশাহ্হুদ, পরিপূর্ণ নামাজের জন্যে একাগ্রতা, বিনয়, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও নিজের সকল দুর্বলতা মহান আল্লাহর সম্মুখে নিবেদন করে নামাজ আদায় করো। এরপর নামাজ থেকে অবসর নিয়ে হাতের তালু নিজের চেহারার দিকে রেখে দুই হাত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তুলে ধরো এবং আবেদন করো, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার রব! যে ব্যক্তি এভাবে করে না সে এমন এমন অর্থাৎ তার জন্যে কঠিন সতর্কবাণী রয়েছে। (তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৮৫, আহ্মাদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২২৯)

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রাহঃ) সুনানে তিরমিযীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযীতে ফরজ নামাজের পরে দোয়া করা

সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং পরিশেষে লিখেছেন, আমি বলছি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বক্তব্য রয়েছে যে, নামাজের পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করা জায়েয রয়েছে। যদি কেউ এভাবে আমল করে ইনশাআল্লাহ্ এতে কোনো অসুবিধা নেই। (তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২০২)

এ ব্যাপারে সকল মতামত সম্পর্কিত ছিলো ফরজ নামাজের শেষে দোয়া চাওয়ার ক্ষেত্রে যে তা সুন্নাত। কিন্তু দোয়া করার সময় দুই হাত উঠানো কি সুন্নাত? এ প্রশ্নের জবাবও সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত। ইমামুল হাফিজ জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রাহঃ) এ বিষয়ের ওপর এক স্বতন্ত্র পুস্তক লিখে তার নাম দিয়েছেন, 'ফাযলুল ওয়াআ'য়ে ফি হাদীসি রাফ্য়ে'ল ইয়াদাইনে ফিদ্ দুআ'য়ে'। এই পুস্তকে তিনি ৪০টিরও অধিক হাদীস উল্লেখ করে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, দোয়া করার সময় হাত উঠানো সুন্নাত আমল। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ
اِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ–

"মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক লজ্জাশীল এবং করুণাময়, মহান আল্লাহ্ এ ব্যাপারে খুবই লজ্জাবোধ করেন যে, বান্দা তাঁর দরবারে দুই হাত উঠিয়ে কিছু প্রার্থনা করবে আর তিনি কিছু না দিয়ে হাত ফিরিয়ে দিবেন।" (আহ্মাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং- ১৭৫৭)

ফরজ নামাজের পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করার বিষয়টি এ সংক্রান্ত সকল বর্ণনা ও মতামত থেকে প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে মুসলমানদেরকে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, সম্মিলিতভাবে নয়, একাকী করতে হবে। ফরজ নামাজের শেষে নামাজী ব্যক্তি হাত উঠিয়ে দোয়া করতে পারে। কিন্তু ইমাম এবং মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দোয়া করা যেমন আমাদের দেশে সাধারণভাবে এই প্রথা একান্ত প্রয়োজনীয় বানিয়ে নেয়া হয়েছে, এ পদ্ধতিকে মুস্তাহাব মনে করা সঠিক নয়।

বিখ্যাত মুফতী জনাব রশীদ আহ্মাদ (রাহঃ) লিখেছেন, নবী করীম (সাঃ) প্রায় সবসময়ই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করতেন। যদি তিনি নামাজ শেষে কখনো সম্মিলিতভাবে দোয়া করতেন তাহলে বিষয়টি কেউ না কেউ অবশ্যই বর্ণনা করতেন। এ ক্ষেত্রে বিষয়টিকে কেউ যদি অত্যাবশ্যকীয় করে নেয়, তাহলে তা স্পষ্টতই বিদাআত হবে। (আহ্সানুল ফাতওয়া, তৃতীয় খন্ড)

সকাল সন্ধ্যায় পড়ার দোয়া

প্রসিদ্ধ দোয়াসমূহের মধ্যে আরেকটি দোয়া সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দোয়াটি সকালে পড়বে সে যেনো সারা দিনে মহান আল্লাহর যত নিয়ামত ভোগ করলো তার শোকর আদায় করে নিলো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পড়লো সে যেনো সারা রাত আল্লাহ প্রদত্ত সকল নেয়ামতের শোকর আদায় করে নিলো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে গানাম বায়াযী (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে এই দোয়া পড়লো–

اَللّٰهُمَّ مَاأَصْبَحَ بِىْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِاَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ–

আল্লাহুম্মা মা আস্‌বাহা বি মিন নি'মাতি আও বি আহাদিন মিন খাল্‌ক্বিকা ফামিনকা ওয়াহ্‌দাকা লা শারিকা লাকা ফালাকাল হাম্‌দু ওয়া লাকাশ্‌ শুক্‌রু।

"হে আল্লাহ! আমার সকাল, আমার সন্ধ্যা, আমার সমগ্র জীবনে এবং অন্যান্য সকল সৃষ্টির মধ্যে যত নিয়ামত রয়েছে তা তুমিই দান করেছো। সকল প্রশংসাই তোমার জন্যে এবং যে কোনো ব্যাপারে কৃতজ্ঞতাও শুধু তোমারই জন্যে।

সে ব্যক্তি দিনের সাথে সম্পর্কিত সকল নিয়ামতের শোকর আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়লো সে ব্যক্তি রাতের সাথে সম্পর্কিত সকল নিয়ামতের শোকর আদায় করলো।" (সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পড়ার সময় 'মা আস্‌বাহা' এর স্থলে 'মা আম্‌সা' উচ্চারণ করতে হবে। আবু দাউদ, হাদীস নং- ৫০৭৩)

যে দোয়া অবশ্যই মঞ্জুর হয়

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ–

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) একজন লোককে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করতে শুনলেন। (লোকটি এভাবে দোয়া করছে)–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ–

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বি আন্নাকা আনতাল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা আনতাল আহাদুস্ সামাদুল্লাযি লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনিই একমাত্র আল্লাহ। আপনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই। আপনি এক এবং একক, সকলেই আপনার মুখাপেক্ষী, আপনি কারো মুখাপেক্ষী নন। যিনি কারো ঔরসে জন্মগ্রহণ করেননি এবং কাউকে জন্ম দিবেন না। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ কেই।"

فَقَالَ دَعَا اللّٰهَ بِاَسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِيْ اِذَا سُئِلَ اَعْطٰى وَاِذَا دُعِيَ بِهٖ اَجَابَ- (روله الترمذى و ابوداؤد)

"তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন, এই ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালাকে তাঁর ইস্‌মে আজমের দ্বারা ডেকেছে। এর দ্বারা তাঁর কাছে কেউ কিছু চাইলে তিনি তাকে তা দান করেন। আর কেউ যদি তাঁকে এর দ্বারা ডাকে তাহলে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন।" (তিরমিযী, আবু দাউদ)

কল্যাণ কামনা ও অকল্যাণ থেকে মুক্ত থাকার দোয়া

মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে যে দোয়া-ই করা হোক না কেনো, সে দোয়া হতে হবে নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থা অনুসারে। রাসূল (সাঃ) যে সকল দোয়া করেছেন, তা আকারে বড় না হলেও এসব দোয়ার মধ্যে যেসব শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ছোট্ট একটি শব্দের মাধ্যমে তিনি অনেক অনেক কথা মহান মালিকের কাছে পেশ করেছেন, দোয়ার মধ্যে তিনি এমন সকল শব্দ চয়ন করেছেন, যার প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে একদিকে যেমন মহাসমুদ্র লুকিয়ে রয়েছে, তেমনি উক্ত শব্দসমূহ মর্মস্পর্শী এবং আবেদনময়ী।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আবেদন জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁকে সহজ ও ছোট্ট ছোট্ট শব্দসমূহের সমন্বয়ে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিলেন, যে দোয়ার মধ্যে পৃথিবী ও আখিরাতের মানুষের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তা সবই শামিল রয়েছে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ (رض) قَالَ، رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا، قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ

شَيْئًا قَالَ، أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَجْمَعُ ذٰلِكَ كُلَّهُ؟ تَقُوْلُ–

"হযরত আবু উমামা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আবেদন জানালেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি মহান আল্লাহ্র কাছে অনেক দোয়া করেন, কিন্তু সে সকল দোয়ার সবগুলো আমাদের স্মরণে থাকে না। নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন দোয়ার কথা বলবো না- যা সকল দোয়ার সমষ্টি!' এরপর তিনি এ দোয়া শিখিয়ে দিলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلاَغُ، وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ–

আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্আলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা মিনহু নাবিইউকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওয়া নাউ'যুবিকা মিন শাররি মাস্ তাআ'যা মিনহু নাবিইউকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওয়া আনতাল মুসতাআ'ন, ওয়া আলাইকাল বালাগ, ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুউ ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঐ সকল কল্যাণ কামনা করি, যে সকল কল্যাণ তোমার কাছে তোমার নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কামনা করেছেন। আমি তোমার কাছে ঐ সকল অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যে সকল অকল্যাণ থেকে তোমার নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আমি তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি, তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি এবং যে কোনো ধরণের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা তোমার কাছে ব্যতীত অন্য কারো কাছে নেই।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৫২১)

কঠিন কাজ সহজ করার দোয়া

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অথচ সহজ দোয়াসমূহের মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত দোয়াটি অভ্যন্তরীণ দিক থেকে উচ্চমর্যাদা ও বরকতসম্পন্ন দোয়া। নবী করীম (সাঃ) তাঁর আদরের দুলালী হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে এই দোয়া শিখিয়ে ছিলেন, যা দুনিয়া-আখিরাতের সকল কাজ সহজ করে দেয় এবং এই দোয়াকে 'পরশ মণি'

হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, হে ফাতিমা! তোমাকে কোন্ জিনিস আমার উপদেশ শোনা থেকে বিরত রেখেছে! তুমি সকাল-সন্ধ্যায় এ কথা বলতে থাকো–

يَاحَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ، اَصْلِحْ لِىْ شَأْنِىْ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ–

ইয়া হাই-য়ু ইয়া কাইয়ুমু বিরাহ্মাতিকা আস্তাগিছু আস্লিহ্ লি শাআনী কুল্লুহু ওয়া লা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বরফাতা আ'ইনিন।

অর্থাৎ "হে চিরঞ্জীব! হে ব্যবস্থাপক-নিয়ন্ত্রক! আমি তোমার রহমতের উসিলায় তোমার কাছে সাহায্য কামনা করছি। তুমি আমার সকল প্রকার লেনদেন ও কার্যক্রম সত্য-সঠিক করে দাও। আর আমাকে একটি মুহূর্তের জন্যেও আমার নফসের ওপর ছেড়ে দিও না এবং আমার সকল কাজ সহজ করে দাও।" (জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং- ৫৮২০, তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং- ৯৭৩, নাসাঈ, হাদীস নং- ৫৭০, আল বায্যার, হাদীস নং- ৩১০৭)

আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূরীকরণের দোয়া

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাকে পৃথিবীতে নানাভাবে ও পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে থাকেন। রোগ-ব্যধি, প্রাণ, ধন-সম্পদের ক্ষতি, কখনো বা বিপদ মুসিবত ও পেরেশানী দিয়ে, কর্মহীন অবস্থায় নিক্ষেপ করে অথবা উপার্জন সঙ্কীর্ণ করে ইত্যাদির মাধ্যমে বান্দাকে পরীক্ষার করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি বা ব্যয়ের তুলনায় উপার্জন হ্রাসও এসব পরীক্ষার অংশ বিশেষ। ঈমানদারকে এসব অবস্থায় ধৈর্য্য অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে–

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ–

"তোমরা ধৈর্য্য ও নামাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করো।" (সূরা বাকারাঃ ৪৫)

মুমিন পৃথিবীতে যে কোনো ধরণের পরীক্ষার মুখোমুখী হয়েও কখনো নিরাশ হয় না এবং আল্লাহর রহমত সম্পর্কে হতাশ হয় না। বরং এ অবস্থায় মুমিন মহান আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে থাকে. ধৈর্য্য অবলম্বন করে, ঈমান ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সে এটাই উপলব্ধি করে যে, এই পরীক্ষার মধ্যে

তার জন্যে অনেক বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং অতিদ্রুত এই পরীক্ষার সমাপ্তি ঘটবে। পরীক্ষা চলাকালে যেসব বান্দা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়, তাদের জন্যে বিপুল বিনিময় ও সওয়াবের এমন ধারাবাহিকতা চালু হয় যে, সে কত বিরাট কল্যাণের অধিকারী হয়েছে তা অনুভবও করতে পারে না।

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট বিষয় যে, মুমিনের জন্যে প্রত্যেকটি পরীক্ষাই একটি নিয়ামত বিশেষ। কারণ পরীক্ষার মাধ্যমে গোনাহ্ ক্ষমা করা হয়, গোনাহের কাফ্ফারা আদায় হয় এবং মুমিনের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে গোনাহ্গার, কাফির, মুশরিক, নাফরমান, ফাসিক, পাপাচারী ও দুষ্কৃত প্রকৃতির লোকদের জন্যে পরীক্ষা আযাব বিশেষ। কেননা এই শ্রেণীর লোকজন পরীক্ষায় নিপতি হয়ে ধৈর্য্য অবলম্বনও করে না, পাপ ও ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করে আল্লাহ্র দিকেও ফিরে আসে না এবং আল্লাহ্র রহমতের প্রতি আশাও পোষণ করে না।

যে কোনো ধরণের পেরেশানীতে নিপতিত হলেই অধিক পরিমাণে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করার তথা ইস্তেগফার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে ঐ ইস্তেগফার সম্পর্কে অনেক বেশী ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে, যে ইস্তেগফারকে 'সাইয়েদুল ইস্তেগফার' বা বড় ইস্তেগফার বলে গণ্য করা হয়েছে এবং এই ইস্তেগফার অধিক পরিমাণে পড়লে অর্থ-সম্পদ সম্পর্কিত দুর্দশা লাঘব হয়।

একইভাবে অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়লে জটিল সমস্যার দ্রুত সমাধান হয় ও গোনাহ্ ক্ষমা করা হয়। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) যখন নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! ফরজ ও ওয়াজিব আদায় করার পরে আমি যতটুকু সময় পাবো, ঐ সময়টুকু অন্য কোনো কাজে ব্যয় না করে কেবলমাত্র আপনার প্রতি দরুদ ও সালাম পড়ার কাজে ব্যয় করবো?

নবী করীম (সাঃ) জবাবে বললেন, 'তুমি যদি এমন করো অর্থাৎ সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্তে আমার প্রতি দরুদ পড়তে থাকো, তাহলে তোমার যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা দূর করে দেয়া হবে এবং তোমার গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে।' ইমাম তিরমিযী (রাহঃ) উল্লেখ করেছেন–

(قَالَ أُبَيٌّ) قُلْتُ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِىْ كُلَّهَا؟ قَالَ اِذَنْ تُكْفِىْ هَمَّكَ وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ–

"হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! আমি আমার সকল সালাত ও সালাম আপনার জন্যে উৎসর্গ করে

দিবো অর্থাৎ সবসময় আপনার প্রতি দরুদ ও সালাম পড়তে থাকবো? রাসূল (সাঃ) বললেন, তাহলে তো এ কাজ তোমার সকল পেরেশানী দূরীভূত হবার কারণে পরিণত হবে এবং তোমার গোনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (তিরমিযী, হাদীস নং-২৪৫৭, আহ্‌মাদ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩)

ঋণগ্রস্ত হবার কারণে পেরেশানী ও অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতায় নিপতিত হওয়া সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ অর্থনৈতিক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নিমজ্জিত হবে তখন ঘর থেকে বের হবার সময় এই দোয়া পড়বে, ইনশাআল্লাহ্ সকল পেরেশানী দূর হয়ে যাবে।

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَمَالِىْ وَدِيْنِىْ اَللّٰهُمَّ رَضِّنِىْ بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا قُدِّرَلِىْ حَتّٰى لاَ اُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا اَخَّرْتَ وَلاَ تَاخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ-

বিস্‌মিল্লাহি আ'লা নাফ্‌সী ওয়া মা-লী ওয়া দ্বী-নী আল্লাহুম্মা রাদ্বিনী বি কাদায়িকা ওয়া বা-রিকলী ফিমা কুদ্দিরালী হাত্তা লা উহিববা তা'জিলা মা আখ্‌খারতা ওয়া লা তা খিরা মা আ'জ্জালতা।

অর্থাৎ "আমি আমার প্রাণ, ধন-সম্পদ ও দ্বীনের ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করছি, (আমার প্রাণ, ধন-সম্পদ ও দ্বীন আল্লাহর হেফাজতে দিচ্ছি) হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার তাকদীরের ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট রাখো এবং তুমি আমার জন্যে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো তার মধ্যে বরকতের ফায়সালা করো। আমি তোমার পক্ষ থেকে যা বিলম্ব হবে তাতে দ্রুততা কামনা করিনা, আর তোমার পক্ষ থেকে যা দ্রুত হবে তাতে বিলম্বও কামনা করি না। (যে কোনো অবস্থায় আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকি)" (কিতাবুল আযকার, ইমাম নববী, হাদীস নং- ৩৮০, আমাল আল ইয়াওমে ওয়াল লাইল, হাদীস নং- ৩৫২)

কতিপয় আলেম-ওলামা রিয্‌কের মধ্যে অধিক বরকতের জন্যে এবং ব্যবসা বাণিজ্যকে ক্ষতি থেকে হেফাজতের জন্যে প্রত্যেক নামাজ শেষে সূরা কাওসার ও সূরা কুরাইশ পড়ার কথা বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর অসুস্থতা চলাকালে হযরত উস্‌মান (রাঃ) তাঁর সেবাযত্ন করতেন। তিনি তাঁকে তাঁর পুত্র সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, আমি নিজের পুত্রকে প্রতি রাতে সূরা আল ওয়াকিয়াহ্ তিলাওয়াত করার জন্যে আদেশ দিয়েছি। যার

বরকতে সবসময় দারিদ্রতা থেকে মুক্ত থেকেছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আল ওয়াকিয়াহ্) এ কারণেই আলেম-ওলামাগণ বলেছেন, প্রতি রাতে সূরা আল ওয়াকিয়াহ্ পড়া রিয্ক ও অর্থ-সম্পদে বরকতের কারণ।

হাদীস প্রচারকারীর প্রতি রাসূল (সাঃ)-এর দোয়া

ইসলামী শরীয়াতের ভিত্তি যে চারটি জিনিসের ওপর নির্ভরশীল এর মধ্যে সর্বপ্রধান হলো পবিত্র কোরআন এবং নবী করীম (সাঃ)-এর সুন্নাত তথা হাদীস। হিদায়াতের একমাত্র কেন্দ্র ও মশালই হলো কোরআন এবং সুন্নাহ্। আর ইজমা কিয়াসের ভিত্তিও এই দুটোর ওপর নির্ভরশীল। ঐ মুসলমান অত্যন্ত ভাগ্যবান যিনি পবিত্র কোরআনের খাদেম অর্থাৎ যিনি নিজে শিখেছেন এবং অন্যকে শিক্ষাদানে রত রয়েছেন। নবী করীম (সাঃ) হাদীসের প্রচার ও প্রসারের জন্যে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেছেন–

بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً–

"যদি তোমার কাছে আমার কোনো হাদীস পৌছে থাকে তাহলে তা তুমি অন্যের কাছে পৌছে দাও।" (বোখারী, হাদীস নং- ৩৪৬১)

আরেক স্থানে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ–

"যে ব্যক্তি উপস্থিত রয়েছে সে ব্যক্তি অনুপস্থিত লোকদের কাছে আমার কথা পৌছে দিবে।"

নবী করীম (সাঃ) ঐ সকল লোকদের জন্যে দোয়া করেছেন, যারা তাঁর হাদীস ও সুন্নাত অন্যান্য লোকদের কাছে পৌছে দেয়। তিনি বলেছেন–

نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبَلَّغَهُ غَيْرَهُ–

"আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তিকে সবসময় প্রাণবন্ত ও উত্তম অবস্থায় রাখুন, যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে হাদীস শুনে অন্যের কাছে পৌছে দেয়।" (ইবনু হাব্বান, হাদীস নং- ৬৭, আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩৬৬০, তিরমিযী, হাদীস নং- ২৬৫৮)

আরেক হাদীসে তিনি হাদীস প্রচারকারীর জন্যে দোয়া করে বলেছেন–

نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا
وَبَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا–

"আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ বান্দাকে সবসময় উত্তম অবস্থায় রাখুন, যে ব্যক্তি আমার কথা শুনে মুখস্থ করেছে এবং এর ওপর আমল করেছে। সেই সাথে আমার কথা ঐ ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে যে শোনেনি।" (ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং ২৩১, আহ্মাদ, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৮০)

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা অনুষ্ঠানে যে কোনো হাদীস বা কল্যাণকর কথা শুনে সর্বাগ্রে বিষয়টি নিজে ভালোভাবে বুঝে এর ওপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এরপর তা অন্যের কাছে পৌছাতে হবে, তাহলে আমরাও ঐ মহাসৌভাগ্যবান লোকদের মধ্যে শামিল হতে পারবো, যাদের ব্যাপারে স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) দোয়া করেছেন। হাদীসের বন্ধনে যারা নিজেদেরকে আবদ্ধ করেছেন, যারা হাদীসের জ্ঞান অনুসন্ধান করছেন এবং যারা নবুওয়াত সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের জন্যে সময় ব্যয় করছেন, তাদের জন্য হাদীস হলো এক মহাসুসংবাদ এবং তাঁরাই দুনিয়া-আখিরাতে কল্যাণ ও নাজাতপ্রাপ্ত লোক।

أَهْلُ الْحَدِيْثِ هُمْ أَهْلُ النَّبِيِّ وَإِنْ
لَمْ يَصْحَبُوْا نَفْسَهُ أَنْفَاسَهُ صَحِبُوْا

"হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নবী করীম (সাঃ)-এর একান্ত কাছের লোক, যদিও তারা রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত কিন্তু তাঁর পবিত্র নিঃশ্বাস তারা অনুক্ষণ অনুভব করছে।"

যে আয়াতের বরকতে দোয়া কবুল হয়

হযরত ইউনস্ (আঃ) মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার একজন সম্মানিত-মর্যাদাবান নবী ছিলেন। তিনি যখন মাছের পেটে ত্রিবিধ অন্ধকারে জীবনের চরম সঙ্কটে নিপতিত হলেন, তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অহীর মারফতে তাঁকে নিজের ভুল-ত্রুটি সংশোধন এবং এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পাবার লক্ষ্যে ছোট্ট অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দোয়া শিক্ষা দিলেন। হযরত ইউনুস (আঃ) তিন ধরণের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলেন, একদিকে ছিলো রাতের অন্ধকার, তারপর পানির নীচের অন্ধকার এবং মাছের পেটের মধ্যে আরেক অন্ধকার।

উক্ত ছোট্ট দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে সেই মাছের পেটের অন্ধকারের মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। শুধু তাই নয়, আল্লাহ্ তা'য়ালা যে দোয়ার বরকতে তাঁর নবীকে উদ্ধার করলেন, সেই দোয়াটি পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত ও দোয়া হিসেবে পবিত্র কোরআনের একটি অংশ বানিয়ে নবী

করীম (সাঃ)-এর কাছে অবতীর্ণ করলেন। এই আয়াতকে আত্মশুদ্ধি ও গোনাহ্ মাফের আয়াতও বলা হয়। গুরুত্বপূর্ণ, উচ্চ মর্যাদা, বরকত ও ফযিলত সম্পন্ন উক্ত দোয়াটি সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, হযরত ইউনুস (আঃ) যদি উক্ত দোয়াটি না পড়তেন তাহলে তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত সেই মাছের পেটেই থাকতে হতো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ- فَلَوْلاَ اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ- لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ-

"অতপর একটি বড়ো আকারের মাছ এসে তাকে উদরস্থ করলো, এমতাবস্থায় সে মাছের পেটে বসে নিজেকে (নিজের ভুলের কারণে) ধিক্কার দিতে লাগলো। যদি সে তখন আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতা ও মাহাত্ম ঘোষণা না করতো, তাহলে তাকে তার পেটে কিয়ামত পর্যন্ত অতিবাহিত করতে হতো।" (সূরা সাফ্ফাতঃ ১৪২-১৪৪)

এ দোয়াটি সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে একটি উত্তম জিনিসের (দোয়ার) কথা বলবো না, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়াতে নানা ধরণের বিপদ-মুসিবতের কোনো একটির মধ্যে নিমজ্জিত হও, তখন বিপদগ্রস্ত অবস্থায় এই দোয়া করতে থাকো এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত হয়ে যাবে? সাহাবায়ে কেরাম আবেদন করলেন, কেনো বলবেন না, অবশ্যই বলবেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন, সেটা হলো যুন্নুনের (হযরত ইউনুস (আঃ)-এর) দোয়া–

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ق اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ج

লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায্ যা-লেমীন।

"হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র, তুমি মহান, অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারীদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে পড়েছি।" (সূরাতুল আল আম্বিয়া-৮৭)

হযরত ইউনুস (আঃ)-কে পবিত্র কোরআনে যুন্নুন নামে পরিচিত করা হয়েছে। তাঁর প্রকৃত নাম হলো ইউনুস ইবনে মাত্তা। মাছকে 'নুন' বলা হয়। এ কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নামের পূর্বে উক্ত উপাধি যোগ করেছেন। হযরত ইউনুস (আঃ) খৃষ্টপূর্ব ৭৮৪-৮৬০ সানের মাঝামাঝি সময়ের লোক ছিলেন বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়। যদিও তিনি বনী ইসরাঈল বংশেরই নবী ছিলেন কিন্তু তাঁকে পাঠানো হয়েছিল আসিরীয়দের হিদায়েতের জন্য। সে যুগের প্রখ্যাত নগরী 'নিনাওয়া' ছিল তাদের কেন্দ্র। এই নগরীর ব্যাপক ধ্বংসাবশেষ বর্তমান সময় পর্যন্ত

দজলা নদীর পূর্ব তীরে বর্তমানের 'মুসেল' শহরের বিপরীত দিকে বিদ্যমান রয়েছে। এই অঞ্চলে 'ইউনুস নবী' নামে একটি স্থান এখন পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে। এই জাতির লোকেরা যে কত উন্নত ছিল তা বুঝা যায় এভাবে যে, তাদের রাজধানী 'নিনাওয়া' প্রায় ৬০ মাইল এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ছিল। হযরত ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে তাফসীর গ্রন্থসমূহ, নবী-রাসূলদের ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, কোরআনে উল্লেখিত হযরত ইউনুস (আঃ) কর্তৃক পঠিত দোয়া পাঠ করে কোনো মুসলমান নিজের প্রয়োজনের বিষয়ে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তা পূর্ণ করবেন।

عَنْ سَعْدٍ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ ذِيْ النُّوْنِ اِذَا دَعَا وَهُوَ فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ"لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ق اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ " فَاِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ اِلَّا اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ-

"হযরত সা'দী (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যুন্নুন (ইউনুস) এর দোয়া– যা তিনি মাছের পেটের মধ্যে পড়েছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র, তুমি মহান, অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারীদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে পড়েছি।' যে কোনো মুসলমান এই দোয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে যা কিছু প্রার্থনা করবে, তা কবুল করা হবে।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৫০৫, আহ্মাদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭০)

রোগীর সেবাকারীর জন্য ৭০ হাজার ফিরিশ্তার দোয়া

সৃষ্টিগতভাবেই ফিরিশ্তাগণ নিষ্পাপ এবং পাক-পবিত্র। তাঁরা সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্তে মহান আল্লাহর গুণ-কীর্তন ও মহিমা প্রকাশে মগ্ন রয়েছেন। তাঁরা মহান আল্লাহর দরবারে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে অবস্থান করেন। মানুষকে যেমন মাটির সার নির্যাস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনি ফিরিশ্তাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মাটির সার-নির্যাস থেকে সৃষ্ট দুর্বল মানুষের মধ্য থেকে যারা ইসলাম কবুল করে প্রকৃত মুমিন বান্দার অবস্থানে নিজেদেরকে উন্নীত করতে পারেন, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সম্মান-মর্যাদায় ও অবস্থানে তাঁর এত কাছে স্থান করে দেন যে, যা দেখে স্বয়ং নূর থেকে সৃষ্ট ফিরিশ্তাগণও ঈর্ষান্বিত হন।

কতিপয় আমল ও নেকী এমন রয়েছে যারা উক্ত আমল ও নেকীর কাজ করেন তাদের উচ্চ মর্যাদা, সম্মান, ক্ষমা ও মাগফিরাতের জন্যে স্বয়ং ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন। এসব নেক কাজের মধ্যে একটি হলো রোগীর সেবা-যত্ন করা। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَامِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غَدْوَةً اِلاَّ صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِىَ، وَاِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً اِلاَّصَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ–

"কোনো মুসলমান যদি সকালে আরেক মুসলমানের সেবাযত্ন করে তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ সেবা প্রদানকারী মুসলমানের জন্যে ৭০ হাজার ফিরিশ্‌তা দোয়া করতে থাকে। অনুরূপভাবে সন্ধ্যায় কোনো মুসলমানের সেবাযত্ন করলে সকাল পর্যন্ত সেবাকারী মুসলমানের জন্যে ৭০ হাজার ফিরিশ্‌তা দোয়া করতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি রোগগ্রস্ত লোকের কাছে বসে থাকে ততক্ষণ যেনো সে জান্নাতের বাগানে বসে থাকে।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ৯৬৯, আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩০৯৯, ইবনে মাজাহ্‌, হাদীস নং- ১৪৪২, মুসনাদে আহ্‌মাদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৯৭)

বিপদ-মুসিবত ও দুঃখ-দুর্দশা দূর করার দোয়া

আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দোয়া হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ দোয়াটি পাঠ করলে দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা, হয়রানি-পেরেশানী, দুঃখ-যন্ত্রণা, দুর্দশা, বিপদ-আপদ ও যে কোনো ধরণের কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ أَصَابَهُ هَمٌّ اَوْ غَمٌّ أَوْ سُقْمٌ أَوْ شِدَّةٌ فَقَالَ "اَللّٰهُ رَبِّىْ لاَ شَرِيْكَ لَهُ" كُشِفَ ذَالِكَ عَنْهُ–

"যে ব্যক্তি কোনো ধরণের দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা, দুঃখ-যন্ত্রণা ও কঠিন সমস্যায় নিপতিত হবে এবং রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে, আর সে যদি এই দোয়া পাঠ করে, 'আল্লাহই আমার রব, তাঁর কোনো অংশীদার নেই'। তাহলে সেই ব্যক্তির সকল দুঃখ-দুর্দশা, দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, রোগ ও কঠিন সমস্যা দূর করে দেয়া হবে।" (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং- ৩৪২১)

পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থে দোয়াটি বাংলা উচ্চারণসহ এখানে উল্লেখ করা হলো।

اَللّٰهُ رَبِّىْ لاَ شَرِيْكَ لَهُ–

'আল্লাহু রাব্বি লা শারিকা লাহু' অর্থাৎ 'আল্লাহ্ই আমার রব, তাঁর কোনো অংশীদার নেই'। আরেক বর্ণনায় দোয়াটি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

اَللّٰهُ رَبِّىْ لاَ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْـاً–

'আল্লাহু রাব্বি লা উশরিকু বিহী শাইয়া' এই দুটো দোয়া দুই ভাবেই পড়া যেতে পারে। এই দোয়ার অর্থের প্রতি দৃষ্টি দিলে এটা উপলব্ধি করা যায় যে, কোনো মুসলমান যদি শির্ক না করে, শির্ক থেকে তাওবা করে এবং শির্ক না করার ওয়াদা করে এবং তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সৎকাজ করতে থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দোয়া পাঠকারীর সকল পেরেশানী দূর করে দিবেন।

দান-সাদকা করার ফযিলত

পবিত্র কোরআনে নামাজ আদায়ের নির্দেশের পাশাপাশি যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ নামাজ আদায় করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তেমনি দান-সাদকা করাও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই দান-সাদকার কাজটি শুধু মাত্র অর্থ-সম্পদ দিয়েই হয় না, কাউকে সুপরামর্শ দেয়া, শারীরিক শ্রম দিয়ে কারো উপকার করা, কারো বিপদে উপস্থিত হয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করা, মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, অন্যের সাথে হাসি মুখে কথা বলা ইত্যাদিও দান-সাদকার মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। আর্থিক স্বচ্ছলতা যার রয়েছে তিনিও যেমন দান করবেন, যার নেই তিনিও তার সাধ্যানুসারে দান-সাদকা করবেন। সম্পদহীন আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল লোকদের ওপর দান-সাদকা করার জন্যে নির্দিষ্ট কোনো অঙ্ক ধার্য্য করা হয়নি।

সাবাহায়ে কেরামের রীতি ছিলো, তাঁরা মহান আল্লাহর কাছে কোনো দোয়া করার পূর্বে সামর্থ অনুসারে অবশ্যই দান-সাদকা করতেন। এমনকি নবী করীম (সাঃ)-এর সম্মুখে যাবার পূর্বেও তাঁরা দান-সাদকা করতেন। হযরত ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ)-এর রীতি ছিলো, তিনি জুমুআ'র দিনে মসজিদে যাবার সময় ঘরে যা পেতেনে, নগদ অর্থ, খাদ্য বা অন্য কিছু সাথে নিতেন। পথে এগুলো দান করে দিতেন এবং সাথিদেরকে বলতেন, আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, "তোমরা আমার নবী (সাঃ)-এর কাছে কোনো আবেদন করার পূর্বে দান-সাদকা করবে।" (সূরা মুজাদিলা-১২)

সুতরাং যার যা কিছু সামর্থ আছে, তাই আল্লাহ্র রাস্তায় দান-সাদকা করতে হবে। দান-সাদকার মর্যাদা ও ফযিলত এত বেশী যে, তা কোনো মানুষের পক্ষে কল্পনাও করা সম্ভব নয়। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, দান-সাদকা করলে বিপদ-মুসিবত দূর হয়। কিয়ামতের ময়দানে প্রখর সূর্য কিরণে মানুষের মাথার মগজ গলে গলে নাক কান দিয়ে গড়িয়ে পড়বে। একমাত্র মহান আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত সেদিন কোনো ছায়া থাকবে না। সেদিন দান-সাদকার কারণে আল্লাহ্ তা'য়ালা খুশী হয়ে সেই বান্দাকে ছায়া দান করবেন।

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত আবুল খায়ের (রাহঃ) সম্পর্কে একজন তাবেঈ বলেছেন, আমি আবুল খায়েরকে দেখতাম তিনি দান-সাদকা করার জন্যে পকেটে কিছু না কিছু রাখতেন। নগদ অর্থ, খাদ্য দ্রব্য বা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস তাঁর পকেটে থাকতো। তিনি যখন মসজিদে আসতেন তখন পথে অভাবী লোকদের দান করতেন। একদিন দেখলাম তাঁর পকেটে পিঁয়াজ। আমি বললাম, হে আবুল খায়ের! এ পিঁয়াজের কারণে তো আপনার পরণের পোশাক থেকে গন্ধ বের হবে! তিনি বললেন, হে আবু হাবীবের সন্তান! আমার ঘরে আজ পিঁয়াজ ব্যতীত দান করার মতো আর কিছুই ছিলো না। আমি অবশ্যই একজন সাহাবার মুখে রাসূল (সাঃ)-এর সেই কথা শুনেছি তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন মুমিনগণ তাদের দান-সাদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে। (ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং-২৪৩২)

দান-সাদকার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ– لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ–

"যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, আমি তাদের যে রিয্ক দান করেছি তা থেকে যারা আমারই উদ্দেশ্যে গোপনে বা প্রকাশ্যে দান করে, মূলত তারা এমন এক ব্যবসায় নিয়োজিত আছে যা কখনো তাদের জন্যে ক্ষতি বয়ে আনবে না। কারণ আল্লাহ্ তাদের কাজের সম্পূর্ণ বিনিময় দান করবেন, নিজ অনুগ্রহে তিনি তাদের পাওনা আরো বৃদ্ধি করে দিবেন, অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল-গুণগ্রাহী।" (সূরা ফাতিরঃ ২৯-৩০)

যা দান করা হবে আল্লাহ শুধু তারই বিনিময় দিবেন না, যা দান করা হলো তিনি তার অসংখ্য গুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। মানুষ বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখতে পায় যে, দান করলে সম্পদ কমে যায়। আর আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন, দান করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়, এই দান করতে হবে গোপনে বা প্রকাশ্যে। দানের মাধ্যমে সম্পদ যেমন পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র হয়, তেমনি মানুষের হৃদয়-মনও পরিচ্ছন্ন হয়। কৃপণতার মতো ঘৃণ্য স্বভাব, যা মানুষকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়, সেই স্বভাব দানের মাধ্যমে দূর হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, কে কত পরিমাণ দান করলো আল্লাহ তা'য়ালা সে পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না, তিনি দৃষ্টি দিবেন দানকারীর নিয়তের প্রতি। দানের নিয়ত হতে হবে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, আর প্রকাশ্যে দান করলে যদি হৃদয়ে প্রদর্শনীর মনোভাব বা অহঙ্কারের মনোভাব সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে গোপনে দান করাই উত্তম।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, মানুষের জীবনে প্রত্যেক দিনই দুইজন ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হন। একজন দোয়া করতে থাকেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার পথে ব্যয় করে তার জন্য উত্তম বিনিময় দাও। আরেকজন দোয়া করতে থাকেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি দান করা থেকে বিরত থাকে তার সম্পদ ধ্বংস করে দাও। (বোখারী, মুসলিম)

দান-সাদকাহ্ জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে

নেকীর কাজ বাহ্যিক দিক থেকে ছোট হলেও তা যদি একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করা হয়, তা মহান আল্লাহর কাছে অনেক বড় নেককাজের ওপরও প্রাধান্য বিস্তার করে। এমনকি নেকীর কাজ বাস্তবায়িত করা দূরে থাক, মনে মনে নেককাজ করার সংকল্প করলও আমলনামায় একটি নেকী লেখা হয়ে থাকে। (মুসলিম)

সাদকা করা অত্যন্ত ফযিলতের কাজ এবং মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে সাদকার অত্যধিক প্রশংসা করেছেন। এমনকি যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সাদকা করে সে যেনো আল্লাহকে 'করযে হাসানা বা উত্তম ঋণ' দেয়। সাদকা বিপদ-আপদ ও রোগ দূর করে। এ জন্যে হাদীসে বলা হয়েছে–

دَاوُوْا اَمْرَاضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ–

"নিজের রোগ এবং রোগের চিকিৎসা সাদকা দিয়ে করো।" (আবু দাউদ, হাদীস নং- ১০৫)

সাদকা গোনাহ্ মুছে দেয়, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِىءُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِىءُ الْمَاءُ النَّارَ–

"সাদকা গোনাহকে এমনভাবে শীতল করে দেয় যেমন পানি আগুনকে ঠান্ডা করে দেয়।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ২৬১৬)

সাদকা মহান আল্লাহর ক্রোধ ও গযবকে ঠান্ডা করে দেয় এবং অকল্যাণ থেকে সাদকা মানুষকে হেফাজত করে। অর্থাৎ ঈমান, একনিষ্ঠতা ও সৎকাজের সাথে সাথে সাদকা প্রদানকারী মুমিন নরনারীর জন্যে এই মহাসুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, পৃথিবী থেকে বিদায়ের সময় আল্লাহ তা'য়ালা তাকে যাবতীয় অকল্যাণ থেকে হেফাজত করবেন এবং ঈমানের সাথে তাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِىءُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوْءِ–

"নিশ্চয়ই সাদকা রাব্বুল আলামীনের ক্রোধ ও গযবকে শীতল করে এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে হেফাজত করে।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ৬৬৪)

কিয়ামতের ময়দানে একটি দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দৈর্ঘ এবং সেদিন একমাত্র মহান আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। সেই মুসিবতের দিনে এই সাদকাই প্রশান্তি ও ছায়ার কারণ হয়ে দেখা দিবে। সকল হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত একটি হাদীসে সাত ধরণের লোকদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যাদেরকে আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজের আরশের ছায়াতলে আশ্রয় প্রদান করবেন। উক্ত সাত ধরণের লোকদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হলো, যারা এমন নিরবে-নিভৃতে দান-সাদকা করতো যে, তাদের আরেক হাতও তা জানতে পারতো না। এক হাদীসে সাদকা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

ظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ–

"সাদকা মুমিনদের ছায়া স্বরূপ হবে।" (ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং- ২৪৩২)

দান-সাদকার মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটে এবং আত্মা পবিত্রতা অর্জন করে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

خُذْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا–

"তুমি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ করো, সাদকা তাদের পাক-পবিত্র করে দিবে, তা দিয়ে তাদের পরিশোধিত করে দিবে।" (সূরা তাওবা-১০৩)

সাদকার বিনিময় কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَاَقْرَضُوْا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ–

"যেসব পুরুষ ও নারী অকাতরে আল্লাহর পথে দান করে এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করে, তাদের সে ঋণ আল্লাহর পক্ষ থেকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে, উপরন্তু তাদের জন্যে থাকবে আরো সম্মানজনক পুরস্কার।" (সূরা হাদীদঃ ১৮)

সাদকা শয়তানের ধোকা-প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لَايُخْرِجُ أَحَدٌ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ حَتّٰى يُفَكَّ عَنْهَا لَحْيَىْ سَبْعِيْنَ شَيْطَانًا–

"কোনো মানুষ যখন সাদকা দেয়ার জন্যে বের হয় তখন শয়তানের সত্তর প্রকার চক্রান্ত থেকে তাকে হেফাজত করা হয়।" (আহ্মাদ, ৫ম খন্ড, হাদীস নং- ৩৫০)

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, সাদকা কঠিন হৃদয়ের মহৌষধ হিসেবে কাজ করে। (তিরমিযী, হাদীস নং- ৬৬৪)

অন্য আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, দান-সাদকার মাধ্যমে ধন-সম্পদ হ্রাস পাবার পরিবর্তে আরো বৃদ্ধি পায়। (মুসলিম, হাদীস নং- ২৫৮৮)

দান-সাদকা করার জন্যে এটা প্রয়োজনীয় নয় যে, অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী হতে হবে। বরং মহান আল্লাহ তা'য়ালা যাকে যে পরিমাণ শক্তি-সামর্থ ও ধন-সম্পদ দান করেছেন, তার মধ্যে থেকেই একমাত্র মহান মালিকের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দান-সাদকার এই মহান কাজ করে যেতে হবে। সামান্য একটি খেজুর সাদকা করেও মানুষ নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাজত করতে পারে। ক্ষুদ্র একটি খেজুর সাদকা করলেও তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান-মর্যাদার দৃষ্টিতে গ্রহণ করা গ্রহণ করা হয়। এ জন্যে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ–

"তোমরা অর্ধেক খেজুর সাদকা করেও নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারো।" (বোখারী, হাদীস নং- ৬৫৩৯, মুসলিম, হাদীস নং- ১০১৬)

চতুর্থ অধ্যায়

শত্রু ও হিংসুকের ওপর বিজয়ী হবার আমল

ইমাম বাগাভী (রাহঃ) একজন বিখ্যাত মুফাস্সীর ছিলেন এবং তাঁর তাফসীর প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থসমূহের অন্যতম। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) তাফসীরে বাগাভী সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, এই তাফসীর শ্রেষ্ঠ তাফসীরসমূহের মধ্যে একটি। ইমাম বাগাভী (রাহঃ) তাঁর তাফসীরে সূরা আলে ইমরানের ২৬ নং আয়াতের তাফসীরে হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি উক্তি উল্লেখ করে লিখেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী ও সূরা আলে ইমরানের ১৮ থেকে ১৯ নং আয়াত পড়ার পর ২৬ নং আয়াত পড়বে, এসব আয়াত মহান আল্লাহর আরশের কাছে পৌঁছে যাবে।

এ সময় মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলতে থাকেন, আমার যে বান্দাহ্ এই আয়াতগুলো ফরজ নামাজের পরে পড়বে তার জন্যে আমার পক্ষ থেকে ছয় স্তরের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে ঃ-

১। আমি ঐ বান্দার শেষ ঠিকানা জান্নাতে নির্ধারণ করবো

২। আমার সান্নিধ্য দান করে উচ্চ মর্যাদা দান করবো

৩। তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবো

৪। প্রতিদিন তার ৭০টি প্রয়োজন পূরণ করবো, এর মধ্যে সাধারণ প্রয়োজন হলো তাকে মাগফিরাত দান করবো

৫। প্রত্যেক শত্রুর শত্রুতা ও হিংসুকের হিংসা থেকে হেফাজত করবো

৬। শত্রু ও হিংসুকদের মোকাবেলায় তাকে বিজয়ী করবো। (তাফসীরে বাগাভী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২৯১)

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ- اٰمِيْنْ

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لاَتَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ- لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ -مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ -وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلاَّ بِمَا شَاءَ -وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ -وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا -وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ-

"মহান আল্লাহ, তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি অনাদী সত্তা, ঘুম (তো দূরের কথা সামান্য) তন্দ্রাও তাঁকে আচ্ছন্ন করে না, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুরই একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর। কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে বিনা অনুমতিতে কিছু সুপারিশ পেশ করবে? তাদের বর্তমান ভবিষ্যতের সব কিছুই তিনি জানেন, তার জানা বিষয়সমূহের কোনো কিছুই (তাঁর সৃষ্টির) কারো জ্ঞানের সীমা পরিসীমার আয়ত্বাধীন হতে পারে না, তবে কিছু জ্ঞান যদি) তিনি কাউকে দান করে থাকেন (তবে তা ভিন্ন কথা,) তার বিশাল ক্ষমতা আসমান যমীনের সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছে। এ উভয়টির হেফাযত করার কাজ কখনো তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না, তিনি পরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদাবান।" (সূরা বাকারা-২৫৫)

সূরা আলে ইমরানের ১৮ ও ১৯ নং আয়াত

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لاَاِلٰهَ اِلاَّهُوَ- وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًام بِالْقِسْطِ- لاَاِلٰهَ اِلاَّهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ- اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلاَمُ- وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلاَّ مِنْ م بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًام بَيْنَهُمْ- وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ-

"আল্লাহ (স্বয়ং) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই, ফিরিশ্তাগণ এবং জ্ঞানবান মানুষরাও (এই একই সাক্ষ্য দিচ্ছে) আল্লাহ্ই একমাত্র ন্যায় ও ইনসাফ কার্যকর করেন, তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়। নিঃসন্দেহে (মানুষের) জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহ্র কাছে ইসলামই একমাত্র (গ্রহণযোগ্য) ব্যবস্থা। যাদের আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তারা (এ জীবন বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে) নিজেরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে (বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে) মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো, (তাও আবার) তাদের কাছে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) সঠিক জ্ঞান আসার পর, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধান অস্বীকার করবে (তার জানা উচিত), অবশ্যই আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"

সূরা আলে ইমরানের ২৬ নং আয়াত

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ- وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ- بِيَدِكَ الْخَيْرُ- اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

"(হে নবী) তুমি বলো, হে রাজাধিরাজ! (মহান আল্লাহ) তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে সাম্রাজ্য দান করো, আবার যার কাছ থেকে চাও তা কেড়েও নাও, যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মানিত করো, যাকে ইচ্ছা তুমি অপমানিত করো, সব ধরণের কল্যাণ তো তোমার হাতেই নিবদ্ধ, নিশ্চয়ই তুমি সবকিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।"

অস্থিরতা দূরীকরণ ও গোনাহ্ মাফের আমল

প্রত্যেক উম্মতের প্রতিই নবী করীম (সাঃ)-এর সীমাহীন অধিকার রয়েছে। এর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো তাঁর আনুগত্য করা এবং প্রত্যেকটি সুন্নাতকে বাস্তবায়ন করা। রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য করার অর্থ হলো, তাঁর প্রতি হৃদয়ে ভালোবাসা পোষণ করা। আন্তরিকতা ও ভালোবাসাহীন আনুগত্য 'নিঃসঙ্গ বিপদজনক' অবস্থার প্রমাণ। নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলমানকেই অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হবে এবং এর মধ্যে কেবলমাত্র তাঁরই আনুগত্য নিহিত থাকবে।

উম্মতের প্রতি নবী করীম (সাঃ)-এর অধিকারসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো, তাঁর প্রতি সর্বাধিক দরুদ পড়া। দরুদের ফযিলত ও উচ্চমর্যাদা

সম্পর্কে এ কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীবের প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করেন এবং ঈমানদারদের প্রতি তিনি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন–

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশ্তারা নবীর ওপর দরুদ পাঠান, অতএব হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরাও নবীর ওপর দরুদ পাঠাতে থাকো এবং তাঁকে উত্তম অভিবাদন পেশ করো।" (সূরা আহ্যাব-৫৬)

দরুদ পাঠের মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতে অগণন কল্যাণ রয়েছে। এর মধ্যে এটা এক উচ্চ পর্যায়ের কল্যাণ রয়েছে যে, অধিক দরুদ পাঠ করার কারণে গোনাহ্ ক্ষমা করা হয় এবং যাবতীয় দুঃখ, দুর্দশা এবং সকল প্রকার মানসিক দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায় এবং গোনাহ্সমূহ মুছে দেয়া হয়। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّٰهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ قَالَ أُبَيٌّ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِيْ فَقَالَ مَاشِئْتَ قَالَ قُلْتُ اَلرُّبُعَ قَالَ مَاشِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ اَلنِّصْفُ، قَالَ مَاشِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَاشِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ اَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِيْ كُلَّهَا قَالَ اِذًا تُكْفِى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ-

"হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) রাতের তৃতীয় প্রহরে বাইরে এসে বলতেন, 'হে লোকজন! এক মহা ভূকম্পন আসবে, মহান আল্লাহকে স্মরণ করো। এরপরে পুনরায় আরেকটি ভূকম্পন আসবে। মৃত্যু তার কঠোরতা নিয়ে

পৌছেছে।' হযরত উবাই (রাঃ) বলেন, আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি আপনার প্রতি সর্বাধিক দরুদ ও সালাম প্রেরণ করে থাকি, 'আপনি বলে দিন আমি এ কাজের জন্যে কতটা সময় নির্ধারণ করবো?' নবী (সাঃ) বললেন, 'যতটা সময় চাও নির্ধারণ করো।' আমি আবেদন করলাম, 'অন্যান্য সকল ইবাদাতের তুলনায় এক চতুর্থাংশ সময় নির্ধারণ করবো?' তিনি বললেন, 'যতটা সময় পারো নির্ধারণ করো কিন্তু এর থেকে অধিক সময় যদি নির্ধারণ করো তাহলে উত্তম হয়।'

আমি আবেদন করলাম, 'তাহলে অর্ধেক সময় নির্ধারণ করবো?' তিনি বললেন, 'যতটা চাও কিন্তু এর থেকেও অধিক হলে ভালো হতো।' আমি পুনরায় বললাম, 'তাহলে আমি আমার ঐচ্ছিক ইবাদাতের (নফলসমূহ) জন্য নির্ধারিত সবটুকু সময় আপনার প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণের কাজে ব্যয় করবো।' নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'যদি তুমি এমন করো তাহলে তোমার সকল পেরেশানী দূর করে দেয়া হবে এবং তোমার সকল গোনাহ্ও ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ২৪৫৭)

এই হাদীসে সকল মুসলমানের জন্যে এক মহা সুসংবাদ নিহিত রয়েছে। আকারে খুবই ছোট এবং সহজ দরুদ পাঠকারীর জন্যে নেকী রয়েছে, যা পাঠ করতে মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র ব্যয় হয়। কিন্তু এর মধ্যে অগণিত সওয়াব রয়েছে, যদি কেউ আকারে ছোট দরুদ, 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অথবা আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম' পড়ে অথবা আরেকটি ছোট দরুদ–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ–

আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আ'লা আ-লিহী ওয়া আস্হাবিহী পড়ে তাহলে এটাই যথেষ্ট।

আকারে ছোট এসব দরুদ পাঠকারীর জন্যে যে বিরাট সুসংবাদ রয়েছে তাহলো, পাঠকারীর সকল পেরেশানী, যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-মুসিবত দূর করে দেয়া হয় এমনকি তার গোনাহ্ও ক্ষমা করে দেয়া হয়।

উল্লেখিত হাদীসে এক গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রাতের শেষ প্রহরে নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক সাহাবায়ে কেরামের কাছে এসে উপদেশ দেয়ার বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটা আমাদের সকলের জন্যেই উত্তম আদর্শ, উক্ত বরকতময় সময়ে আমরা আমাদের পরিচিতজন, নিজের পরিবার-পরিজন, ঘনিষ্ঠজন ও কাছের লোকসহ অন্যান্যদের উপদেশ দিতে পারি।

উল্লেখিত হাদীসে এ শিক্ষাও রয়েছে যে, উক্ত বরকতময় সময়ে আমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিক্র করতে পারি এবং মহান আল্লাহ্র বরকতময় যিক্রের সাথে সাথে কিয়ামতের কথা স্মরণ করতে পারি। মৃত্যুর কঠোরতা ও কিয়ামতের কথা স্মরণ এবং হযরত উবাই (রাঃ)-এর দরুদ পড়া সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলছিলেন, মৃত্যু যন্ত্রণার সময় যে জিনিস উপকারে আসবে তাহলো অধিক পরিমাণে দরুদ ও সালাম প্রেরণ করা। নবী করীম (সাঃ) তিনবার বলেছেন, 'যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে এর থেকেও বেশী দরুদ পড়া তোমার জন্যে সর্বোত্তম হবে।' রাসূল (সাঃ)-এর এই পবিত্র বাক্যেই আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, নফল ইবাদাতসমূহের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো অধিক পরিমাণে দরুদ পড়া– যে ব্যাপারে স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) বলেছেন।

দরুদ পাঠ করাই রহমত ও শাফায়াত লাভের ভিত্তি। এ জন্যে আমাদেরকে অধিক পরিমাণে দরুদ ও সালাম প্রেরণ করতে হবে। দরুদ শরীফ যেনো আমাদের জীবন চলার কঠিন পথে উপকারী ও দুঃখ-যন্ত্রণা হরণকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়।

৯৯টি রোগের নিরাময় ও দুশ্চিন্তা দূর করার আমল

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ–

লা হাওলা ওয়া লা কুউ-ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।

অল্প সময়ে পড়ার মতো একান্তই সহজ এই কালামটিকে 'হাওকালাহ্' বলা হয়। এই কালামটির মূল কথা হলো, যে কোনো ধরণের শক্তি-সামর্থ, ক্ষমতা, হিম্মৎ, উৎসাহ-উদ্দীপনা, সৃজনশীলতা, প্রতিভা, যোগ্যতা, সাহায্য-সহযোগিতা সকল কিছুই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই লাভ করা যায়। একমাত্র তিনিই এসব দেয়ার মালিক, অন্য কারো পক্ষে এসব কিছু দান করা সম্ভব নয়।

এই ছোট্ট বাক্যটি উচ্চারণ করতে মাত্র চার পাঁচ সেকেন্ড সময় এবং এ বাক্যটি ১০০ বার পড়তে মাত্র কয়েক মিনিট সময় ব্যয় হতে পারে। হাদীস শরীফে 'হাওকালাহ্' বা এই কালামটিকে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার আরশে আযীমের 'খাজানা বা ট্রেজারী' বলা হয়েছে। কোনো হাদীসে একে জান্নাতের 'দরজা' বলা হয়েছে। (বোখারী, হাদীস নং- ৬৩৮৪, মুসলিম, হাদীস নং- ২৭০৪)

আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

مَنْ قَالَ "لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا

اِلَيْهِ" كَشَفَ عَنْهُ سَبْعِيْنَ بَابًامِنَ الضَّرِّ أَدْنَا هُنَّ الْفَقْرُ،

"যে ব্যক্তি 'লা হাওলা ওয়া লা কুউ-ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি ওয়া লা মালজাআ মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি' অর্থাৎ যাবতীয় শক্তি-ক্ষমতা, সামর্থ-যোগ্যতা একমাত্র মহান আল্লাহরই জন্যে এবং তাঁর কাছে ব্যতীত অন্য কোথাও আশ্রয় গ্রহণের জায়গা নেই' পড়বে সেই ব্যক্তির ৭০ প্রকার পেরেশানী দূর করে দেয়া হবে, যার মধ্যে সব থেকে ছোট্ট পেরেশানী হলো দরিদ্রতা ও অসহায়ত্ব।"

এই হাদীস আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে, কিছু সময় ব্যয় করে এই ছোট্ট কালামটি একবার পড়লে ৭০ প্রকার অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে এবং এই ৭০ ধরণের অস্থিরতার মধ্যে সবথেকে ছোট্ট দিকটি হলো, রিয্‌ক বা ধন-সম্পদের জন্যে মানুষ যে ধরণের দুঃখ-যন্ত্রণা ও অস্থিরতা অনুভব করে থাকে। আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

مَنْ قَالَ "لاَحَوْلَ وَ لاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ" كَانَ دَوَاءً مِنْ تِسْعَةٍ وَّتِسْعِيْنَ دَاءً أَيْسَرُ هَا الْهَمُّ–

"যে ব্যক্তি লা হাওলা ওয়া লা কুউ-ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি পড়বে, তার ৯৯টি রোগ ও অস্থিরতার অবসান ঘটবে। এর মধ্যে সবথেকে ছোট্ট রোগ বা অস্থিরতা হলো দুঃখ-যন্ত্রণাবোধ।" (মাজমাউ'য যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৮, তারগীব, হাদীস নং- ২৩৪৬, হাকেম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৪২)

এক কথায় যে কোনো ধরণের দুঃখ-যন্ত্রণা, রোগ-শোক, ব্যধি, বিপদ-মুসিবতসহ সকল কিছুর প্রতিষেধক রয়েছে এই 'হাওকালাহ্'- এর মধ্যে। প্রয়োজন শুধু মহান আল্লাহ্র রহমতের প্রতি গভীর আস্থাশীল হয়ে একনিষ্ঠভাবে উক্ত কালামটি বিনয়ের সাথে পড়া।

দুষ্ট জ্বীন ও শয়তানের কুদৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকার আমল

পবিত্র কোরআন-হাদীসে শয়তানকে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং জ্বীনদের মধ্যে যারা দুষ্কৃত প্রকৃতির, তাদেরকেও মানুষের দুশমন হিসেবে সূরাতুল কাহ্ফ এর ৫০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। শয়তান এবং জ্বীনকে এই ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, তারা মানুষকে যে কোনো অবস্থায় এবং যে কোনো সময়ে দেখতে পায় কিন্তু আমরা তাদেরকে দেখতে পাই না। এ বিষয়টি সূরাতুল আ'রাফ এর ২৭ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে টয়লেটে প্রবেশের সময়, পোশাক পরিবর্তনের সময় এবং যে কোনো বৈধ প্রয়োজনে পরিধেয় বস্ত্র খোলা বা সরানোর সময় শয়তান ও দুষ্ট প্রকৃতির জ্বীন কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে।

শয়তান ও দুষ্ট প্রকৃতির জ্বীনের কুদৃষ্টির ক্ষতি থেকে মুসলমানদেরকে হেফাজত করার জন্যে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে তাঁর প্রিয় হাবীব (সাঃ)-এর মাধ্যমে এক 'পরশ মণি' দান করেছেন। সে 'পরশ মণি' হলো 'বিসমিল্লাহ্' এবং এ ব্যাপারে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

سَتَرَ مَابَيْنَ اَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِىْ اٰدَمَ اِذَا وَضَعَ اَحَدُهُمْ ثَوْبَهُ (اَوْ اِذَا دَخَلَ اَحَدَهُمُ الْخَلَاءَ) اَنْ يَّقُوْلَ: بِسْمِ اللّٰهِ–

"যখন কারো পরিধেয় বস্ত্র খোলার প্রয়োজন হয়, টয়লেটে যাবার প্রয়োজন হয় তখন যেনো সে শয়তান প্রকৃতির জ্বীনের কুদৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকার জন্যে 'বিসমিল্লাহ' উচ্চারণ করে।" (সহীহ আল জামে হাদীস নং- ৩৬১০)

কল্যাণ, বরকত লাভ ও রিয্ক বৃদ্ধির আমল

পৃথিবীতে মানব জীবন স্বাভাবিকভাবেই অধিক ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। শত ব্যবস্তার মধ্যেও আপন স্রষ্টা মহান আল্লাহর হক আদায় তথা তাঁর ইবাদাতের জন্য সময় নির্ধারণ করতে হবে এবং এর মধ্যেই বিরাট কল্যাণ রয়েছে। যারা মহান আল্লাহর ইবাদাত করার জন্যে সময় নির্ধারণ করে, এমন লোকদের রিয্ক প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং তার জীবন থেকে দারিদ্রতা দূর করে দেয়া হয়। এ সম্পর্কে হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَا ابْنَ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ اَمْلَاُ قَلْبَكَ غِنًى وَاَمْلَاُ يَدَيْكَ رِزْقًا يَا ابْنَ اٰدَمَ لَا تُبَاعِدْ اَمْلَاُ قَلْبَكَ فَقْرًا وَاَمْلَاُ يَدَيْكَ شُغْلًا–

"হে আদম সন্তান! আমার ইবাদাতের জন্যে তুমি নিজেই (দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে) অবসর নাও। তাহলে আমি তোমার হৃদয়কে ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ করে দিবো এবং তোমার হাত দুটো ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ করে দিবো। হে আদম সন্তান! আমার থেকে এবং আমার ইবাদাত থেকে দূরে থেকো না। যদি এমন করো তাহলে আমি তোমার

হৃদয়কে অভাব-অনটন তথা অতৃপ্তিতে ভরে দিবো এবং তোমার হাতকে ব্যস্ততার মধ্যে নিক্ষেপ করবো।" ((মুস্তাদরাকে হাকেম, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২৬)

আরেকটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'য়ালা এ সম্পর্কে বলেন–

يَا ابْنَ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ أَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنًى وَاَسُدُّ فَقْرَكَ وَاِلاَّ تَفْعَلْ مَلَاْتُ صَدْرَكَ شُغْلاً وَلَمْ اَسُدُّ فَقْرَكَ–

"হে আদম সন্তান! তুমি নিজেই আমার ইবাদাতের জন্যে একটু সময় বের করো। আমি তোমার বক্ষদেশ ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ করে দিবো এবং তোমার দারিদ্রতা দূর করে দিবো। তুমি যদি এমন না করো তাহলে তোমার বক্ষদেশকে ব্যস্ততার মধ্যে নিমজ্জিত করে দিবো এবং তোমার দারিদ্রতা দূর করবো না।" (তিরমিযী, হাদীস নং-২৪৬৬, ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং-৪১০৭)

উল্লেখিত হাদীসে হাত এবং বক্ষদেশকে ব্যস্ততায় নিমজ্জিত করার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো, হাত দুটো ধন-সম্পদ অর্জনের নেশায় রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা ব্যস্ত থাকবে এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতা থাকার পরও আত্মার দিক থেকে দারিদ্রতা দূর হবে না ও আত্মা কখনো তৃপ্ত হবে না। অঢেল ধন-সম্পদ উপার্জন করার পরও তাতে কোনো বরকত পাবে না। মানসিক প্রশান্তি, তৃপ্তিবোধ ও স্বস্তির স্থলে সবসময় অসহনীয় এক অস্থির অবস্থা বিরাজ করবে।

ধন-সম্পদ রক্ষা ও রোগমুক্তির আমল

যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ আমল সম্পর্কিত বর্ণনা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, তা সবই হাদীস গ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে। এসব শ্রেষ্ঠ আমলের মধ্যে যাকাতের পরেই দান-সাদকার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত এবং দান-সাদকার বিষয়টি বাহ্যিক দৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও হাদীসে এর অগণিত কল্যাণ ও বরকতের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যাকাত দিলে সম্পদ সুরক্ষিত হয় এবং দান-সাদকা করলে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তাঁর নির্দেশের একটি অংশ এমন যে, দোয়া করার সময় কাকুতি-মিনতি এবং কান্নাকাটি আকস্মিক দুর্ঘটনা ও যে কোনো ধরনের বিপদ-মুসিবতের স্রোতও বন্ধ করে এর গতি ফিরিয়ে দেয়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

حَصِّنُوْا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَا

سْتَقْبِلُوْا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ–

"যাকাত দান করে নিজের সম্পদকে সুরক্ষিত করো, দান-সাদকা করে নিজের রোগের চিকিৎসা করো, আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করো এবং তাঁর কাছে দোয়া করে বিপদ-মুসিবতের গতি ঘুরিয়ে দাও।" (ফায়যুল কাদির, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৩৩৮, শুআ'বুল ঈমান, হাদীস নং- ৩৫৫৭)

আমাদেরকে এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, যাকাত আদায় করা, দান-সাদকা দেয়া এবং মহান আল্লাহ্র কাছে দোয়া করার মাধ্যমে অপরিসীম কল্যাণ ও বরকত লাভ হয়। ঐ সকল বরকতময় কর্মকে আমাদের জীবনের দৈনন্দিন কর্মে পরিণত করতে হবে এবং আমাদের সমগ্র ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণাকে ঐ মহান সত্তার প্রতি নিবেদিত করে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী হতে হবে।

অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকার আমল

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরেই ভালো-মন্দ বিবেচনাবোধ ও পার্থক্য করার যোগ্যতা দান করেছেন। প্রত্যেক মানুষই জানে যে, কোন্টি কল্যাণ- অকল্যাণ, কোনটি সত্য-মিথ্যা ও কোনটি মূল্যহীন বাতিল এবং কোন্টি নেকী ও গোনাহ্। পৃথিবীতে সকল মানুষকেই এই ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, সে ইচ্ছে করলে হেদায়াতের পথ অনুসরণ করে মহান আল্লাহ্র অনুগত বান্দা হিসেবে নেকী অর্জন করতে পারে, আবার ভ্রান্ত ও বিদ্রোহের পথে চলে গোনাহের জীবন-যাপনও করতে পারে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ–

"হে নবী, তুমি বলো এ সত্য জীবন ব্যবস্থা তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে এসেছে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে এর ওপর ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা সে তা অস্বীকার করুক।" (সূরা কাহ্ফ-২৯)

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا–

"আমি তাকে চলার পথ দেখিয়ে দিয়েছি, সে চাইলে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ হবে, না হয় কাফির হয়ে যাবে।" (সূরা দাহ্র-৩)

ঈমান, একনিষ্ঠতা, আত্মসমালোচনা এবং আনুগত্যের সাথে যে নেকীর কাজ করা হয়, শুধু মাত্র তাই-ই কবুল করা হয়। মানুষ স্বয়ং নিজেকে কল্যাণের ভান্ডার বা উৎসে পরিণত করতে পারে আবার নিজেকে অকল্যাণ ও অশুভের কারণও বানাতে পারে। সৌভাগ্য ও জ্ঞানবান ঐ সকল মানুষ যিনি সাধারণ নেকীর কাজের প্রতি অবহেলা না করে প্রত্যেক নেকীর কাজই করার ব্যাপারে নিজেকে সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে নিজেকে কল্যাণপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত করেন।

নারী-পুরুষদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ এমন রয়েছে যে, যারা কল্যাণকর কাজে এবং ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কিত যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে নিজেকে সর্বাগ্রে এগিয়ে দেন। নিজের কল্যাণেই হোক বা অন্যের কল্যাণেই হোক, ফরজ বা নফল আদায়ের ক্ষেত্রে হোক, অপরের সেবায় ও সাহায্যে হোক, মহান আল্লাহ্র হক সম্পর্কিত হোক বা মানুষের হক সম্পর্কিত হোক, যে কোনো কল্যাণকর কাজেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

এরাই ঐসব সৌভাগ্য ও জ্ঞানবান লোক, যারা কল্যাণের ভান্ডার বা চাবি এবং স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) যাদেরকে 'কল্যাণের কুঞ্জী' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এসব লোকদের জন্যেই মহাসুসংবাদ রয়েছে। আরেক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা বিশৃংখলা, বিপর্যয়, অকল্যাণ, ক্ষতি, দুর্ভোগ, দুষ্কৃতি, পথভ্রষ্টতা ও শত্রুতা তথা যে কোনো অশুভ কাজেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। যেখানেই ফিতনা-ফাসাদ ও গোনাহের সাথে সম্পর্কিত কাজ তথা পাপাচারের কাজ সংঘটিত করার ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রথম কাতারের সৈনিক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। এরাই ঐসব লোক, যারা নিজেদেরকে সত্যাশ্রয়ী ও সত্যপথের পথিক বলে মনে করে এবং সমগ্র উম্মতকে পথভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দেয়।

এরাই ঐসব হতভাগ্য লোক, যারা মুসলমানদের আকিদা ও আমল সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর কথা বলে, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও বুযর্গানেদ্বীন সম্পর্কে ধৃষ্টতামূলক কথা বলে। এরা মহান আল্লাহ্র হক এবং বান্দার হক বিনষ্টকারী। এসব লোককেই 'অকল্যাণের ভান্ডার বা অশুভের কুঞ্জী' বলা হয়েছে এবং এরাই যে কোনো ধরণের ফিতনা ও পথভ্রষ্টতামূলক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এরা যদি ইচ্ছে করতো তাহলে সাধারণ নেকীর কাজ করে নিজেদেরকে সংশোধন করতে পারতো এবং প্রচুর নেকী অর্জন করতে সক্ষম হতো। সহজ এবং ছোট্ট ছোট্ট নেকী মানুষের জীবনের মূল্যবান পূজি।

ঐ সকল লোকদের এটাই উচিত যে, স্বচ্ছ হৃদয়ে তাওবা করে দ্রুত কল্যাণকর কাজ করে নিজের আমলনামার ওজন বৃদ্ধি করা এবং আখিরাতে অনন্তকালের জীবনে পরম সফলতাকে নিজের সাথে জড়িত করা। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

عِنْدَ اللّٰهِ خَزَائِنُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، مَفَاتِيْحُهَا الرِّجَالُ فَطُوْبٰى لِمَنْ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مُغْلَاقًا لِلْخَيْرِ-

"যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের ভান্ডার মহান আল্লাহর কাছে আর ঐ কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবি হলো মানুষ। সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার কল্যাণের চাবি হয়ে যায় এবং অকল্যাণকে প্রতিরোধ করে। আর দুর্ভাগ্য ও ধ্বংস ঐ লোকের জন্যে, যে লোক আল্লাহ তা'য়ালার কছে যে অকল্যাণ রয়েছে তার চাবি হয়ে যায় এবং কল্যাণকে প্রতিরোধ করে।" (জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং- ৪১০৮)

প্রত্যেক মুসলমানেরই এটা দায়িত্ব যে, সে নিজেকে কল্যাণের চাবি বানিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা চালাবে এমনভাবে যে, তার কথা ও এর কল্যাণ সৃষ্টিসমূহের জন্যে সহানুভূতি সেবা ও কল্যাণে নিবেদিত করবে। আর এমন লোকই মহাসৌভাগ্যবান। ইমাম শাফী' (রাহঃ) বলেছেন, 'দুনিয়ার জীবনে মানুষ একে অপরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। কিন্তু এর মধ্যে সবথেকে সৌভাগ্যবান মানুষ হলো যাদেরকে হাস্যোজ্জ্বল দেখা যাবে। মানুষের মধ্যে সবথেকে উত্তম মানুষ সেই ব্যক্তি, যার হাত অপরের প্রয়োজন পূরণ করে।'

খুবই কম সময়ে অসংখ্য নেকী অর্জনের আমল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' মহান আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্র নাম সম্বলিত সেই মহান বাক্য, যে বরকতময় বাক্যটি সকল উত্তম কাজের সূচনাতেই উচ্চারণ করা হয়। ঈমানদার মুসলমানগণ মহান আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্র নাম উচ্চারণ করেই সকল কাজের সূচনা করে। মুমিন নারীগণ সাংসারিক সকল কাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে বিসমিল্লাহ উচ্চারণ করে। কারণ যে কাজে কল্যাণ ও বরকতদাতা মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, সে কাজই কল্যাণ ও বরকতসম্পন্ন হয়ে যায় এবং অকল্যাণের অশুভ স্পর্শ থেকে সে কাজ মুক্ত থাকে।

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' আরবী ভাষায় লিখতে ১৯ টি অক্ষরের প্রয়োজন হয় এবং এ বাক্যটি পবিত্র কোরআনের আয়াত। সুতরাং পবিত্র কোরআনের একটি অক্ষর উচ্চারণ করলে হাদীসে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, তার আমলনামায় ১০ টি

নেকী লেখা হয়। সুতরাং মহান আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল ঈমান ও দৃঢ় আস্থা রেখে যে ব্যক্তি একবার 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চারণ করে, সে ব্যক্তি ১৯০ টি নেকী অর্জন করে।

আর এ মহাপবিত্র বাক্যটি উচ্চারণ করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় প্রয়োজন হয়। কোনো ব্যক্তি যদি এ বাক্যটি ৫০ বার উচ্চারণ করে, তাহলে খুব বেশী হলে তার ৪/৫ মিনিট সময় ব্যয় হবে। আর মাত্র ৪/৫ মিনিটেই সে ব্যক্তি ৯,৫০০ টি নেকী অর্জন করতে পারে।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে এভাবেই তাঁর বান্দাদেরকে অঢেল নেকী উপার্জনের সুযোগ করে দিয়েছেন। কারণ মানুষের পরকালীন জীবনে এমন এক মহাসঙ্কটময় দিন আবশ্যই আসবে, যেদিন সে মাত্র একটি নেকীর জন্যে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির দিকে অগ্রসর হবে। সেদিন নিতান্তই ভিখারীর মতো মাত্র একটি নেকীর খোঁজে, কেবলমাত্র একটি নেকীর প্রত্যাশায় করুণ কণ্ঠে একান্ত প্রিয়জন ও পরম আপনজনদের কাছে গিয়ে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটাই হবে সেদিন অটল-অকাট্য বাস্তবতা যে, পরম প্রিয় আপনজনও মহাবিপদের ঘনঘটা দেখে সেদিন তার প্রিয়জনকে চেনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না। কেউ একটি নেকী দিয়েও কাউকে সাহায্য সহযোগিতা করবে না। এই গ্রন্থে উল্লেখিত নেকীসমূহ, যা নিতান্তই সহজলভ্য এবং খুবই অল্প সময়ে অর্জন করা যায়, এসব নেকী সেদিন মহাকল্যাণে আসবে।

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বাক্যটি উচ্চারণে সামান্যতম কষ্টও যেমন অনুভব হয় না তেমনি অধিক সময়েরও প্রয়োজন হয় না। উঠতে-বসতে, রাস্তা-পথে চলতে ফিরতে দিন রাতের যে কোনো মুহূর্তেই এই মহাপবিত্র কথাটি স্বরবে, নীরবে ও মনে মনে উচ্চারণ করা যায়। আর এর বিনিময়ে রয়েছে অসীম কল্যাণ, নেকী ও সওয়াব। বিজ্ঞ আলেম-ওলামা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সম্পর্কে বলেছেন, এটি ইস্‌মে আযম। কারণ এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সেই মহাপবিত্র সত্তাবাচক নাম 'আল্লাহ' যে নাম মুমিনদের কাছে পরম প্রিয় এবং মহাসঙ্কটে এ নামই এনে দেয় পরম প্রশান্তি। এই মহামহিম নামটিই দুনিয়া-আখিরাতে বরকত, কল্যাণ ও মুক্তির একমাত্র চাবি।

নেকী দিয়ে আমলনামা পরিপূর্ণ করার আমল

দোয়ার মধ্যে এমন কিছু বাক্য এবং সংক্ষিপ্ত শব্দ রয়েছে যা উচ্চারণ করা একেবারেই সহজ কিন্তু ওজন ও গুরুত্বের দিক দিয়ে অত্যন্ত ভারী। ঐসব সহজ বাক্যের মধ্যে নিমোক্ত বাক্যটি একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য যা মাত্র চারটি শব্দের সমন্বয়ে

গঠিত হয়েছে এবং এই বাক্যটি উচ্চারণ করতে মাত্র ২/৩ সেকেন্ড সময় ব্যয় হয়। যদি কোনো ব্যক্তি বলে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ–

আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাত।

"হে আল্লাহ! সকল মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারীকে মাগফিরাত দান করো।"

এই সহজ বাক্য সমন্বিত দোয়া করলে অপরিসীম সওয়াব রয়েছে এবং সেই মহাসুসংবাদ রয়েছে, যে সম্পর্কে কোনো মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً– (عن عبادة بن الصامت رض)

"যে ব্যক্তি সকল মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের মাগফিরাতের জন্যে দোয়া করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে ঐ ব্যক্তির জন্যে সকল মুমিন নরনারীর বিনিময়ে নেকী লেখে দেয়া হয়।" (জামাউ'স সাগীর, হাদীস নং ৬০২৬)

মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা কত হবে তা কি আমরা অনুমান করতে পারবো? অথবা কিয়ামত পর্যন্তই বা প্রকৃত সংখ্যা কত হবে? এর সঠিক সংখ্যা একমাত্র মহান আল্লাহ্ই জানেন। সুতরাং আমরা মাত্র দুই সেকেন্ড সময় ব্যয় করে (উক্ত ছোট্ট দোয়াটি পড়ে) নিজেদের আমলনামায় কোটি কোটি নেকী লেখানোর প্রচেষ্টা চালাতে পারি।

আমরা সকলেই উক্ত সহজ এবং খুবই সাধারণ কাজটি করে সকল মুসলিম ভাইবোন পর্যন্ত দোয়াটি পৌঁছাতে পারি। যেনো প্রত্যেক মুসলমানই পরস্পর পরস্পরের জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করতে পারি। আর এ কাজটিই হবে আমাদের জন্যে অপরিসীম ও উচ্চমর্যাদাপূর্ণ সওয়াব অর্জন করার কাজ।

বরকতপূর্ণ জীবন-যাপনের আমল

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে সকল নবী-রাসূলদেরকে হালাল ও পবিত্র জিনিস খাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেই সাথে সকল ঈমানদারদের প্রতিও সেই নির্দেশ প্রযোজ্য করেছেন। হালাল ও মোবাহ্ এর ব্যাপারে এ কথাও প্রযোজ্য যে অপব্যয় না করা, অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ করা এবং বেশী দামী খাদ্য খাওয়া

সীমালংঘনমূলক কাজ। দুনিয়া এবং আখিরাতে এর পরিণতিও ক্ষতিকর। ইসলামী শরীয়াতের আবশ্যকীয় বিধানসমূহের আলোকে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করাও ইবাদাতের অন্তর্গত।

এ ব্যাপারে ইসলামের বিধানাবলী স্মরণ রাখতে হবে। খাদ্য-পানীয় সম্পর্কে কতিপয় জিনিস যেমন কম মূল্যের সাধারণ খাদ্য। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে তা অত্যন্ত উপকারী এবং বরকতপূর্ণ। যেমন খেজুর, এই খাদ্যটি যেমন পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত তেমনি তা বরকতপূর্ণ খাদ্য। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

يَاعَائِشَةُ! بَيْتٌ لاَ تَمَرَ فِيْهِ جِيَاعٌ اَهْلُهُ–

"হে আয়িশা (রাঃ)! যে ঘরে খেজুর নেই সেই ঘরের লোকজন অনাহারে রয়েছে।" (মুসলিম, হাদীস নং- ২০৪৬)

আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

لاَ يَجُوْعُ اَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَ هُمُ التَّمَرُ–

"যে ঘরে খেজুর রয়েছে, সে কখনো অনাহারে থাকবে না।" (মুসলিম, হাদীস নং- ২০৪৬)

খেজুর এক বরকতপূর্ণ এবং কম দামি ফল, এটি প্রত্যেক জায়গাতেই সহজে পাওয়া যায় এবং উপযুক্ত মূল্যেই পাওয়া যায়। বিশেষ করে আরব দেশে বিভিন্ন ধরণের খেজুর বেশ কম দামে পাওয়া যায়। এমনিভাবে সিরকাও খুবই বরকতময় খাদ্য। এটা যেমন কম দামী তেমনি সহজলভ্য এবং সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। একদিনের ঘটনা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى عَائِشَةَ وَقَالَ هَلْ مِنْ غَدَاءٍ قَالَتْ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَتَمَرٌ وَخَلٌّ، فَقَالَ نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِى الْخَلِّ فَاِنَّهُ كَانَ اِدَامُ الاَ نْبِيَاءِ قَبْلِى وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتٌ فِيْهِ خَلٌّ–

"নবী করীম (সাঃ) একদিন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর ঘরে এসে খাওয়ার কিছু আছে কিনা জানতে চাইলেন। হযরত আয়িশা (রাঃ) আবেদন করলেন, আমার কাছে রুটি, খেজুর ও সিরকা রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বললেন, সিরকা খুব

ভালো তরকারী। হে আল্লাহ! সিরকায় বরকত দাও! কারণ সিরকা আমার পূর্বে যে সকল নবী-রাসূল এসেছিলেন, তাঁদের সকলের পসন্দের খাদ্য ছিলো। যে ঘরে সিরকা রয়েছে সে ঘর কখনো অভাবে থাকবে না।" (ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং- ৩৩১৮)

সিরকা ঝোল জাতীয় টক জিনিস। অর্থাৎ ভিনিগারের মতো তরল টক ঝোল। এই জিনিস সালাদ বা অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে ব্যবহার করা হয়। একে কেউই তরকারী বলবে না। অথচ নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এটাই ছিলো প্রিয় তরকারী। এই জিনিসটি বেশ সহজলভ্য এবং খাদ্য হজমে সহায়ক। শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক এবং পেটের ক্রিমি দূর করে ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। একদিন নবী করীম (সাঃ) ঘরে এলেন এবং তাঁর সম্মুখে সিরকা দেয়া হলো। তিনি প্রশংসা করে তিনবার বললেন, সিরকা খুব ভালো তরকারী। (মুসনাদে আহ্মাদ, হাদীস নং- ১৫২৫৯)

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, 'আমি যেদিন থেকে নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র জবান থেকে সিরকার প্রশংসা শুনেছি, সেদিন থেকে সিরকা আমার কাছে প্রিয় খাদ্যে পরিণত হয়েছে।' এসব হাদীস থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, যার যে খাদ্য পসন্দের, সে খাদ্য গ্রহণ করার সময় কিছুটা প্রশংসা করা উচিত। প্রশংসা করার প্রথম উদ্দেশ্যে হলো মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার শোকর আদায় করা। কেননা তিনিই অনুগ্রহ করে খাওয়াচ্ছেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, যিনি কষ্ট করে এই খাদ্য প্রস্তুত করেছেন, তিনি প্রশংসা শুনলে খুশী হবেন।

খেজুর এবং সিরকার মতো যায়তুনের তেল এবং যায়তুনও কম দামী এবং সাধারণ খাদ্য। এটা সেই খাদ্য যা সর্বত্রই খুবই সহজলভ্য। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যায়তুনের শপথ করেছেন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

كُلُوْا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهٖ فَانَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ–

"যায়তুন আহার করো এবং এর তেল শরীরে মাখো, কারণ অত্যন্ত মোবারক গাছ থেকে এ তেল নির্গত হয়েছে।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ১৮৫২)

বর্তমানে আমরা মোবারক জিনিস ও বরকতের গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হইনি, যদিও দুনিয়া-আখিরাতের যাবতীয় উপদেশ ও কল্যাণ বরকতের মধ্যেই শামিল রয়েছে। আমাদের সকলের জীবনেই এর অনুশীলন করা উচিত। পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী জীবনে একজন মানুষ অসংখ্য জিনিস-পত্র যোগাড় করে। সবকিছুই ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশের কাজেই ব্যবহার করে। উচ্চ মূল্যের ফার্নিচার, ঠান্ডা পানি পান করার জন্যে ফ্রিজ, আরামদায়ক শয্যা, সেবা-যত্নের জন্যে দাস-দাসী প্রস্তুত রাখা হয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও মানসিক অশান্তির কারণে রাতে ঘুম আসে না, বিছানায় এপাশ ওপাশ করে রাত অতিবাহিত করতে হয়।

মাসে লক্ষ টাকা উপার্জন করে কিন্তু চাহিদার শেষ নেই। ধন-দৌলত, ঐশ্বর্য্য ও বিলাস সামগ্রীর প্রাচুর্যতা রয়েছে কিন্তু বরকত নেই। বর্তমানে আমাদের জীবনে এত উন্নতি, অগ্রগতি, ভোগ-বিলাসের সামগ্রীর প্রাচুর্যতা তবুও কেনো আমরা তৃপ্ত হতে পারছি না? এর একমাত্র কারণ হলো, এত কিছু থাকার পরও আমরা এর মধ্যে কোনো বরকত অর্জন করতে পারিনি। বরকতের অর্থই হলো, অল্প জিনিসে আল্লাহ্ তা'য়ালা মানসিক স্বস্তি ও তৃপ্তি দান করেন। কারণ বরকত অর্জন করা যায় নেক কাজ তথা সৎকাজ করার মধ্য দিয়ে। এ জন্যে সহজ সাধ্য নেক কাজ করার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবং সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করে দেহ ও আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখতে হবে।

প্রশান্তিমূলক জীবন-যাপনের আমল

ইমাম শাওকানী (রাহঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যেসব নেককার বান্দাদের উসিলায় পৃথিবী এবং পৃথিবীবাসীর হিদায়াত ও কল্যাণ চান, তাদের জীবনকাল দীর্ঘ করে দেন এবং এভাবেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হিদায়াত ও কল্যাণ সর্বসাধারণই লাভ করে। ঠিক একই ভাবে ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও দুষ্কৃত প্রকৃতির লোক ও তাদের সহযোগিদের কারণে তাদের জীবনপাত্রে ছিদ্র করে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। (তাম্বিহুল আফযল লিশ্‌শাওকানী, পৃষ্ঠা নং- ২৭)

বিখ্যাত ও সম্মানিত ইসলামী আইনজ্ঞ আলেমদের ইমাম আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ) বলেছেন, দোয়া করার মাধ্যমে বিপদ-আপদ দূরীভূত হয় এবং নেক কাজ করার মাধ্যমে জীবনকাল বৃদ্ধি পায়। (জাযাউল আ'মাল, পৃষ্ঠা নং- ৩২)

হাদীস এবং সম্মানিত বুযর্গদের বাণী থেকে জানা যায় যে, নেক কাজের কারণে পৃথিবীতে জীবনকালে প্রকৃত কল্যাণ ও বরকত রয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকেই দান করা হয়। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে দীর্ঘ জীবনকালে পরিণত করা আর সে জীবনকালকে প্রশান্তিমূলক ও তৃপ্তির নীড়ে পরিণত করার পন্থা হলো, সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে সৎকাজ তথা নেকীর কাজ করতে থাকা। আর এভাবেই পৃথিবীতে জীবনকাল প্রশান্তিদায়ক হতে পারে।

জীবনকে তৃপ্তি ও প্রশান্তি দেয়ার মতো ধন-সম্পদ, মূল্যবান সামগ্রী ও আসবাব পত্র পৃথিবীতে নেই। রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করা, প্রচন্ড ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হওয়া এবং বিপুল ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব ও ঐশ্বর্য্য লাভ করা প্রশান্তিমূলক বা আরামদায়ক জীবনের নাম নয়, বরং ঈমান ও সৎকাজ তথা নেক আমল করাই হলো প্রশান্তিমূলক জীবনের নাম।

পঞ্চম অধ্যায়

মুত্তাকী লোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের ফযিলত

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেয়া সুযোগ, তাঁর দয়া ও মেহেরবানীর ফলেই নেকী অর্জন করা সম্ভব এবং তাঁর অসন্তুষ্টিই যাবতীয় অকল্যাণের কারণ। যদি কোনো মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে বুঝে মহান আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কাজ করতে থাকে এবং তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে না আসে, তাহলে এ ধরণের মানুষের উপায় কি? এ ধরণের মানুষের কাছ থেকে কোনোরূপ কল্যাণ আশা করা যেতে পারে না। কাঁটাযুক্ত গাছের বীজ বপন করে ফুল গাছের আশা করা যেতে পারে কি? কাঁটার ঝোপঝাড় থেকে যেমন সুগন্ধিযুক্ত ফুল আশা করা যায় না, ঠিক তেমনি নাফরমান ও দাম্ভিক ব্যক্তির মধ্যেও নেকী অর্জনের প্রবণতা সৃষ্টি হয় না।

যে ব্যক্তি নিজ জীবনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থেকে নিজের প্রতিপালককে ভয় করে তাঁরই দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে জীবনের মূল উদ্দেশ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যায়, সফলতা সে ব্যক্তিকেই স্বাগত জানায়। একদিন নবী করীম (সাঃ) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বললেন–

مَنْ خَافَ اَدْلَجَ وَمَنْ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، اَلاَ اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ، اَلاَ اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ–

"যে ব্যক্তি (কোনো শত্রুর আশঙ্কায়) ভয় পেয়ে রাতের প্রথম প্রহ্‌রে সফরে রওয়ানা হয় এবং যে ব্যক্তি রাতের প্রথম অংশে সফর শুরু করে সে গন্তব্যে পৌঁছে যায়। ভালো করে শোন এবং মনে রেখো, মহান আল্লাহর কাছে যে বিনিময় রয়েছে তা অত্যন্ত মূল্যবান। আর জেনে রেখো, সে বিনিময় হলো জান্নাত।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ২৪৫০)

পৃথিবীর জীবনকালে সৎ কাজ করা এবং অন্যান্যদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা হলে এসব আমলই কবরের জীবনে এবং কিয়ামতের দিন উপকারে আসবে। এগুলো খুবই সহজসাধ্য নেকীর কাজ, যা আমাদের কাছে অতি সাধারণ মনে হলেও তা আমাদের আমলনামাকে ওজনে ভারী করে দিবে এবং এই নেক কাজের বিনিময়ে মুক্তি পাওয়া যাবে।

পৃথিবীতে মহান আল্লাহর নাফরমানী, বিদ্রোহ ও মানুষকে কষ্ট দেয়ার মধ্য দিয়ে যারা জীবন অতিবাহিত করে, এরাই হলো সেই সব লোক যারা মহান আল্লাহর দেয়া

সীমালংঘন করেছে। এরা কবরে সীমাহীন আযাব ভোগ করার পরে কিয়ামতের দিন যখন নিজ নিজ কবর থেকে উঠবে তখন অবাক বিস্ময়ে বলবে–

يٰوَيْلَنَا مَنْ م بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا–

"হায় কপাল আমাদের! কে আমাদেরকে কবর থেকে দ্বিতীয়বার জীবন দিয়ে উঠালো?" (সূরা ইয়াছিন-৫২)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

كَمَا لاَيُجْتَنِىْ مِنَ الشُّوْكِ الْعِنَبُ كَذَالِكَ لاَيَنْزِلُ الْفُجَّارُ مَنَازِلَ الاَبْرَارِ فَاسْلُكُوْا اَىَّ طَرِيْقٍ شِئْتُمْ فَاَىَّ طَرِيْقٍ سَلَكْتُمْ وَرَدْتُمْ عَلٰى اَهْلِهٖ–

"কন্টকযুক্ত গাছে যেমন আঙ্গুর ফলে না, তেমনি ফাসিক ও দুষ্কৃত প্রকৃতির লোক আল্লাহভীরু লোকদের সান্নিধ্য অর্জন করতে পারে না। তোমরা ইচ্ছে অনুযায়ী নিজেদের জন্যে নির্বাচিত করো, তোমরা যে পথ ও পদ্ধতি নিজেদের জন্যে নির্বাচিত করবে, সেই পথ ও পদ্ধতি আবিষ্কারকদের সাথে তোমাদের হাশর হবে।" (জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং- ৪৫৭৫)

প্রত্যেক নরনারী ও যুবকদের বর্তমানে বিবেচনা করে দেখতে হবে তারা পৃথিবীতে জীবন চলার পথে কোন্ শ্রেণীর মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি, বন্ধুত্ব স্থাপন এবং চলাফেরা করছে। যদি আমরা পৃথিবীতে সৎ কর্মশীল ও আল্লাহভীরু লোকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি ও তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে পারি, তাহলে আমাদের হাশরও তাদের সাথেই হবে। যদি আমাদের সার্বিক জীবনযাত্রা এর বিপরীত হয় তাহলে আমাদেরকে স্বয়ং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, আমরা আল্লাহভীরু লোকদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করবো, না আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী বান্দাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করবো।

এটা এক স্পষ্ট বাস্তবতা, যে ব্যক্তি সৎ মানুষ, আলেম-ওলামা, আল্লাহভীরু, পুণ্যবান এবং আল্লাহর প্রতি যারা বন্ধুত্ব পোষণ করেন, এমন লোকদের আকিদা-বিশ্বাসের সাথে নিজের বিশ্বাসের ও হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করলে তাদের সৎকাজের সওয়াবের ভাগ নিজেও পাওয়া যায়। এর বাস্তব দৃষ্টান্ত হলো আস্হাবে কাহ্ফ (গুহাবাসী) এর সেই কুকুরটির অবস্থা।

মহান আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গকারী মুজাহিদীনদের প্রতি কুকুরটি ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাদের সাহচর্য অবলম্বন করেছিলো, এ জন্যে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা কুকুরটির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে প্রশংসার ভঙ্গিতে পবিত্র কোরআনে কুকুরটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত কোরআনের আয়াত হিসেবে পঠিত হতে থাকবে। মুমিনগণ যখন পবিত্র কোরআনে কুকুরটির প্রসঙ্গ পড়বে, তখন মনে কুকুরটির প্রতি মমতাই জাগবে।

ঠিক একইভাবে হযরত নূহ (আঃ)-এর সন্তান কাফিরদের সাহচর্য গ্রহণ করেছিলো, আর এ কারণে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে কাফিরদের সাথেই ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং পবিত্র কোরআনে ঘৃণার দৃষ্টিভঙ্গিতে তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। তার প্রসঙ্গ যখন মুমিনগণ পবিত্র কোরআনে পড়বে, তখন তার প্রতি মনে ঘৃণারই উদ্রেক হবে।

গোনাহ্ ও নাফরমানী পরস্পরে শত্রুতা সৃষ্টির কারণ

আমরা অবশ্যই ঐ হাদীস শুনেছি, যে হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানকে পরস্পরের সাথে মুহাব্বাতের সম্পর্ক স্থাপন, পরস্পরের সেবাযত্ন, সাহায্য-সহযোগিতা করা, কল্যাণমূলক পরামর্শ দেয়া, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করার আদেশ দেয়া হয়েছে। ঐ হাদীসের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়েছে যে হাদীসে একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা কবীরা গোনাহ্ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তিনদিনের অধিক অসন্তুষ্টির ভাব বজায় রাখার পরিণতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ–

"কোনো মুসলমানের জন্যে এটা বৈধ নয় যে, সে অন্য মুসলমানের সাথে তিনদিনের অধিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকবে। সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যদি তার ইন্তেকাল হয় তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৪৯১৪)

একজন মুসলমানের সাথে অন্য মুসলমানের বংশগত সম্পর্ক বা দ্বীনি সম্পর্ক থাক বা না থাক, যে কোনো অবস্থাতেই উভয়কে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করতে হবে। আল্লাহভীরুতা অর্জন করতে হবে এবং গোনাহ্ থেকে দূরে অবস্থান করতে হবে। কারণ পরস্পরের সাথে মুহাব্বাতের সম্পর্ক গোনাহের কারণে শত্রুতায় পরিণত হয়। ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী (রাহঃ) জামেউ'ল উলুম আল

হিকাম কিতাবে কতিপয় সৎকর্মশীল বুযর্গ লোকদের বাণী উল্লেখ করেছেন, 'যখন আমি আমার বাহন পশুটিকে আমার অবাধ্য হতে দেখি, তখন দ্রুত আমি আত্মসমালোচনা করি যে, অবশ্যই আমার দ্বারা কোনো কবীরা গোনাহ্ সংঘটিত হয়েছে, যার কারণে আমি এই শাস্তি পেয়েছি।' নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَاتَوَادَّا اثْنَانِ فِى اللّٰهِ فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا اِلاَّ بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا–

"দুইজন মুসলমান যখন একমাত্র মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে উভয়ে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাদের উভয়ের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয় না। কিন্তু দুইজনের কোনো একজন গোনাহ্ করলেই সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়।" (ফয়যুল কাদীর, হাদীস নং- ৭৮৭৯, জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং- ৫৬০৩)

সম্মানীত পাঠকবৃন্দ! এসব পবিত্র হাদীস অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে পাঠ করে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে যেসব গোনাহ্ সংঘটিত হয়, এসব গোনাহ্ থেকে মুক্ত থাকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

কল্যাণকর জ্ঞান অর্জন করার ফযিলত

কল্যাণকর জ্ঞান হলো মহান আল্লাহ্র দেয়া অতি উজ্জ্বল আলো বিশেষ এবং এই আলো জীবনের সাথে জড়িত যে কোনো ধরণের মুর্খতা ও পথভ্রষ্টতার গভীর অন্ধকার থেকে মানুষকে মুক্ত করে আলোক উজ্জ্বল নক্ষত্রের পরিবেশে এগিয়ে দেয়। নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণের সূচনাই হয়েছিলো জ্ঞান এর সাথে সম্পর্কিত বিষয় দিয়ে। অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ)-কে প্রথমেই পড়ার আদেশ দেয়া হয়েছিলো। পবিত্র কোরআনে কলম ও লেখা এর শপথ করার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, কল্যাণকর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা ও মর্যাদা কতটা উচ্চে। জ্ঞান কম বেশী যা-ই হোক না কেনো, তা অবশ্যই হতে হবে কল্যাণকর ও লাভজনক। পবিত্র কোরআনে ইয়াহূদী আলেমদেরকে গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে এ জন্যে যে, তাদের অর্জিত জ্ঞান কল্যাণকর ছিলো না। (সূরা জুমুয়াহ্-৫)

বর্তমানে আমাদের সমাজে জ্ঞানের আধিক্য, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাঙ্গনের আধিক্য থাকার পরও নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটেছে শুধুমাত্র ইসলাম থেকে বিচ্যুতি ও অকল্যাণকর জ্ঞানের কারণে। নবী করীম (সাঃ) এভাবে মহান আল্লাহ্র দরবারে অকল্যাণকর জ্ঞান থেকে পানাহ্ চাইতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ–

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউ'যুবিকা মিন ই'লমিন লা ইয়ান্‌ফাউ'।

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অকল্যাণকর জ্ঞান থেকে পানাহ্ চাই।" (মুসলিম, হাদীস নং- ২৭২২, নাসায়ী, হাদীস নং- ৫৫৩৭)

হাদীসে উল্লেখিত এই ছোট্ট দোয়াটি আমাদের সকলেরই মুখস্থ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত এবং এই ছোট্ট বাক্যটিই আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, অর্জিত জ্ঞানের লক্ষ্য হতে হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁরই সৃষ্টির কল্যাণের জন্য। জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য যদি এটা না হয়, তাহলে জ্ঞানের ধারকের জন্যে তা মুক্তির মাধ্যম না হয়ে বরং ধ্বংসের কারণে পরিণত হবে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞানই হোক অথবা বস্তুবাদী জ্ঞানই হোক, তা অর্জন করার জন্যে মুসলমানদেরকে জোর প্রচেষ্টা অব্যহত রাখতে হবে এবং সেই সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে, যে জ্ঞান অর্জন করা হচ্ছে তা কল্যাণকর কিনা।

অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা ভালো কথা পড়তে পারি, শিখতে পারি এবং সেই আলো ঐ পর্যন্ত পৌছাতে পারি, যে এখন পর্যন্ত সে আলোয় আলোকিত হয়নি। আমাদের সামান্য সময়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অসংখ্য জনের ভাগ্য পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে এবং আমাদের করুণাময় প্রতিপালক আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন। অবশ্যই ঐ সকল লোকজন অত্যন্ত ভাগ্যবান, যারা কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান নিজে শিখে এবং অন্যকেও শিক্ষা দেয়। পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত, একটি হাদীস, ইসলামী শরীয়াতের একটি মাস্‌য়ালা অথবা একটি ভালো কথা অন্যকে শিখানো এবং নিজে শেখা খুবই উত্তম ও উন্নত কাজ। পবিত্র হাদীসে অধিক সংখ্যক স্থানে জ্ঞান এবং জ্ঞানবান তথা ইলম ও আলেমের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে আমাদেরকে আলেমদের কাছ থেকে ইসলামী জ্ঞান শিখতে হবে, কারণ আলেমগণই নবী-রাসূলদের উত্তরাধিকারী। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যিনি ক্ষতিকর দর্শন ও মতামত দিয়ে থাকেন, তার সৃষ্ট ফিতনা থেকে দূরে অবস্থান করতে হবে। কারণ ক্ষতিকর দর্শন ও মতামত স্বয়ং নিজেই এক ভয়ানক কর্ম। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالْفِقْهُ بِاتَّفَقُّهِ وَمَنْ يُّرِدِ

اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ–

"হে লোক সকল! (আলেমদের কাছে সাধারণ লোকজন) ইলম শেখার জন্যে আসে এবং ফকীহ্ (আইনজ্ঞ) মনে করেই আসে। (সুতরাং লোকদেরকে দ্বীনের সঠিক ইলম শিক্ষা দাও) আল্লাহ তা'য়ালা যাকে কল্যাণ দান করতে চান তাকে দ্বীনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করার মতো জ্ঞান দান করেন। এবং অবশ্যই জ্ঞানবান লোকেরাই আল্লাহ তা'য়ালাকে অধিক ভয় করে থাকে।" (আত্ তাবারাণী ফিল কাবীর, আত্তারগিব, হাদীস নং- ১০০)

বিনয় ও নম্রতাই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধির উপায়

জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের এক বিশেষ স্তর। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একটি গুণবাচক নাম 'আল হাকীম' অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা জ্ঞানবান প্রজ্ঞাশীল। বিখ্যাত জ্ঞানবান ব্যক্তিত্ব হযরত লূকমান (আঃ)-এর নাম সচেতন মানুষ অবগত রয়েছেন। জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার কারণেই তাঁর এই পরিচিতি- প্রসিদ্ধি। পবিত্র কোরআনের একটি সূরাও তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে এবং কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ–

"আমি লূকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম।" (সূরা লূকমান-১২)

হিকমাত তথা জ্ঞান, বিচক্ষণতা, অনুধাবন ক্ষমতা, উপলব্ধি ক্ষমতা, দূরদর্শীতা ও প্রজ্ঞার বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। হাদীস ও সুন্নাত সম্পর্কিত জ্ঞানকেও হিকমাত বলে। হিকমাতের আরেকটি অর্থ নবুয়াত। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে পৃথক আয়াত রয়েছে। জ্ঞান, বিচক্ষণতা, অনুধাবন ক্ষমতা, উপলব্ধি ক্ষমতা, দূরদর্শীতা ও প্রজ্ঞা মহান আল্লাহ তা'য়ালার অতুলনীয় নিয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত, যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাকে দেয়া হয়।

উপরোক্ত গুণাবলী স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষকেও সম্মান-মর্যাদার উঁচু স্তরে পৌছে দেয়। আর এসব গুণাবলীর অনুপস্থিতির কারণে অনেক বড় বড় বিখ্যাত কৌশলীও নিজের অবস্থান থেকে নীচে পড়ে যায়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَامِنْ اٰدَمِيٍّ اِلَّافِىْ رَأْسِهٖ حِكْمَةٌ بِيَدِ مَلَكٍ فَاِذَا تَوَاضَعَ قِيْلَ

لِلْمَلَكِ ارْفَعْ حِكْمَتَهُ وَاِذَا تَكَبَّرَ قِيْلَ لِلْمَلَكِ ضَعْ حِكْمَتَهُ-

"প্রত্যেক মানুষের মাথায় হিকমাত বা জ্ঞান রাখা হয়েছে, যা একজন ফিরিশ্তার হাতের মধ্যে রয়েছে। মানুষ যখন বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করে তখন ফিরিশ্তাকে বলা হয় ঐ ব্যক্তির জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটাও। আর মানুষ যখন অত্মম্ভরিতা বা অহঙ্কার প্রদর্শন করে তখন ফিরিশতাকে বলা হয়, উক্ত ব্যক্তির জ্ঞানকে নীচে নামিয়ে দাও অর্থাৎ জ্ঞান হ্রাস করে দাও।"

(ফয়যুল কাদীর, হাদীস নং- ৭৯৮৪, জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং- ৫৬৭৫)

অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার কারণেই পতন ঘটে আর এই অহঙ্কারই মানুষকে সম্মান-মর্যাদার স্থান থেকে বিস্ময়করভাবে পতনের অতল তলদেশে পৌছে দেয়। উল্লেখিত হাদীসে পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে, বিনয় ও নম্রতার কারণেই জ্ঞানের ভান্ডার অর্জন করা যায়। আর ঠিক এ কারণেই সম্মানিত বুযর্গ ব্যক্তিগণ বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের হয়ে থাকেন। নবী করীম (সাঃ) এ কথাও বলেছেন-

مَاتَوَا ضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ-

"যে ব্যক্তি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।" (মুসলিম, হাদীস নং- ২৫৮৮)

ঐ সকল লোক যারা জীবন চলার পথে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে বিনয়, নম্রতা ও সর্বোত্তম ব্যবহার করে তার জন্যে মহাসুসংবাদ রয়েছে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জ্ঞান, বিচক্ষণতা, অনুধাবন ক্ষমতা, উপলব্ধি ক্ষমতা, সৃজনশীলতা, দূরদর্শীতা ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করে দেয়ার সাথে সাথে তাঁকে সম্মান- মর্যাদাজনক অবস্থান দান করেন। যে মানুষের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা নেই, সে মানুষ ফিরআউন ও নমরুদে পরিণত হয়।

অন্তর রোগাক্রান্ত হবার এবং সকল গোনাহের ভিত্তিই হলো অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা। অহঙ্কার থেকেই ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ, কপটতাসহ চারিত্রিক সকল কদর্যতার উৎপত্তি ঘটে। অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার কারণেই শয়তানকে উচ্চস্থান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে করাই হলো প্রকৃত বিনয়। নিজের সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করতে হবে যে, আমি একজন দুর্বল মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নই এবং আমার কোনো শক্তি-সামর্থ বা পদমর্যাদা নেই, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তার সম্মান-মর্যাদা ও অবস্থান বৃদ্ধি করে দিবেন।

বিস্‌মিল্লাহ্‌র অপূর্ব বরকত ও ফযিলত

যে কাজের সূচনায় মহান আল্লাহ তা'য়ালার নাম মোবারক উচ্চারিত হয়, সে কাজই সহীহ্‌ভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ জন্যেই প্রত্যেক মুসলমানদের প্রতি আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেনো যে কোনো কাজের সূচনা বিসমিল্লাহ্ উচ্চারণের মাধ্যমে করে। খাদ্য গ্রহণ ও পানি পানের সূচনাতেও যেনো এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। (বোখারী, হাদীস নং- ৫৩৭৬)

নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক কাজের সূচনায় বিস্‌মিল্লাহ উচ্চারণ করতেন এবং পত্রের প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখাতেন এটা বোখারী ও মুসলিম হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণ রয়েছে। (বোখারী, হাদীস নং- ২৭৩২, মুসলিম, হাদীস নং- ১৭৮৩)

সম্মানিত ও মর্যাদাবান নবী হযরত সুলাইমান (আঃ) সাবার রাণীর কাছে যে পত্র লিখেছিলেন, সে পত্রের সূচনাতেও তিনি লিখেছিলেন, বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। (সূরা নহ্‌ল-৩০)

আমাদের মধ্যে কতিপয় লোক 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখার পরিবর্তে '৭৮৬' সংখ্যাটি লিখে থাকে যদিও ইসলামী শরীয়াতে এর কোনোই ভিত্তি নেই এবং এ ধরনের কাজ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। অযু করার সময় সূচনাতেই বিস্‌মিল্লাহ উচ্চারণ করতে হবে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

تَوَضَّؤُوْا بِسْمِ اللّٰهِ –

"বিস্‌মিল্লাহ বলে অযু শুরু করো।" (নাসায়ী, হাদীস নং- ৭৮)

টয়লেটে প্রবেশ করার পূর্বে যে দোয়া পড়া হয়, সে দোয়া পড়ার পূর্বেও বিস্‌মিল্লাহ উচ্চারণ করতে হবে। (তিরমিযী, হাদীস নং- ৬০৬)

স্বামী-স্ত্রী মিলিত হবার পূর্বে যে দোয়া পড়া হয়, সে দোয়ার সূচনাতেও বিস্‌মিল্লাহ রয়েছে। (বোখারী, হাদীস নং- ৫১৬৫)

অর্থাৎ এটা সেই কল্যাণময় বাক্য, যার বরকতে প্রত্যেকটি নেক কাজই যথার্থভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করে আর সে কাজের রক্ষাকারী হয়ে যান স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। আমাদের প্রাণ, ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবার-পরিজনের তথা যে কোনো বিষয়ের ক্ষতি, শত্রুর শত্রুতা ও অকল্যাণ থেকে মুক্ত থাকার জন্যে আমাদেরকে যে দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে তাহলো–

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَاَهْلِىْ وَ مَالِىْ–

বিস্মিল্লাহি আ'লা নাফ্সী ওয়া আহ্‌লী ওয়া মা-লী। অর্থাৎ "আমার প্রাণ, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন সবই আল্লাহর নামে।" (আল আযকার, ইমাম নববী, হাদীস নং- ৩৩৫)

ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেছেন, নিজেকে ও নিজের পরিবারজনকে এবং ধন-সম্পদ ও ব্যবসাকে কু-দৃষ্টিসহ যে কোনো ধরনের ক্ষতি ও অকল্যাণ থেকে মুক্ত রাখার জন্যে এই দোয়া প্রত্যেক মুহূর্তেই পড়া উচিত। বিস্মিল্লাহ্ সম্বলিত বাক্য এতই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন যে, ওহূদের যুদ্ধে এক সময় হযরত তালহা ইবনে উবাইদ (রাঃ) আহত হলেন এবং তাঁর একটি আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। এ সময় হঠাৎ করেই তাঁর মুখ থেকে একটি বাক্য উচ্চারিত হলো। নবী করীম (সাঃ) তা শুনে বললেন—

لَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللّٰهِ لَرَفَعَتْكَ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ حَتّٰى تَلِجَ بِكَ فِى جَوِّالسَّمَاءِ—

"তুমি ঐ শব্দ বলার পূর্বে যদি বিস্মিল্লাহ্ উচ্চারণ করতে তাহলে ফিরিশ্তা তোমাকে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে দিতো এবং লোকজন তোমার দিকে দেখতো।" (সহীহ্ আল জামে' হাদীস নং- ৫২৭৬, নাসায়ী, হাদীস নং- ৩১৪৯)

ইসলাম প্রত্যেক কাজের সূচনায় আল্লাহর নাম উচ্চারণের নির্দেশনা দিয়ে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের গতি আল্লাহ্ তা'য়ালার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। প্রতি পদক্ষেপে সেই অঙ্গীকারকে শানিত করেছে যে, আমার সমগ্র অস্তিত্ব ও সকল কাজই মহান আল্লাহ্র ইচ্ছা ও সাহায্য ব্যতীত পরিপূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। এভাবে ইসলাম পৃথিবীতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি স্পন্দনকেই ইবাদাতে পরিণত করেছে। বিস্মিল্লাহ্ উচ্চারণের কাজটি খুবই ছোট, এটি উচ্চারণ করতে খুবই কম সময় ব্যয় হয় এবং এতে কোনো পরিশ্রমও নেই। কিন্তু এই বাক্যটি উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে এতো বিরাট কল্যাণ ও সফলতা দিয়েছে যে, মানুষের জন্যে দুনিয়ার জীবনকাল ইসলামী জীবনধারায় পরিণত হয়েছে।

সূরা ফাতিহার অকল্পনীয় ফযিলত

সূরা ফাতিহা পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম সূরা এবং গ্রন্থবদ্ধ কোরআনেও এই সূরাকে সর্বপ্রথমে স্থান দেয়া হয়েছে। সকল মুসলমান এই সূরা নামাজের প্রত্যেক রাকাআতেই পড়ে থাকে। এটি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সূরা এবং এর ফযিলত ও গুরুত্ব খুবই বেশী। এই সূরায় ব্যবহৃত আরবী অক্ষরের সংখ্যা মোট ১২২টি। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, পবিত্র কোরআনের একটি অক্ষর উচ্চারণ করলে দশটি

নেকী পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সূরা ফাতিহা একবার পড়লে ১২২ × ১০ = ১,২২০টি নেকী আমলনামায় লেখা হয়। ধরে নেয়া যাক আমরা ১ মিনিটে সূরা ফাতিহা ৬ বার পড়তে পারি। তাহলে এভাবে ১ মিনিটে ৬ × ১,২২০ = ৭,৩২০ টি নেকী অর্জন করতে পারি। ৬০ মিনিটে এক ঘন্টা আর দিনরাত মিলে হয় ২৪ ঘন্টা। তাহলে ২৪ × ৬০ = ১,৪৪০ মিনিট। অর্থাৎ দিনরাত মিলিয়ে ১,৪৪০ মিনিট হয়।

সুতরাং আমরা দিনরাতে মোট ১,৪৪০ মিনিটের মধ্যে ফরজ ও ওয়াজিব আদায় করার পর সূরা ফাতিহা ৬ বার পড়ার জন্যে শুধুমাত্র একটি মিনিট সময় যদি ব্যয় করি, তাহলেই আমরা প্রত্যেক দিন ৭,৩২০টি নেকী খুবই অল্প সময়ে অর্জন করতে পারি। দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে ফরজ নামাজের পরেই যে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ নামাজ আদায় করি, তা সর্বমোট ১২ রাকাআত। এর সাথে ৩ রাকাআত বিতর নামাজ যোগ করলে হবে মোট ১৫ রাকাআত। তাহলে প্রত্যেক দিনরাতে আমরা ১৫ বার উক্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সূরাটি পড়ে থাকি। সেই সাথে নফল নামাজ আদায় করে এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারি।

দিনরাতে সুন্নাত ও ওয়াজিব নামাজ ১৫ রাকাআত এবং ফরজ নামাজ ১৭ রাকাআত। উভয় সংখ্যা মিলে হলো ৩২ রাকাআত। প্রত্যহ সুন্নাত ও ওয়াজিব নামাজে ১৫ বার সূরা ফাতিহা পড়া হলো। ১ বার পড়লে নেকী ১,২২০ × ১৫ = ১৮, ৩০০ নেকী প্রত্যহ পাওয়া যাচ্ছে শুধু সুন্নাত ও ওয়াজিব নামাজে সূরা ফাতিহা পড়ার কারণে। প্রত্যহ ফরজ নামাজ হলো ১৭ রাকাআত। আর সুন্নাত ও ওয়াজিব নামাজ ১৫ রাকাআত, ১৫ + ১৭ = ৩২ রাকাআত। তাহলে ১ বার পড়লে নেকী ১,২২০ × ৩২ = ৩৯,০৪০ নেকী প্রত্যহ লিখে দেয়া হয়।

যদি আমরা প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সকল রাকাআতে সূরা ফাতিহা পড়া ছাড়াও মাত্র ১০টি মিনিট ব্যয় করে ৬০ বার সূরা ফাতিহা পড়ি, তাহলে এর বিনিময়ে অগণিত সওয়াব এবং ৪৩, ৯,২০০ টি নেকী অর্জন করতে পারি। অর্থাৎ ১ মিনিটে ৬ বার পড়া গেলে ১০ মিনিটে ৬০ বার পড়া যায়। ৬ বার সূরা ফাতিহা পড়লে ৭, ৩২০টি নেকী অর্জন করা যায়। অতএব ১০ মিনিটে পড়া যায় ৬০ × ৭,৩২০ = ৪৩, ৯,২০০ টি নেকী। নবী করীম (সাঃ)-এর অভ্রান্ত কথা অনুযায়ী আমরা মাত্র ১০টি মিনিট ব্যয় করেই ঐ সংখ্যক নেকী অর্জন করতে পারি। আর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইচ্ছে করলে এই নেকীর সংখ্যা যতগুণ খুশী ততগুণ বৃদ্ধি করে দিতে পারেন। সুতরাং আমাদের উচিত হলো, অতি সহজে অর্জন করার মতো নেক কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আখিরাতে আমাদের আমলনামা নেকীতে পরিপূর্ণ করা।

আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষ দুটো আয়াতের ফযিলত

সূরাতুল বাকারা পবিত্র কোরআনের সূরাসমূহের মধ্যে সবথেকে বড় সূরা এবং এটা সেই সূরা, যার মধ্যে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত (আয়াতুল কুরসী) রয়েছে। এই সূরার শেষ দুটো আয়াতের চিরস্থায়ী ফযিলত সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِه فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ وَلَمْ يُفْتَحْ قَطُّ الاَّ الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ اِلَى الْاَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ الاَّ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ اَبْشِرُ بِنُوْرَيْنِ أُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِىٌّ قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا الاَّ اُعْطِيْتَهُ–

"কোনো একদিন হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে বসে ছিলেন। হঠাৎ প্রচন্ড একটি শব্দ শোনা গেলো। হযরত জিবরাঈল (আঃ) নিজের মাথা উঁচু করে বললেন, এটা আকাশের সেই দরজা খোলার শব্দ যা আজকের পূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। উক্ত দরজা দিয়ে একজন ফিরিশ্তা পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন, যিনি ইতোপূর্বে আর কখনো পৃথিবীতে আগমন করেননি। সে ফিরিশ্তা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, আপনার জন্যে দুটো নূরের সুসংবাদ রয়েছে। সূরাতুল ফাতিহা এবং সূরাতুল বাকারার শেষ দুটো আয়াত উক্ত দুটো নূর। যা আপনার পূর্বে অন্য কোনো নবীকে প্রদান করা হয়নি। সূরা ফাতিহা এবং সূরাতুল বাকারার শেষ দুটো আয়াত থেকে একটি অক্ষরও পড়ে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আপনি যা কিছু প্রার্থনা করবেন তা প্রদান করা হবে।" (মুসলিম, হাদীস নং- ৮০৬)

সূরাতুল ফাতিহা এবং সূরাতুল বাকারার শেষ দুটো আয়াতকে 'নূর' হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ দুটো পড়ে মহান আল্লাহর কাছে যা কিছু (বৈধ) চাওয়া হবে তা কবুল করা হবে। সুতরাং আমাদের সকলকে সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ

দুটো আয়াতকে দোয়া কবুলের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

مَنْ قَرَأَ بِا لْآيَتَيْنِ مِنْ اُخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ–

"যে ব্যক্তি রাতে সূরাতুল বাকারার শেষ দুটো আয়াত তিলাওয়াত করবে, এটাই তার জন্যে যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ উক্ত আয়াত সারা রাতে সে ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে পরিণত হবে। উক্ত আয়াত দুটো রাতে শোয়ার পূর্বে তিলাওয়াত করতে হবে।" (বোখারী, হাদীস নং- ৫০০৮)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার আরশে আযীমের নীচে যে ভান্ডার রয়েছে, উক্ত আয়াত দুটো সে ভান্ডারের মধ্যে রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اُعْطِيْتُ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ–

"আমাকে সূরাতুল বাকারার শেষ দুটো আয়াত দেয়া হয়েছে, যা আরশে আযীমের নীচে প্রোথিত জ্যোতির্ময়, শুভ্র চমকদার ভান্ডারের মধ্যে রয়েছে।" (আহ্মাদ, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-১১৮, শুআ'বুল ঈমান, হাদীস নং- ২৪০৪)

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, এটা আমার জানা নেই, উপযুক্ত বয়সের এবং জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন কোনো মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যে, রাতে ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসী এবং সূরাতুল বাকারার শেষ দুটো আয়াত তিলাওয়াত করে না। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৩৫)

পবিত্র কোরআনের উক্ত মহাগুরুত্বপূর্ণ আয়াত দুটো সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (রাহঃ) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন–

وَلاَ يُقْرَءَ انِ فِيْ دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرُبُهَا شَيْطَانٌ–

"যে স্থানে বা যে বাড়িতে পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াত দুটো তিনরাত তিলাওয়াত করা হবে, দুষ্কৃত প্রকৃতির জ্বীন এবং শয়তান সে স্থান বা বাড়ির আশেপাশে আসবে না।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ২৮৮২)

উক্ত দুই আয়াত সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'এ দুটো আয়াত নিজ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দাও, কেননা এ দুটো আয়াত কোরআন এবং দোয়া'। অন্য একটি হাদীসে উক্ত দুটো আয়াতের ফযিলত সম্পর্কে বলা হয়েছে–

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ اٰيَةٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ تُحِبُّ اَنْ تُصِيْبَكَ

وَاُمَّتَكَ؟ قَالَ اٰخَرُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، وَلَمْ يَتْرُكْ خَيْرًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلاَّ اشْتَمَلَكَ عَلَيْهِ–

"এক ব্যক্তি আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি আপনার এবং আপনার উম্মতের (দুনিয়া-আখিরাতের) জন্যে কোন্ আয়াতকে সর্বোত্তম বলে মনে করেন? জবাবে তিনি উক্ত দুটো আয়াতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, দুনিয়া-আখিরাতের সমগ্র খাজানা উক্ত দুই আয়াতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।" (সুনানে দারেমী, হাদীস নং- ৩৩৮০)

হযরত আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَتَمَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ بِاٰيَتَيْنِ اُعْطَا نِيْهِمَامِنْ كَنْزِهِ الَّذِىْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوْ هُنَّ نِسَاءَ كُمْ وَأَبْنَاءَ كُمْ فَانَّهُمَا صَلاَةٌ وَقُرْاٰنٌ وَدُعَاءٌ–

"আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই সূরাতুল বাকারার শেষের দুটো আয়াত আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তাঁর নিজের খাজানা থেকে দিয়েছেন, যা আরশে আযীমের নীচে রয়েছে। এ জন্যে উক্ত আয়াত দুটো তোমরা স্বয়ং, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা দাও। (অর্থাৎ মুখস্থ্ করাও) কেননা এ দুটো আয়াত নামাজের মতো, কোরআনের মতো এবং দোয়া।" (মুস্তাদরাকে হাকেম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৬২, তারগীব, হাদীস নং-২১৬৬)

উল্লেখিত সকল হাদীস থেকে সূরাতুল বাকারার শেষ আয়াত দুটোর গুরুত্ব, মহত্ব, সম্মান-মর্যাদা ও ফযিলত অনুধাবন করা যায়। আমাদের সকলেরই উচিত, উক্ত আয়াত দুটো অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করা। সেই সাথে আয়াত দুটো অর্থ ও ব্যাখ্যাও জেনে নেয়া আবশ্যক। এই আয়াত সম্পর্কে নিজের পরিবার-পরিজন ও ঘনিষ্ঠজনদেরকে অবহিত করা উচিত। উক্ত আয়াত দুটো খুবই ছোট এবং অতি অল্প সময়েই মুখস্থ্ করা যায়, যা নিয়মিত তিলাওয়াতের মাধ্যমে দুনিয়া-আখিরাতের সকল কল্যাণ ও বরকত সহজেই অর্জন করা সম্ভব।

সূরা ইখলাস তিলাওয়াতে বিস্ময়কর ফযিলত

পবিত্র কোরআনের একটি ছোট্ট সূরার নাম সূরাতুল ইখলাস। এই সূরাটির মধ্যে বিশেষভাবে অত্যধিক গুরুত্বের সাথে মহান আল্লাহর একত্ব তথা তাওহীদের বিষয়টি চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হয়েছে বিধায় এই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে 'ইখলাস'। পবিত্র কোরআনের এই সূরাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সূরা। নবী করীম (সাঃ) এই সূরাটির গুরুত্ব সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামকে নানাভাবে বুঝিয়েছেন। তিনি এটা পসন্দ করতেন যে, মুসলমানগণ এই সূরাটির তাৎপর্য অনুভব করুক, সূরাটি বুঝে বেশী বেশী তিলাওয়াত করুক এবং এ সূরাটি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক প্রচার করুক।

কারণ এই সূরাটিতে ইসলামী জীবন বিধানের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস তথা তাওহীদ মাত্র চারটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে অতীব বলিষ্ঠ ভাষা ও ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এই বাক্য কয়টি কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র তা হৃদয়পটে স্থায়ী ও সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে যায় এবং খুবই সহজেই এ সূরাটি মুখস্থ হয়ে যায়। হাদীস গ্রন্থসমূহে বহু সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) নানাভাবে ও পদ্ধতিতে সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন, 'এই সূরাটি এক তৃতীয়াংশ কোরআনের সমান।' (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, আহ্মাদ, তাবারাণী)

মহাগ্রন্থ আল কোরআন মানুষের জন্যে যে জীবন বিধান উপস্থাপন করেছে, তার প্রধান তিনটি আকীদাই এর ভিত্তি। (১) তাওহীদ, (২) রিসালাত ও (৩) আখিরাত। এ সূরাটি যেহেতু নির্ভেজাল ও অকাট্য তাওহীদের আকীদা উপস্থাপন করে, এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) এ সূরাটিকে পবিত্র কোরআনের এক তৃতীয়াংশ বলে অভিহিত করেছেন। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) একজন সাহাবীকে একটি বিশেষ অভিযানে নেতা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। অভিযানে থাকাকালীন সময়ে উক্ত সাহাবী স্থায়ী নিয়ম করে নিয়েছিলেন যে, তিনি প্রত্যেক নামাজেই সূরা ইখলাস পড়ে কিরআত শেষ করতেন। অভিযান থেকে ফিরে আসার পরে তাঁর সাথীরা বিষয়টি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। নবী করীম (সাঃ) উক্ত সাহাবী সম্পর্কে বললেন, 'তাঁকে প্রশ্ন করো, কেনো সে এমন করেছে?' উক্ত সাহাবীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, 'এই সূরায় মহান আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণে এই সূরাটি তিলাওয়াত করতে আমার সবথেকে বেশী ভালোলাগে।' তাঁর এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) বললেন–

أَخْبِرُوْهُ بِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُحِبُّهُ–

"যাও, ঐ লোকটিকে বলো মহান আল্লাহ্ও তাকে পসন্দ করেন, ভালোবাসেন।" (বোখারী, হাদীস নং- ৭৩৭৫)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একজন আনসার সাহাবী কুবা মসজিদে নামাজ আদায় করাচ্ছিলেন। তাঁর নিয়ম ছিলো তিনি প্রত্যেক রাকাআতে প্রথমে সূরা ইখলাস পড়তেন। পরে অন্য কোনো সূরা তিলাওয়াত করতেন। উপস্থিত লোকজন এতে আপত্তি জানিয়ে বললো, 'তুমি এমন করছো কেনো?' সূরা ইখলাস তিলাওয়াতের পর একেই যথেষ্ট মনে না করে আরো অন্য সূরা মিলিয়ে পড়ছো, এটা ঠিক নয়। সূরা ইখলাসই শুধু পড়ো না হয় এ সূরা বাদ দিয়ে অন্য কোনো সূরা পড়ো।' উক্ত লোকটি বললো, 'আমি এই সূরা পাঠ করা বাদ দিতে পারবো না। তোমরা চাইলে আমি নামাজ আদায় করাবো, না হয় আমি ইমামতি ছেড়ে দিবো।' কিন্তু লোকজন তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ইমাম বানানো পসন্দ করলো না। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নবী করীম (সাঃ)-কে জানানো হলে তিনি উক্ত লোকটিকে বললেন, 'তোমার সাথীরা যা চায় তা মেনে নিতে তোমার অসুবিধা কোথায়?' উক্ত ব্যক্তি বিনয়ের সাথে জানালো, 'এই সূরাটিকে আমি অত্যধিক ভালোবাসি।' তাঁর কথা শুনে রাসূল (সাঃ) বললেন, এই সূরাটির প্রতি তোমার এমন ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতের অধিকারী বানিয়েছে। (বোখারী)

এক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

حُبُّكَ اِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ–

"সূরা ইখলাসের প্রতি ভালোবাসাই তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ২৯০১)

এই সূরা এক বার পড়লে পবিত্র কোরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করার সমান সওয়াব পাওয়া যায়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ–

"সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! এই সূরা কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।" (বোখারী, হাদীস নং- ৫০১৩)

আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) فَكَأَنَّمَا قَرَأَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ–

"যে ব্যক্তি সূরাতুল ইখলাস পড়েছে সে পবিত্র কোরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করেছে।" (মুসনাদে আহ্মাদ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪১)

সূরা ইখলাস একবার পড়লে পবিত্র কোরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ার অনুরূপ সওয়াব পাওয়া যায়। তাহলে কোনো ব্যক্তি যদি সূরা ইখলাস তিনবার পড়ে তাহলে সে যেনো সম্পূর্ণ কোরআন পড়লো। সময়ের হিসাবে এ কথা প্রমাণ হয়েছে যে, মাত্র ১ মিনিটেই এই সূরাটি খুবই সহজে ১০/১২ বার পড়া যায়, তাহলে মাত্র ১ মিনিটেই পবিত্র কোরআন ৪ বার খতম দেয়ার সওয়াব অর্জন করা যেতে পারে।

সুতরাং প্রতিদিন কোনো ব্যক্তি যদি মাত্র ১০ মিনিট সময় সূরা ইখলাস পড়ার জন্যে ব্যয় করে, অর্থাৎ ১ মিনিটে ১০ বার পড়া হলে ১০ মিনিটে ১২০ বার পড়া যায়। তাহলে সে ব্যক্তি প্রতিদিন ১২০ বার পবিত্র কোরআন পড়ার সওয়াব অর্জন করতে পারে। একইভাবে কোনো ব্যক্তি যদি প্রত্যেক দিন মাত্র ১০ মিনিট সময় সূরা ইখলাস পড়ার জন্যে ব্যয় করে অর্থাৎ ১০ মিনিটে ১২০ বার সূরা ইখলাস পড়ে, তাহলে ৩০ দিনে অর্থাৎ প্রতি মাসে সে ব্যক্তি ৩,৬০০ বার সূরা ইখলাস পড়লো। হাদীস অনুসারে এর অর্থ দাঁড়ালো, সে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে ৩,৬০০ বার পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করলো।

আর সূরা ইখলাস পড়ার এই ধারাবাহিকতা যদি কোনো ব্যক্তি সারা বছর জারী রাখে, তাহলে সে ব্যক্তি বছরে ৪৩, ২০০ বার সম্পূর্ণ কোরআন তিলাওয়াত করার সওয়াব লাভ করতে পারে। এটা তো শুধু এক বছরের হিসাব, কোনো ব্যক্তি যদি মৃত্যু পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা জারী রাখে তাহলে কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং আমাদের সকলকেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে, আমরা যেনো এই মহান নেক কাজের যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে সক্ষম হই এবং সূরা ইখলাস বার বার তিলাওয়াত করতে থাকি এবং বিনিময়ে অগণিত সওয়াব উপার্জন করি। অধিকবার সূরা ইখলাস তিলাওয়াত সম্পর্কে এ কথাও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, এ সূরার শব্দসমূহ তিলাওয়াত করার সাথে সাথে এর শব্দসমূহের অর্থ, তাৎপর্য, গুরুত্ব ও এ সূরার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করা। এই সূরা মানুষকে কি শিক্ষা দিতে চায়, মানুষের কাছে তাঁর আপন স্রষ্টার পরিচয় কিভাবে তুলে ধরে, মহান আল্লাহ

রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে এ সূরা মানুষকে কি ধারণা দেয়, আল্লাহ তা'য়ালার কোন্ ধরণের গুণ-বৈশিষ্ট্য এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে, তা সঠিকভাবে অনুধাবন করলে এই সূরার প্রতি আমল করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়।

শুধুমাত্র আরবী অক্ষরে এই সূরা তিলাওয়াত করলে সওয়াব উপার্জন করা যাবে, কিন্তু এই সূরার অর্থ, ব্যাখ্যা, তাৎপর্য, গুরুত্ব, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং মূল শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করলে যেমন ঈমানের স্বাদ অনুভব করা যাবে না, তেমনি তাওহীদের প্রতি অটল-অবিচল তথা দৃঢ়পদ থেকে আমল করাও সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয়ত আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, তাহলো সূরা ইখলাস পড়লে পবিত্র কোরআনের এক তৃতীয়াংশ বা সম্পূর্ণ কোরআন তিলাওয়াত করার সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, সম্পূর্ণ কোরআন তিলাওয়াত না করে শুধুমাত্র সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করাকেই যথেষ্ট মনে করতে হবে। সূরা ইখলাস পড়ার সাথে সাথে পবিত্র কোরআনও একটু একটু করে তিলাওয়াত করতে হবে এবং এভাবে সম্পূর্ণ কোরআন তিলাওয়াত শেষ করতে হবে। শুধু আরবী ভাষাতেই নয়, আরবী তিলাওয়াতের পাশাপাশি মাতৃভাষায় পবিত্র কোরআনের তাফসীরও অধ্যয়ন করলে কোরআনের ওপর আমল করা খুবই সহজ হয়ে যাবে।

ছোট্ট একটি কালেমার ধারণাতীত ফযিলত

কালেমা তাওহীদ নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক নামাজ শেষে পড়তেন। মাত্র চার, পাঁচ অথবা দশ মিনিট বা এরও কম সময় ব্যয় করে এই কালেমা ১০ বার অথবা ১০০ বার পড়া যেতে পারে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড বা কয়েক মিনিটে অগণিত সওয়াব অর্জন এবং বিশাল বিনিময় লাভ করা সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তা ঈমানদারদের জন্যে এক মহাসৌভাগ্য ও বিরাট সুসংবাদ। কেননা আমাদের পরম প্রিয় নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لَاإِلٰـهَ إِلاَّ اللّٰـهُ وَحْـدَهُ لَاشَرِيْـكَ لَـهُ –لَهُ الْـمُـلْكُ وَلَـهُ الْحَـمْـدُ
يُـحْـيِى وَيُـمِـيْتُ، وَهُـوَ عَلٰى كُلِّ شَـيْءٍ قَـدِيْـرٌ–

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্দু ইউহ্য়ি ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদির।

"আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, জীবন-মৃত্যুর ফায়সালা কেবলমাত্র তাঁরই নিয়ন্ত্রণে, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"

যে ব্যক্তি এই কালেমা মাগরিবের নামাজের পরে দশ বার পড়বে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার জন্যে অস্ত্রে সজ্জিত ফিরিশ্তা প্রেরণ করবেন। উক্ত ফিরিশ্তা সকাল পর্যন্ত সে ব্যক্তিকে শয়তানের আক্রমণ থেকে হেফাজত করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তির আমলনামায় দশটি নেকী লেখাবেন, দশটি গোনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন এবং দশজন মুসলিম গোলাম মুক্ত করার মতো বিপুল বিনিময় ও সওয়াব দান করবেন। (তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৫৩৪)

এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, দশ বার যে ব্যক্তি এই কালেমা পড়বে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্যে সাতটি সম্মান বৃদ্ধি করে দিবেন। হাদীসে বলা হয়েছে–

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ –لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، أُعْطِىَ بِهِنَّ سَبْعًا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهِنَّ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَاعَنْهُ بِهِنَّ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكُنَّ لَهُ عَدلَ عَشْرِ نَسَمَاتٍ وَكُنَّ لَهُ حَافِظًا مِنَ الشَّيْطَانِ وَحِرْزًا مِنَ الْمَكْرُوْهِ وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِىْ ذَالِكَ الْيَوْمِ ذَنْبٌ الاَّ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ–وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ أُعْطِىَ مِثْلَ ذَالِكَ لَيْلَتَهُ–

"যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের পরে এই কালেমা কমপক্ষে দশবার পড়বে তাকে সাত ধরণের সম্মানে সম্মানিত করবেন।

(১) আল্লাহ্ তা'য়ালা তার জন্যে দশটি নেকী লিখিয়ে দিবেন

(২) দশটি গোনাহ্ মুছে দিবেন

(৩) দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন

(৪) দশটি গোলাম মুক্ত করার সমান সওয়াব দান করবেন

(৫) শয়তান থেকে তাকে হেফাজত করবেন

(৬) নানা ধরণের বিপদ, মুসিবত ও ক্ষতি থেকে হেফাজত করবেন

(৭) শিরক্ ব্যতীত সেদিনের অন্য গোনাহের জন্য তাকে গ্রেফতার করা হবে না যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পরে এই কালেমা দশবার পড়বে, সে ব্যক্তিকে সারা রাত অনুরূপ বিপুল সওয়াবে ভূষিত করা হবে।" (জামেউ'য যাওয়াদে, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১১১, তারগীব, হাদীস নং- ৬৬৬)

কালেমা

لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ -لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্দু বি ইয়াদিহীল খাইরু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদির।

মুসাফাহ্ করার ফযিলত

ইসলাম মুসলমানদের প্রতি আদেশ দিয়েছে যে, যখন তাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ ঘটবে তখন যেনো একে অপরের শান্তি-নিরাপত্তার জন্যে দোয়া করে এ কথা বলবে, 'আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।' নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَاتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى أَمْرٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ-

"মহান আল্লাহর শপথ, যার মুষ্ঠিতে আমার প্রাণ! ততক্ষণ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা মুমিন হবে। তোমরা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষন না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন পথের সন্ধান দিবো না, যার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? সে পথ হলো তোমাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সালামের আদান-প্রদান করা।" (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৫১৯৩)

কোনো এক সময় তিনি সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে প্রশ্নবোধক স্বরে বললেন, সবথেকে উত্তম ইসলাম কোন্‌টি? তিনি নিজেই জানিয়ে দিলেন–

تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ–

"অন্যকে খাদ্য খাওয়ানো এবং পরিচিত- অপরিচিত সকলকেই সালাম জানানো।" (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৫১৯৪, বোখারী, হাদীস নং- ২৬৩৬, ২৮, ১২, মুসলিম, হাদীস নং- ৩৯)

নবী করীম (সাঃ) সালামের সূচনাকারীকে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৫১৯৭)

সালামের সাথে সাথে এই আমলকেও সুন্নাত হিসেবে ঘোষণা করেছেন যে, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ করলেই তারা যেনো মুসাফাহ্ করে। অর্থাৎ দুইজন যেনো পরস্পরের সাথে হাত মিলায়। সালাম ও মুসাফাহ্র মধ্যে বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। এর মধ্যে একটি কল্যাণ হলো, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে, পরস্পরের হৃদয় থেকে কলুষ-কালিমা, দুঃখ-বেদনা মুছে যায়, আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ ও বরকত অবতীর্ণ হতে থাকে এবং শান্তি-স্বস্তি ও নিরাপত্তা পাওয়া যায়।

এটাও সহজলভ্য ও সহজসাধ্য নেকীর কাজ। এই কাজে খুবই সাধারণ সময় ব্যয় হয় কিন্তু এর বিনিময়ে সীমাহীন সওয়াব অর্জন করা যায়। একজন যখন অন্যজনের হাত ধরে মুসাফাহ্ করে, যতক্ষণ তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের জন্যে পুরস্কারের ধারাবাহিকতা জারী থাকে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ اِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا–

"দুইজন মুসলমান যখন পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে মুসাফাহ্ করে এবং একে অপরের সাথে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ২৭২৭, আবু দাউদ, হাদীস নং- ৫২১২)

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ফযিলত

আকারে ছোট এবং খুবই সহজ নেকীর মধ্যে ঐ নেকী সম্পর্কে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বর্ণনা করা হয়েছে, যা মানুষের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। এসব নেক কাজের আঞ্জাম দেয়ার ব্যাপারে বড় ধরণের সুসংবাদ এবং বিনিময়ে সীমাহীন সওয়াব প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়েছে। এসব সুসংবাদ এবং অঙ্গীকারের কথা শুনে মুমিনদের অন্তরে আকাঙ্খা সৃষ্টি হয় সব সময়ই যেনো এসব নেকীর কাজ করি এবং এ কাজকেই জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়ে নিই।

আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি যে, এটা মানুষের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত এবং ইসলামে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বেশী। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর আরশে আযীমের মতো সবথেকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান জায়গায় আত্মীয়তার বন্ধনকে স্থান দিয়েছেন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَلرَّحِمُ مَعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللّٰهُ–

"আত্মীয়তার বন্ধনকে আল্লাহ্ তা'য়ালা আরশের সাথে সংযুক্ত করেছেন। এই বন্ধন বলতে থাকে যে ব্যক্তি আমাকে অটুট রাখে আল্লাহ্ তা'য়ালাও তার সাথে বন্ধন অটুট রাখেন। আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করে আল্লাহ তা'য়ালাও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।" (বোখারী, হাদীস নং- ৫৯৮৯, মুসলিম, হাদীস নং- ২৫৫৫)

হাদীসে কুদ্সীতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَنَا اللّٰهُ وَاَنَا الرَّحْمٰنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اِسْمِيْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ–

"আমিই আল্লাহ এবং আমি দয়ালু, আমিই আত্মীয়তার বন্ধনকে সৃষ্টি করেছি। আত্মীয়তার বন্ধনকে আমি নিজের রহমান (দয়ালু) নাম থেকে নির্গত করেছি। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধনকে অটুট রাখবে আমিও তাকে অটুট রাখবো। আর যে ব্যক্তি একে বিচ্ছিন্ন করবে আমিও তাকে বিচ্ছিন্ন করবো।" (আবু দাউদ, হাদীস নং- ১৬৯৪, তিরমিযী, হাদীস নং- ১৯০৭)

বোখারী হাদীসে আরেক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে–

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ وَيُنْسَاَلَهُ فِي اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ–

"যে ব্যক্তি এটা চায় যে, তার রিয্ক-এ বরকত হোক এবং তাঁর হায়াতেও বরকত হোক, সে যেনো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।" (বোখারী, হাদীস নং- ৫৯৮৬, মুসলিম, হাদীস নং- ২৫৫৭)

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُمَدَّ لَهٗ فِىْ عُمُرِهٖ وَيُوَسَّعَ لَهٗ فِىْ رِزْقِهٖ وَيُدْفَعَ عَنْهُ مَيْتَةَ السُّوْءِ، فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ –

"যে ব্যক্তি এটা চায় যে, তার জীবনকালে বরকত হোক এবং তার রিয্ক-এ আধিক্য ও প্রশস্ততা আসুক এবং তার শেষ অবস্থা যেনো খারাপ না হয়, তাহলে তার উচিত আল্লাহ্ভীরুতা অর্জন করা এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা।" (জামিউয যাওয়ায়েদ, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১০৩, আহ্মাদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২২, তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং- ৩৬৯৭)

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার অর্থ হলো, আমরা আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলবো। তাদের কাছে আসা-যাওয়া ও তাদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করবো, যদিও বা তারা আমাদের সাথে অশোভনীয় আচরণ করে। এটার নাম আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা নয় যে, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এবং ঘনিষ্ঠজন বা বংশের কেউ যদি ভালো ব্যবহার করে তাহলে আমরাও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবো। একে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা বলে না একে বলে বিনিময়।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা একেই বলে যে, প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়-স্বজন যদি খারাপ বা ভালো যেমন ব্যবহারই করুক না কেনো, আমাদেরকে সকল অবস্থাতেই তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, এক ব্যক্তি আবেদন করলো, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি আমার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে ইচ্ছুক। কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় এবং খারাপ ব্যবহার করে।' জবাবে নবী করীম (সাঃ) ঐ ব্যক্তিকে বললেন–

اِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَايَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ–

"তুমি যেমনটি বলছো, এমনই যদি হয় তাহলে তুমিই এর ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করলে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলবে, ততক্ষণ তোমার সাথে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী (ফিরিশ্তা) থাকবে।" (মুসলিম, হাদীস নং- ২৫৫৮)

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলার কারণে জীবন, ধন-সম্পদ ও রিয্ক-এ বরকত হয় এবং এ সম্পর্ক অটুট রাখলেই সমাজ ও দেশ সমৃদ্ধ হয়। বর্তমানে আমরা যদি

আমাদের জীবনে সকল মুসলমান পরস্পরে অসন্তুষ্টি, শত্রুতা, মতানৈক্য ও অনৈক্যের প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পরস্পর পরস্পরের ভাই হয়ে হৃদয় থেকে মান-অভিমান, হিংসা-বিদ্বেষ দূর করি, আত্মীয়-স্বজন ও বংশের লোকজন একে অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ ভুল-ক্রটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখি, একে অপরের কাছে যাতায়াতের সূচনা করি, তাহলে এর ফলশ্রুতিতে দেখা যাবে কিভাবে আকাশ থেকে বরকত আর রহমত নাযিল হচ্ছে। যমীন কিভাবে তার অভ্যন্তরের সম্পদসমূহ উদগীরণ করে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করছে।

আমাদের পরস্পরের মধ্যেকার মতানৈক্য, শত্রুতা, অনৈক্য ও হিংসা-বিদ্বেষই বর্তমানে আমাদের সকল অশান্তি ও হতাশার মূল কারণ। কোনো এক ঘটনা উপলক্ষ্যে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, কোনো মুসলমানের পক্ষেই এটা জায়েয নয় যে, তিন দিনের অধিক সে তার অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবে। (মুসলিম, হাদীস নং- ২৫৬০)

আরেক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে-

تُعْرَضُ الاَعْمَالُ فِىْ كُلِّ اِثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ فَيَغْفِرُ اللّٰهُ لِكُلِّ امْرِىءٍ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْءًا اِلاَّ امْرَءًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيَقُوْلُ اُتْرُكُوا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا-

"প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে মানুষের কর্ম মহান আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা যাকে খুশী ক্ষমা করে দেন শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে শির্ক করেছে এবং ঐ দুইজন লোক, যারা একে অপরের প্রতি অসন্তুষ্ট। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, ঐ দুইজনকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ তারা পরস্পরের অসন্তুষ্টি দূর করে একে অপরের প্রতি প্রসন্ন না হয়।" (মুসলিম, হাদীস নং- ২৫৬৫)

আরেক হাদীসে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ-

"কোনো মুসলমানের জন্যে এটা জায়েয নয় যে, সে তার অন্য ভাইয়ের প্রতি তিন দিনের অধিক অসন্তুষ্ট থাকবে। যে ব্যক্তি তিনদিনের অধিক অসন্তুষ্ট থাকবে এবং এ অবস্থায় যদি সে ইন্তেকাল করে তাহলে সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৪৯১৪)

মুসলমানদের মধ্যে ঐ মুসলমানকে উত্তম বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অসন্তুষ্টি দূর করে সর্বপ্রথমে সম্পর্ক স্থাপন করে। এই ব্যক্তি সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) তাঁর পবিত্র বরকতময় জবানে সুসংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি অসন্তুষ্টি দূর করার লক্ষ্যে প্রথমে প্রচেষ্টা চালাবে এবং স্বয়ং গিয়ে অন্য ভাইয়ের অসন্তুষ্টি দূর করবে, এমন ব্যক্তি মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকটতম বান্দাহ্ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'য়ালা অনুক্ষণ তার প্রতি ধারাবাহিকভাবে অনুরাগের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা সম্পর্কিত যে ফযিলতের কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে তা একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন। আমরা এখানে দুটো হাদীস দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করছি।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَيُعَمِّرُ بِالْقَوْمِ الدِّيَارَ وَيُثَمِّرُ لَهُمُ الْاَمْوَالَ وَمَا نَظَرَ اِلَيْهِمْ مُنْذُ خَلَقَهُمْ بُغْضًا لَهُمْ قِيْلَ، وَكَيْفَ ذَاكَ يَاَ رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ بِصِلَتِهِمْ اَرْحَا مَهُمْ-

"হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন যে, অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা কতিপয় জনবসতিকে বরকত ও সমৃদ্ধি দান করেন, যদিও আল্লাহ উক্ত জনবসতি সমূহের প্রতি এতটাই অসন্তুষ্ট থাকেন যে, তাদের সৃষ্টিলগ্ন থেকে কখনো তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি। তবুও আল্লাহ তাদের প্রাণ, ধন-সম্পদে বিপুল সমৃদ্ধি দান করেন। আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার কারণেই তাদের প্রতি এই সীমাহীন দান।" (মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫২, তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং- ৩৭০২)

اِنَّ اَعْجَلَ الْبِرِّ ثَوَابًا لَصِلَةُ الرَّحِمِ حَتّٰى اِنَّ اَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُوْنُوْنَ فَجَرَةً فَتَنْمُوْا أَموَا لُهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ اذَا تَوَا صَلُوْا-

"অবশ্যই অতি দ্রুত যে নেকীর বিনিময় পাওয়া যায়, তাহলো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। যদিও কিছু সংখ্যক মানুষ সীমালংঘনকারী ও পাপাচারী হয়ে থাকে। কিন্তু এরপরেও তাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদে প্রাচুর্যতা আসে শুধুমাত্র তাদের আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার কারণে।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ২৫১১, আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৯০২, ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং- ৪২১১)

সহীহ্ ইবনে হাব্বানের আরেক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে–

وَمَا مِنْ اَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَا صَلُوْنَ فَيَحْتَاجُوْنَ–

"যে পরিবার আত্মীয়তার বন্ধনকে প্রাধান্য দেয়, সে পরিবার কখনো অন্যের মুখাপেক্ষী হয় না।" (ইবনে হাব্বান, হাদীস নং- ২০৩৮)

আসুন! আজ আমরা অঙ্গীকার করি, আমরা সকলেই ঐ হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি যে, আমরা আমাদের জীবন থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও শত্রুতা নামক দুষ্টক্ষত থেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন হয়ে আমাদের দোয়া ও কাজকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে কবুলের যোগ্য করবো। এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, আত্মীয় স্বজনের কাছে সবসময় যাতায়াত করতে হবে। অনেকের পক্ষে এটা সম্ভবও নয়, কারণ জীবিকার অন্বেষণে বর্তমানে মানুষ এমনই ব্যস্ত থাকে যে, তাদের পক্ষে সকল আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় না।

বরং আত্মীয়-স্বজনের জন্যে দোয়া করা, তাদের কুশলাদি জানা ও সালাম বিনিময় করেও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা যায়। বর্তমান যুগে টেলিফোনসহ যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম রয়েছে। এগুলো ব্যবহার করেও সকলের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা যেতে পারে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

بُلُّوْا اَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِا لسَّلَامِ–

"শুধুমাত্র সালাম বিনিময়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে পারো।" (জামেউস্ সাগীর, হাদীস নং- ২৮৩৮)

উল্লেখিত হাদীস আমাদের জন্যে ঐ গুরুত্বপূর্ণ নেকী অর্জনের পথকে অধিক সহজ করে দিয়েছে। যদি কোনো কারণ বশত আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে কমপক্ষে টেলিফোন করে বা মোবাইলে সংবাদ পাঠিয়েও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা যেতে পারে।

পরস্পরের মনোমালিন্য দূর করার ফযিলত

মানুষের ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, সম্মান-মর্যাদা, নাম-যশ, খ্যাতি ও পরিচিতি যত বেশী বৃদ্ধি পায়, সে মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্যের পরিধিও ততই বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষণপূর্বে যে মানুষটির নাম-পরিচয় তার পরিবার ও ঘনিষ্ঠজন ব্যতীত আর কেউ-ই জানতো না, তখন তার দায়িত্ব-কর্তব্যের সীমাও ছিলো নির্দিষ্ট একটি গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ; সেই মানুষটিই যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রে আসীন হয়, তখন

তার দায়িত্ব-কর্তব্যের বিস্তৃতি দেশের গন্ডী অতিক্রম করে যায়। কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে একজন মানুষকে বহু সংখ্যক মানুষের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হয়। ফলে কেউ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে আবার কেউ অসন্তুষ্ট থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে কারো কারো সাথে মানুষের সম্পর্কের অবনতিও ঘটে।

পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, ভাইবোনদের মধ্যে, অংশীদারের মধ্যে, প্রতিবেশীর সাথে, সহকর্মী বা বন্ধুদের সাথে মনোমালিন্য হলে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। একশ্রেণীর ধুরন্ধর লোক রয়েছে, যারা কারো সাথে কারো সম্পর্কের অবনতিকে পূজি করে ঘৃণ্য ফায়দা লুটে এবং সম্পর্কের অবনতিকে দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে অপচেষ্টা চালাতে থাকে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ।

মুসলিম সমাজে পরস্পরের মধ্যে দ্বীনি ও সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখা খুব বড় নেকীর কাজ এবং পরস্পরের মধ্যে অসন্তুষ্টি বিরাজ করা ও সম্পর্কের অবনতি ঘটানো অত্যন্ত গোনাহের কাজ। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের সকল আমল প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার মহান আল্লাহর সম্মুখে পেশ করা হয়। কিন্তু যে দুইজন মুসলমানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে, তিন দিনের অধিক যদি তাদের মধ্যে সেই একই অবস্থা বিরাজ করে এবং পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি না হয়, তাহলে তাদের আমল আল্লাহর সম্মুখে পেশ করতে নিষেধ করা হয়। (মুসলিম, হাদীস নং-২৫৬৫)

এই হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, মুসলমান যদি পরস্পরের প্রতি তিনদিনের অধিক অসন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তাদের কোনো নেক আমল মহান আল্লাহর সম্মুখে পেশ করা হয় না। এ জন্যে পরস্পরের মধ্য থেকে শত্রুতা ও সন্তুষ্টি দূর করে দেয়া বড় নেকীর কাজ। মুসলমানদের মধ্যে যদি ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সন্তুষ্টি ও সম্প্রীতি না থাকে তাহলে শয়তান সেখানে সুযোগ গ্রহণ করে। আর শয়তানকে সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে অবশ্যই গোনাহ্গার হতে হবে। সুতরাং শয়তানকে কোনো ধরণের সুযোগ না দিয়ে পরস্পরের মধ্য থেকে অসন্তুষ্টি দূর করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

মুসলমানদের মধ্য থেকে অনৈক্য দূর করা ও পরস্পরের মধ্যে দৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করা এবং একের সাথে অন্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজার রাখার বিষয়টির ওপর নবী করীম (সাঃ) খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একদিন তিনি জামায়াতে নামাজে দেরী করে শামিল হলেন। দেরীর কারণ হিসেবে তিনি জানালেন, মুসলমানদের দুটো দলের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিলো এবং তিনি তাদের মনোমালিন্য দূর করে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন। এ কারণে জামায়াতে শামিল হতে তাঁর দেরী হয়েছে। (বোখারী, হাদীস নং-৬৮৪, মুসলিম, হাদীস নং-৪২১)

ইমাম বদর উদ্দীন আইনী (রাহঃ) উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করে দেয়া, পরস্পরের মধ্য থেকে দাঙ্গা, ফাসাদ-ফিতনা, শত্রুতা এবং অসন্তুষ্টি দূর করে দেয়া, পরস্পরের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় করা এবং সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার বিরাট ফযিলতের বিষয়টিই উক্ত হাদীস থেকে অনুমান করা যায়। শুধু তাই নয়, উক্ত হাদীসে যে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেই ঘটনার আলোকে এ কথা প্রমাণ হয় যে, সালিসকারী, মীমাংসাকারী, ইমাম, খতীব এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দকে মুসলমানদের পরস্পরের সমস্যা দূর করার জন্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার লক্ষ্যে নিজেকেই বিবাদমান দলের কাছে যেতে হবে। মানুষের মধ্য থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, অসন্তুষ্টি, ফিতনা-ফাসাদ দূর করা নেতৃত্বের তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ফিতনা-ফাসাদ দূর করার বিষয়টি নেতৃত্বের তুলনায় অনেক বেশী উত্তম। (উমদাতুল কারী, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৯০)

মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি, সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ব, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি এবং মনোমালিন্য দূর করতে গিয়ে ফরজ নামাজের জামায়াতে আসতে দেরী করার বিষয়টিই আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, পরস্পরের মধ্য থেকে শত্রুতা দূর করে দেয়ার কাজটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে অনৈক্য মানুষকে, সমাজকে এবং দেশকে অবনতির দিকেই নিয়ে যায় এবং ঐক্যই ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন করে।

মুসলিম সমাজে যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে, সেই সকল আলেম-ওলামা, মাদ্রাসা শিক্ষক, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যবসায়ী এবং পেশাজীবী সকলকেই নিজ এলাকার মানুষদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে এবং এই কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেকীর কাজ। সেই সাথে দেশের রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে দূরত্ব রয়েছে, তা নিরসনে সত্যিকার অর্থে বুদ্ধিজীবীসহ সকলকেই আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যে এই নেকীর কাজটি করা অত্যন্ত জরুরী। এ ব্যাপারে যারা প্রচেষ্টা চালাবেন, নিঃসন্দেহে তাদের আমলনামা নেকীতে পরিপূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ–

“আমি কি তোমাদেরকে ঐ নেকীর কথা বলবো না, যা রোজা, নামাজ, দান-সাদকার থেকেও উত্তম? সে নেকীর কাজ হলো, পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটলে তা দূর করে দেয়া।” (তিরমিযী, হাদীস নং-২৫০৯)

মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিলে মহান আল্লাহর রহমত অবতীর্ণের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আর তাদের মধ্যে ঐক্য বজায় থাকলে যমীন ও আকাশের বরকতের দুয়ার খুলে দেয়া হয়। এ জন্যে মুসলিম নারী-পুরুষ সকলকেই এই প্রচেষ্টা চালাতে হবে যে, পরস্পরের মধ্যে, দুই পরিবারের মধ্যে, দুটো এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে যদি মনোমালিন্য দেখা দেয়, তা দ্রুত নিরসন করে সকলের মধ্যে সৌহার্দ-সম্প্রীতি স্থাপন করে দেয়া। এ কাজটি অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের নেকীর কাজ এবং এই নেক কাজের বিনিময় স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা প্রদান করবেন।

অন্যের কল্যাণ করা আল্লাহকে খুশী করার মাধ্যম

অন্যের সাথে উত্তম আচরণ করা এবং অন্যের কল্যাণে আসা অনেক বড় নেকীর কাজ। নবী করীম (সাঃ) বিতির নামাজে যে দোয়া করতেন তার মধ্যে এই বাক্যটি সংযোজন করতেন–

اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ اِخْوَةٌ–

"আমি ঐ কথার প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, সকল মানুষই একজন আরেক জনের ভাই।" (আবু দাউদ, হাদীস নং- ১৫০৮)

ইসলাম পৃথিবীর মানুষের কাছে একটি মহাকল্যণকর মানবতাবাদী জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আগমন করেছে। ইসলামের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও যাবতীয় মূলনীতি অত্যন্ত উদার, মানবতাবাদী ও ইনসাফপূর্ণ। আর ঠিক এ কারণেই ইসলাম পৃথিবীর সকল মানুষকে 'ভাই'-এর বন্ধনে আবদ্ধ হবার নির্দেশ দিয়েছে। সকলের সাথে সাম্য-মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপনে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। এ ক্ষেত্রে কে কোন্ ধর্মের বা আদর্শের অনুসারী, সেদিকে দৃষ্টি দেয়া হয়নি। বরং সকল মানুষকেই মানবতাবাদের উদার দৃষ্টি ভঙ্গি অবলম্বন করে পরস্পরের কল্যাণে নিবেদিত হতে অনুপ্রাণিত করেছে।

সাধারণ এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের সাথে আদর্শিক বন্ধন যখন যোগ হয়, তখন উক্ত সাধারণ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন পরিবর্তিত হয়ে বিশেষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে রূপান্তরিত হয়। আর সেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের নাম ঈমানী বন্ধন অর্থাৎ ইসলামের অনুসারী হবার কারণে সাধারণ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের সাথে আরেকটি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন যোগ হয়ে তা সুদৃঢ় বন্ধনে পরিবর্তিত হয়। নবী করীম (সাঃ) এ জন্যেই বলেছেন–

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ–

"এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই।" (বোখারী, হাদীস নং- ৬০৬৪)

পবিত্র কোরআনেও ঠিক অনুরূপ কথাই বলা হয়েছে–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ–

"নিশ্চয়ই ঈমাদারগণ পরস্পর ভাই।" (সূরাতুল হুজরাতঃ ১০)

এটাই সেই মানবতাবাদী ও ঈমানী ভ্রাতৃত্ব যা প্রত্যেক মুসলমানকে তাদের সমগ্র জীবনকালকে মানুষের কল্যাণে নিবেদিত করতে এবং সকল সৃষ্টির প্রতি সেবাধর্মী আচরণ করতে উৎসাহিত করেছে। নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি যখন সর্বপ্রথম অহী অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর কাছে নিজের অস্থিরতা প্রকাশ করলেন। হযরত খাদিজা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর মধ্য থেকে অস্থিরতা দূর করার লক্ষ্যে এমন সাতটি বাক্যের সমন্বয়ে নিজের স্বামীকে সান্ত্বনা দিলেন, যে সাতটি বাক্যের মধ্যে দিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর জীবনের পরিপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

বলা-বাহুল্য, যে সাতটি গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে হযরত খাদিজা (রাঃ) নিজ স্বামীকে আশ্বস্ত করলেন, সে সাতটি গুণ-বৈশিষ্ট্যই সমগ্র মানবতা ও সকল সৃষ্টির অধিকারের সাথে সম্পর্কিত এবং সকল মানুষসহ্ সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদিত। হযরত খাদিজা (রাঃ) এ কথা বলে সান্ত্বনা দেননি যে, আপনি রাত জেগে নামাজ আদায়কারী, প্রায় সারা বছরই রোজা পালনকারী, অধিক পরিমাণে তাসবীহ্ তাহ্লীলকারী, আপনি রুকু-সিজ্দায় অধিক সময় দানকারী, অধিক পরিমাণে মহান আল্লাহর যিক্রকারী, অর্থাৎ তিনি মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ না করে সকল সৃষ্টি ও মানুষের সাথে সম্পর্কিত গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করলেন।

হেরা পর্বতের গুহায় যখন প্রথম হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে নবী করীম (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ ঘটলো, রাসূল (সাঃ) ঘটনার আকস্মিকতায় মানবীয় দুর্বলতার কারণে ভয়ে-আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে বাড়িতে ফিরে এসে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'আমাকে ঢেকে দাও, আমি ভয় অনুভব করছি।' তিনি তাঁকে অভয় দিয়ে আশ্বস্ত করে বললেন, 'অসম্ভব! আল্লাহ্ আপনাকে কিছুতেই অসম্মানিত করবেন না এবং আপনার প্রশংসা-খ্যাতির যথোচিত প্রচার-প্রসার না ঘটিয়ে আপনাকে পৃথিবী থেকে উঠিয়েও নিবেন না। কারণ মানবতার চরমোৎকর্ষের যে মূল সাতটি গুণ-বৈশিষ্ট্য তা সবই আপনার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আপনি আত্মীয়তার অধিকার আদায়কারী, সর্বাবস্থায় আপনি সত্যাশ্রয়ী, পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী আমানতদার, অনাথ ইয়াতিম বিধবা প্রতিবন্ধীদের ভার বহনকারী, অভাবগ্রস্ত

উপার্জনে অক্ষম লোকদের উপার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণে সদাসচেষ্ট, অতিথিদের প্রতি যত্নবান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় দুঃস্থ মানুষের নিকটতম বন্ধু ও সাহায্যকারী। (বোখারী, হাদীস নং- ৪৯৫৩)

উল্লেখিত যে কয়টি মহৎ গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা হলো, তা ছিলো মহান আল্লাহর হক আদায়ের পরেই নবী করীম (সাঃ)-এর সমগ্র চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং পৃথিবীতে তাঁর সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। এ সকল কার্যক্রম তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশেই নিজে যেমন বাস্তবায়ন করেছেন, তেমনি সকল মুসলিম নারী-পুরুষকে এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল (সাঃ)-এর চারিত্রিক এই অপূর্ব গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর সমগ্র আদর্শ সকল মানুষের জন্যে একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে পবিত্র কোরআনের সূরা আহযাবের ২১ নং আয়াতেও আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন।

সহজসাধ্য নেকীসমূহের মধ্যে উল্লেখিত নেকীর কাজ তথা মানবতা ও সকল সৃষ্টির কল্যাণে প্রচেষ্টা চালানোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজ প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষদের জন্যেই একান্তভাবে করণীয়। কারণ মুসলমান তো ঐ ব্যক্তি, যার জিহ্বা, হাত তথা তার সকল কর্মতৎপরতাই অন্যের কল্যাণে নিবেদিত থাকে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَحَبُّ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ أَنْفَعُهُمْ، وَاَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُوْرٌ تُدْخِلُهُ عَلٰى مُسْلِمٍ، اَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، اَوْتَقْضِىْ عَنْهُ دَيْنًا، اَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوْعًا، وَلَاَنْ اَمْشِىَ مَعَ اَخِى الْمُسْلِمِ فِى حَاجَةٍ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَعْتَكِفَ فِىْ الْمَسْجِدِ شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ يُمْضِيْهِ اَمْضَاهُ مَلَاَ اللّٰهُ قَلْبَهُ رِضًى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَشٰى مَعَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فِى حَاجَتِهٖ حَتّٰى يُثْبِتَهَا لَهُ اَثْبَتَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الاَقْدَامُ وَاِنَّ سُوْءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ، (وفى رواية) لَاَنْ يَمْشِىَ اَحَدُكُمْ

مَعَ اَخِيْهِ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِهٖ اَفْضَلُ مِنْ اَنْ يَعْتَكِفَ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا شَهْرَيْنِ–

"সমগ্র মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই মহান আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়, যে ব্যক্তি সবথেকে বেশী মানুষের কল্যাণ সাধন করে। আল্লাহর কাছে সর্বাধিক পসন্দনীয় নেকীর কাজ হলো, তুমি কোনো মুসলমানের জীবনে আনন্দের বন্যা বইয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে এবং অন্যের বিপদ বা অকল্যাণ দূর করার চেষ্টা করবে, ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্ত করার প্রচেষ্টা চালাবে, অন্যের ক্ষুধা দূর করার চেষ্টা করবে। আর আমি অন্য মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে কিছুক্ষণ সঙ্গ দেয়াকে পূর্ণ মাস মসজিদে অবস্থান করে ইতেকাফ করার তুলনায় অনেক বেশী কল্যাণকর মনে করি। যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ দমন করতে সক্ষম হয়েছে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার দোষক্রটি গোপন রাখবেন, আর যে ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকার পরও ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ্ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন উক্ত ব্যক্তির হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিবেন। যে ব্যক্তি অন্য মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে তার সাথে পথ অতিক্রম করে, আল্লাহ্ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিকে পা পিছলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে হেফাজত করে তার পদদ্বয়কে দৃঢ় রাখবেন। নিকৃষ্ট স্বভাব-চরিত্র সমগ্র নেকীকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমনভাবে সিরকা (টক জাতীয় ঝোল বিশেষ) মধুকে বিনষ্ট করে। আরেক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে তার সাথে পথ অতিক্রম করে, তার এ কাজ আমার মসজিদে (মদীনায় মসজিদে নববী) দুই মাস ইতেকাফ করার তুলনায় অধিক উত্তম।" (জামেউ'স সাগীর লিল আলবানী, হাদীস নং- ১৭৬, মুস্তাদরাকে হাকেম, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭০)

অন্যের কল্যাণ সাধন করা এবং অন্যের সেবাযত্নে নিজেকে নিয়োজিত রাখা এত বড় ইবাদাত যে, অন্য মুসলমানের কল্যাণ সাধন ও সেবাযত্নে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, সেই ব্যক্তির সকল কাজ আঞ্জাম দেয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা করে দেন। এর থেকে বড় সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা তার যাবতীয় কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করে দেন! বাস্তবে বিষয়টি এমনই ঘটে, যখন এক মুসলিম আরেক মুসলিমের কল্যাণ সাধন ও তার সেবাযত্নের লক্ষ্যে নিজেকে নিয়েজিত রাখে। এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে, সাধ্যানুযায়ী মানুষসহ প্রাণীসমূহের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করলে মহান আল্লাহ কি পরিমাণ সন্তুষ্ট হন এবং এই নেকীর কাজের মূল্য কত অপরিসীম। নবী করীম (সাঃ) বলেন–

وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ أَخِيْهِ–

"আল্লাহ তা'য়ালা ঐ বান্দার সকল কাজ সম্পাদন করে দেন, যে বান্দা তার অন্য ভাইয়ের কাজে সহযোগিতা করে।" (মুসলিম, হাদীস নং- ২৬৯৯)

ক্ষমা ও উদারতা দেখানোর ফযিলত

ঈমান আনার পরে সবথেকে বড় সম্পদ হলো মহান আল্লাহ তা'য়ালার অসীম গুণ-বৈশিষ্ট্যের ওপর নিশ্চিত বিশ্বাস ও নির্ভরতা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও নবী করীম (সাঃ) যা কিছুই বলেছেন, তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করাই সব থেকে বড় সফলতা এবং ঈমানের উচ্চ পর্যায়ে উপনীত হওয়া। মহান মালিকের অসীম গুণ-বৈশিষ্ট্যের ওপর নিশ্চিত নির্ভরতা ও বিশ্বাস স্থাপনের পরে সবথেকে বড় সম্পদ হলো ক্ষমা ও ঔদার্য্য।

নবী করীম (সাঃ) তাঁর আপন চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণের ভান্ডারের চাবি সম্পর্কিত দোয়া শিখিয়ে বলেছিনে, যদি দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও ঔদার্য্য লাভ করা যায়, তাহলে আপনি কল্যাণ লাভ করেছেন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

فَاِذَا أُعْطِيْتَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَ أُعْطِيْتَهَا فِى الْاٰخِرَةِ فَقَدْ اَفْلَحْتَ–

"যদি আপনি দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও উদারতা পেয়ে যান তাহলে আপনি সফলতা অর্জন করলেন।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৫১২)

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, নিশ্চিত বিশ্বাস ও নির্ভরতার পরে সবথেকে বড় নিয়ামত হলো ক্ষমা ও ঔদার্য্য। তিনি বলেছেন–

فَاِنَّ اَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ–

"অবশ্যই! যে কোনো লোকের জন্যেই নিশ্চিত বিশ্বাস ও নির্ভরতার পরে ক্ষমা এবং ঔদার্য্যের পরে সর্বোত্তম আর কিছুই নেই।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৫৫৮)

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে গ্রহণ-বর্জনের ফযিলত

পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই এমন ধরণের কিছু কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবগত বিষয়। এগুলো পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন। মহান

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে অভ্যাস ও স্বভাবগত বিষয় পরিত্যাগ করা এক পরীক্ষা ও কোরবানী বিশেষ এবং হৃদয়-মন চাইবে না, তবুও একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে ত্যাগ করতে হবে।

এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা করা বা নিজের গুণ-বৈশিষ্ট্যে পরিণত করা অথবা নিজের অভ্যাস ও স্বভাবের নিয়ন্ত্রণে আনা নিজের জন্য কষ্টকর বা বোঝা মনে হতে পারে। কিন্তু এসব বিষয়কে মহান আল্লাহর নির্দেশ, নবী করীম (সাঃ)-এর ফায়সালা ও সুন্নাত মনে করে পালন করতে হবে। পবিত্র কোরআন এই বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছে–

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ–

"তোমরা কখনো যথার্থ নেকী অর্জন করতে পারবে না, যতোক্ষণ না তোমরা তোমাদের ভালোবাসার জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৯২)

আমাদের মধ্যে অসংখ্য মুসলমানের স্বভাব ও অভ্যাসে এমন বহু কাজ-কথা রয়েছে যা গোনাহ্ ও নাফরমানীর অন্তর্গত। এসব কথা ও অভ্যাস পরিত্যাগ করা আমাদের জন্যে ওয়াজিব এবং একান্ত আবশ্যক। যে ব্যক্তি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের স্বভাব-চরিত্র ও কথা-কাজ থেকে গোনাহ্ এবং নাফরমানীমূলক কাজ পরিত্যাগ করে, মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খুশী হয়ে সেই বান্দাকে দুনিয়া-আখিরাতে উত্তম বিনিময় দান করেন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَا تَرَكَ عَبْدٌ لِلّٰهِ اَمْرًا لَايَتْرُكُهُ الاَّ لِلّٰهِ الاَّ عَوَّضَهُ اللّٰهُ مِنْهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُ فِىْ دِيْنِهٖ وَدُنْيَاهُ–

"যে বান্দা কোনো কাজ শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ তা'য়ালা এর পরিবর্তে দুনিয়া-আখিরাতে তাকে উত্তম বিনিময় দান করেন।" (ফায়যুল কাদীর, হাদীস নং-৭৮৭০)

যদি আমরা আল্লাহ: জন্য কোনো কাজ করি এবং নিজের অভ্যাস ও স্বভাবে নিহিত অথবা নিজের প্রিয় কোনো কাজ, যা গোনাহের মধ্যে শামিল– তা যদি পরিত্যাগ করি, আল্লাহর জন্যে যে কোনো ধরণের ত্যাগ স্বীকার করি, তাহলে মহান আল্লাহ অবশ্যই আমাদের এই কোরবানীর উত্তম বিনিময় দুনিয়া-আখিরাতে দান করবেন।

মানুষকে ভালো কাজ থেকে বিরত রাখার সবথেকে বড় মাধ্যম হলো মানুষের নফস বা মানুষের অভ্যন্তরের কুপ্রবৃত্তি। যে কোনো নেকীর কাজ করতে গেলেই নিজের

নফসের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই করতে হয়। এভাবে নফসের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে করতে নফস যে অবস্থায় নিপতিত হয় সে অবস্থার বিষয়টি ইসলামী চিন্তাবিদগণ তিনভাগে বিভক্ত করে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথম অবস্থা হলো, সুক্ষ্মভাবে ঈমান বিনষ্টকারী মুনাফেকী ধ্যান-ধারণা এবং সলফে সালেহীনদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মের বিপরীত বাতিল আকিদা-বিশ্বাস থেকে মানুষ নিজেকে হেফাজত করতে পারে।

দ্বিতীয় অবস্থা হলো, বিপদ মুহূর্তে নফস যখন কোনো গোনাহ্ করার আকাংখা মনে সৃষ্টি করে দেয়, তখনই স্মরণে আসে– 'আমাকে মহান আল্লাহর সম্মুখে হিসাব দিতে হবে' আর এর ওপর ভিত্তি করেই সে গোনাহ্র কাজ পরিত্যাগ করে।

তৃতীয় উচ্চ পর্যায়ের অবস্থা হলো, অধিক পরিমাণে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা ও নফসের সাথে সংগ্রাম করার ফলে নফস এমন পবিত্র পর্যায়ে উপনীত হয় যে, নফসের মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর প্রতারণা করার শক্তি আর অবশিষ্ট থাকে না, যে শক্তি মানুষকে শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত করে। নবী করীম (সাঃ) তিনটি ভয়ঙ্কর গোনাহ্ সম্পর্কে বলেছেন, যা মানুষকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। উক্ত তিনটি গোনাহের মধ্যে একটি হলো–

هَوًى مُتَّبَعٌ–

"সেই প্রতারক নফস, যার অন্ধ অনুকরণ করা হয়।" (আল বায্যার, হাদীস নং- ৬০৫৯, সহীহ্ আল জামে, হাদীস নং- ৩০৪৫)

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন–

أَمَّا طُوْلُ الأَمَلِ فَيُنْسِى الأخِرَةَ وَأَمَّا اِتِّبَاعُ الْهَوٰى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ–

"বড় বড় কামনা-বাসনা মানুষকে আখিরাত সম্পর্কে অমনোযোগী করে দেয়, প্রবৃত্তির অনুসরণই মানুষকে সত্য-সঠিক পথে চলতে বাধার সৃষ্টি করে।" (ফাযায়েলে সাহাবাহ্ লিল ইমাম আহ্মাদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৩০)

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী (রাহঃ) বলেছেন, নফসের অভিলাষই হলো সকল গোনাহের ভিত্তি, যা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। (জামেউ'ল উ'লুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা- ৩৬৬)

আল্লাহ এবং নবী করীম (সাঃ)-এর নির্দেশ, পসন্দ-অপসন্দকে সকল কিছুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়াই মুসলমানের ঈমানের দাবী। কিন্তু প্রতারক নফসের শক্তি যদি প্রবল হয়, তখন নফসের অবৈধ কামনা-বাসনা আল্লাহ-রাসূলের নির্দেশের ওপর বিজয়ী হয়।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমন একটি নফস বা শক্তি রয়েছে, যা প্রতি মুহূর্তে মানুষকে অন্যায়ের পথে, খারাপ পথে তথা পাপ ও দুষ্কৃতির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহ-উদ্দিপনা দিতে থাকে। এই শক্তিকে বা নফসকে 'নফসে আম্মারা' বলা হয়। নফসে আম্মারাই মানুষকে অপরাধ জগতের দিকে অগ্রসর করিয়ে থাকে।

মানব প্রকৃতিতে আরেকটি শক্তি বা নফস রয়েছে, যা মানুষের মধ্যে অনুশোচনা বা অনুতাপ সৃষ্টি করে। মানুষ যদি খারাপ চিন্তা করে, অপরাধ বা পাপ করে, অন্যায় কাজ করে, গর্হিত কাজ মানুষের দ্বারায় সংঘটিত হয়, তখন তার ভেতরে যে লজ্জা, অনুতাপ, অনুশোচনা সৃষ্টি হয়, বিবেকের দংশনে দংশিত হতে থাকে, ভেতর থেকে তাকে তিরস্কার করতে থাকে, দৃষ্টি দিয়ে অনুশোচনার অশ্রু ঝরায় এই শক্তিকে বা নফসকে সূরা আল কিয়ামাহ্-এর দ্বিতীয় আয়াতে 'নফসে লাউয়ামাহ্' বলা হয়েছে। এই নফসে লাউয়ামাহ্ যার ভেতরে প্রবল শক্তিশালী, তার দ্বারা কোনো অসতর্ক মুহূর্তে অপরাধ সংঘটিত হলেই সে ব্যক্তি সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ে চোখের পানিতে সিজদার স্থান ভিজিয়ে বারবার তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে থাকে।

সকল মানুষের মধ্যেই 'নফসে লাউয়ামাহ্' রয়েছে। আপাদ-মস্তক নোংরামীতে লিপ্ত থাকার কারণে এই 'নফসে লাউয়ামাহ্' দুর্বল হয়ে পড়ে। তবুও সে সত্যকে কখনো মিথ্যা এবং মিথ্যাকে কখনো সত্য বলে স্বীকৃতি দেয় না। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজেকে নিজেই খুব ভালোভাবে জানে সে কে, কি ও কেমন।

মানুষের মধ্যে আরো একটি নফস রয়েছে, যাকে পবিত্র কোরআনে 'নফসে মুতমায়িন্নাহ্' বলা হয়েছে। আল্লাহকে সিজ্দা দিয়ে, তাঁর বিধান পালন এবং সৎ ও ন্যায় কাজ করে, তাঁর বিধানের বিপরীত পথ ও মত থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পেরে মানসিক প্রশান্তি অনুভব করে, মনে ভাষায় ব্যক্ত করতে না পারা তৃপ্তি অনুভব করে এবং নিজেকে আল্লাহর গোলাম হিসাবে ভাবতে ভালো লাগে, দ্বীনি আন্দোলনের পথে ত্যাগ করে, কোরবানী দিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করে, এটার নামই হলো 'নফসে মুত্মায়িন্নাহ্'। প্রত্যেক মুসলমানকেই 'নফসে আম্মারা'-কে পরাজিত করতে হবে এবং 'নফসে লাউয়ামাহ্'-কে প্রবল শক্তিশালী করতে হবে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই 'নফসে মুতমায়িন্নাহ্'-অর্জন করা যাবে। নফস-এর প্রথম রূপকে পরাজিত করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপকে শক্তিশালী করতে ব্যর্থ হলে কোনোক্রমেই

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে না। আর আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে যে ব্যক্তি ব্যর্থ হবে, তার পক্ষে কল্যাণ লাভ ও সফলতা অর্জন কখনোই সম্ভব হবে না।

যে ব্যক্তি নিজের ভেতরের সত্তাকে তথা নফস্‌কে যাবতীয় খারাপ প্রবণতা থেকে মুক্ত রাখবে, খারাপ প্রবণতা তথা 'নফসে আম্মারা'-কে দমন করে 'নফসে লাউয়ামাহ্ ও নফসে মুতমায়িন্নাহ্'-কে উন্নত করবে, এর উৎকর্ষতা বিধান করে তাকওয়ার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত করবে এবং ক্রমশঃ এর শক্তি বৃদ্ধি করবে, সে অবশ্যই কল্যাণ লাভ ও সফলতা অর্জন করবে। নফসে আম্মারাকে দমন ও নফসে লাউয়ামাহ্ এবং নফসে মুতমায়িন্নাহ্-এর শক্তি বৃদ্ধির জন্য নিজেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে উৎসর্গ করতে হবে, কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করাকে নিজের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত করতে হবে।

তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা দূর করার ফযিলত

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হক আদায় করার সাথে সাথে অন্যান্য মানুষের হক আদায় করা ওয়াজিব এবং একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টিসমূহের সাথে উত্তম আচরণ করা প্রকাশ্য দিক থেকে সাধারণ কাজ হলেও এটা অত্যন্ত মূল্যবান নেকী ও অসীম সওয়াবের কাজ। সে সৃষ্টি মানুষ হোক, জীব-জানোয়ার হোক বা মানুষের মধ্যে মুসলিম বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী যে-ই হোক না কেনো। নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীর সাথে উত্তম আচরণ করার মাধ্যমে নেকী অর্জনের তাগিদ দিয়ে বলেছেন–

فِىْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ–

"প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীর সাথে (উত্তম আচরণ করলে) বিপুল বিনিময় রয়েছে।" (বোখারী, হাদীস নং- ২৩৬৩)

আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ أَجْرٌ–

"প্রাণসম্পন্ন সকল প্রাণীর সাথে (সদয় ব্যবহার করলে) প্রচুর সওয়াব রয়েছে।" (ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং- ৩৬৮৬, ইবনে হাব্বান, হাদীস নং- ৫৪৩)

ঐ সকল ব্যক্তি যারা নিজের গবাদী পশু যেমন ঘোড়া, গাভী, মোষ, ছাগল, গাধা ইত্যাদির সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে, তাদের প্রয়োজনের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে,

সময় মতো খাদ্য-পানীয় দেয়, ঠান্ডা-গরমে কষ্ট পায় কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখে, পশুগুলোর শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে, এসব লোকের জন্যে বিপুল বিনিময় রয়েছে। আর যেসব লোক পশু-প্রাণীর ওপর জুলুম করে, তাদেরকে কষ্ট দেয়, বেঁধে রেখে যথাসময়ে খাদ্য-পানীয় দেয় না, অন্যায়ভাবে মারধর করে, ঠান্ডা-গরমে প্রাণীগুলো কষ্ট পাচ্ছে কি না সেদিকে দৃষ্ট দেয় না, প্রাণীর সাথে এ ধরণের আচরণ হারাম এবং কবীরা গোনাহ্। এ ধরণের নিকৃষ্ট কাজের শাস্তি তারা অবশ্যই লাভ করবে।

বনী ইসরাঈলীদের এক চরিত্রহীনা নারী সম্পর্কে বলা হয়েছে, ঐ চরিত্রহীনা নারী একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে ছিলো, এ জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা খুশী হয়ে তাকে পুরস্কার দিয়েছিলেন। ঐ নারীর জীবনে সকল গোনাহ্ ক্ষমা করে দিয়ে তাকে মাগফিরাত দান করেছিলেন। কুকুরের মতো নিম্নস্তরের একটি প্রাণীর সাথে ভালো ব্যবহার করার কারণে যদি আল্লাহ তা'য়ালা খুশী হয়ে জীবনের সকল গোনাহ্ ক্ষমা করে দিয়ে এত বিশাল-বিপুল বিনিময় দান করেন, তাহলে ঐ সকল মানুষ যারা মানুষের সেবাযত্ন তথা জনকল্যাণমূলক কাজ করে, সকলের সাথে উত্তম আচরণ করে, তাহলে অবশ্যই সে অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে। আর সবথেকে বড় পাওয়া হলো, মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হন।

বনী ইসরাঈলী ঐ ভ্রষ্টা নারী সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ اِذْ رَاَتْهُ بَغِىٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَغُفِرَ لَهَا–

"একটি কূয়ার পাশে তৃষ্ণার্ত একটি কুকুর মুমূর্ষ অবস্থায় উপনীত হয়েছিলো। হঠাৎ বনী ইসরাঈলীদের একজন ভ্রষ্টা নারী তৃষ্ণার্ত সেই কুকুরটিকে দেখে নিজের পায়ের মোজা খুলে (চামড়া নির্মিত মোজা) কূয়ায় নেমে মোজা ভর্তি পানি তুলে কুকুরটিকে পান করালো। এই নেক কাজের জন্যে ঐ মহিলাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।" (বোখারী, হাদীস নং- ৩৪৬৭)

দয়া, অনুগ্রহ, মায়া-মমতা, ঔদার্যতা ও উদারতা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ النَّبِىُّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ (ابوداؤد ، ترمذى)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা দয়ালু, দয়াময় আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন। পৃথিবীর লোকদের প্রতি তোমরা দয়া করো, তাহলে আকাশ হতে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (আবু দাউদ, তিরমিযী-১৬)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টির প্রতি যে কোনোভাবে দয়া, মায়া-মমতা, অনুগ্রহ, উত্তম আচরণ, উদারতা ও ঔদার্য্যতা প্রদর্শন করার কাজ খুবই পসন্দ করেন। সুতরাং আমাদের সকলকেই এই ধরণের উত্তম কাজ করা উচিত।

বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফযিলত

বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী শরীয়াতে বিয়ের ব্যাপারে কোথাও একে ফরজ কোথাও বা একে ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বিয়েকে নিজের সুন্নাত হিসেবে ঘোষণা করে বলেছেন–

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ–

"বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আমার নিয়ম।" (বোখারী, হাদীস নং- ৫০৬৩, মুসলিম, হাদীস নং- ১৪০১)

বিয়ের উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র করা। বিয়ের মাধ্যমে শুধু দুটো হৃদয়ই একত্রে মিশে যায় না, বরং দুটো পরিবার ও দুটো বংশ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এবং বছরব্যাপী চলতে থাকা শত্রুতার অবসান ঘটে। নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক বিভিন্ন গোত্র এবং বংশে বিয়ে করার উদ্দেশ্য এটাই ছিলো। বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবার ব্যাপারে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এবং নবী করীম (সাঃ) মানুষকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ–

"নারীদের মধ্য থেকে তোমাদের যাদের ভালো লাগে তাদের দুইজন, তিনজন বা চারজনকে বিয়ে করে নাও।" (সূরা নেসা-৩)

বিয়ের ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ)-ও উৎসাহিত করে বলেছেন–

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَانَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرَجِ-

"হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবার সামর্থ রয়েছে, তারা বিয়ে করো। কারণ বিয়ের মাধ্যমে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পবিত্রতা অর্জনের জন্যে উপযোগীতা রয়েছে।" (বোখারী, হাদীস নং- ৫০৬৬, মুসলিম, হাদীস নং- ১৪০০)

যথাযথ নিয়মে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবার মধ্যে যেমন বিরাট কল্যাণ রয়েছে তেমনি রয়েছে অগণিত নেকী। বিয়ের ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করাও আমলে সালেহ্ তথা সৎকাজের অন্তর্গত। এ কারণে বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'বংশে বা এলাকার মধ্যে নর-নারী পরস্পরের জন্যে উপযুক্ত হলে তাদেরকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করে দাও।' রাসূল (সাঃ) এ ব্যাপারে সুপারিশ করে বলেছেন-

اِنَّ مِنْ اَشْرَقِ السُّرَاقِ مَنْ يَسْرِقُ لِسَانَ الاَمِيْرِ وَاَنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْخَطَا يَامَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍ وَاِنَّ مِنَ الْحَسَنَاتِ عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاِنَّ مِنْ تَمَامِ عِيَادَتِهِ اَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَيْهِ وَتَسْئَلَهُ كَيْفَ هُوَ؟ وَاِنَّ مِنْ اَفْضَلِ الشَّفَا عَاتِ اَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فِيْ نِكَاحٍ حَتَّى تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَاِنَّ مِنْ لُبْسَةِ الأَنْبِيَاءِ الْقَمِيْصُ قَبْلَ السَّرَاوِيْلِ وَاِنَّ مِمَّا لَيُسْتَجَابُ بِهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ الْعُطَاسُ-

"চোরদের মধ্যে সবথেকে বড় চোর হলো যে নির্দেশদাতার কথা চুরি করে, গোনাহ্গারদের মধ্যে সবথেকে বড় গোনাহ্গার হলো সেই ব্যক্তি, মুসলমানদের সম্পদ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে। আর নেকীর মধ্যে বড় নেকী হলো রোগীর সেবাযত্ন করা, আর পরিপূর্ণ সেবাযত্ন হলো রোগীর শরীরে হাত রেখে জানতে চাওয়া 'তুমি কেমন আছো'। আর সুপারিশের মধ্যে উত্তম সুপারিশ হলো, দুইজনের বিয়ের ব্যাপারে তুমি অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে উভয়কে বিয়ের

বন্ধনে আবদ্ধ করে দাও। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) পায়জামা পরিধানের পূর্বে জামা পরিধান করতেন এবং হাঁচি দেয়ার পরে অবশ্যই দোয়া কবুল হয়।" (ফয়যুল কাদীর, হাদীস নং- ২৪৭৩)

এ হাদীসে কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর মধ্যে প্রথম বিষয় হলো, সবথেকে বড় চোর হলো ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি সরকারী নির্দেশ দাতার কথা চুরি করে। অর্থাৎ বৈধ-অবৈধের ব্যাপারে সরকারী অফিসার, মুখপাত্র, নির্দেশদাতা, পৃষ্ঠপোষক বা সাক্ষী হিসেবে যারা ভূমিকা পালন করে তারা যে কথা বলেননি, এমন কথা তাদের নামে চালিয়ে দেয়া অর্থাৎ প্রকৃত সত্য গোপন করা।

দ্বিতীয় বিষয়ে বলা হয়েছে, কোনো মুসলমানের চোখের পানি ঝরিয়ে, তাকে বঞ্চিত করে অন্যায়ভাবে তার সম্পদ আত্মসাৎ করা বড় ধরণের গোনাহ্। ইমাম মুসলিম (রাহঃ) এ ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন–

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهٖ فَقَدْ أَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ وَاِنْ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ–

"যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের হক আত্মসাৎ করেছে, আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি জাহান্নাম ওয়াজিব ও জান্নাত হারাম করে দেন। এক ব্যক্তি জানতে চাইলো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! যদি তা নিতান্তই সাধারণ জিনিস হয়? নবী করীম (সাঃ) বললেন, তা আরাক (পিলু) গাছের একটি সামান্য শাখাও হোক না কোনো।" (মুসলিম, হাদীস নং- ১৩৭)

সকলকেই এ বিষয়টির প্রতি হৃদয়-মন দিয়ে ভাবতে হবে, যারা মিথ্যে ওয়াদা ও শপথ করে, অবৈধভাবে, শক্তি প্রয়োগ করে, নানা ধরণের ছল-চাতুরী ও কৌশলের মাধ্যমে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করে, রাজনৈতিক ও বংশীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করে অন্যের জায়গা-জমি দখল করে এবং এসব অবৈধ অর্থ-সম্পদ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে, তাদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

এই হাদীস শরীফে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেয়া হয়েছে, যা রোগীর সাথে সম্পর্কিত। রোগী, যারা অন্যের সাহায্য-সহনুভূতির মুখাপেক্ষী থাকে, তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, দয়া-মায়া ও সহানুভূতির বাহু বিছিয়ে দেয়া এবং তাদের

দেখা-শোনা করার মধ্যে বিরাট কল্যাণ রয়েছে। রোগীর সেবার ধরণ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, রোগীর মাথা, কপাল ও হাতের ওপর হাত রেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া, সমবেদনা ও সহানুভূতি জানিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়া।

আরেকটি মহৎ কর্ম ও বড় ধরণের নেক আমলের প্রতি এই হাদীসে ইশারা করে বলা হয়েছে, নিজের খান্দান বা এলাকায় বিয়ের উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী থাকলে তাদেরকে উপযুক্ত স্থানে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়ার জন্যে আনন্দিত চিত্তে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আমাদের সমাজ জীবনে এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে, আমাদের সন্তান-সন্ততিকে ইসলামী রীতি-পদ্ধতিতে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সমাজে যে যুগ সঞ্চিত দুষ্টক্ষত 'যৌতুক' প্রথা রয়েছে তা উৎখাত করতে হবে এবং এ ব্যাপারে দৃঢ়চেতা কিছু লোককে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

উল্লেখিত হাদীসে আরেকটি বিষয় বলা হয়েছে যে, সকল নবী-রাসূলগণের (আঃ) পোশাক পরিবর্তনের নিয়ম ছিলো, তাঁরা লুঙ্গি বা পায়জামা খোলার পূর্বে শরীরে জামা (লম্বা জামা) রাখতেন। এতে করে যথাযথভাবে লজ্জাস্থানের পর্দা করা হতো। এর আরেকটি কারণ হলো, নবী-রাসূলগণ (আঃ) সর্বাধিক লজ্জাশীল ছিলেন এবং তাঁরা নির্জনেও মহান আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে লজ্জানুভব করতেন। এ কারণে তাঁরা অনাবৃত দেহে থাকতেন না। লম্বা ও ঢিলেঢালা জামা-ই বস্ত্রে আবৃত লজ্জাস্থান দৃষ্টি গোচর বা পরিস্ফুটিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। হাদীসে আরেকটি বিষয়ের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, হাঁচি দেয়ার পরে মহান আল্লাহর যে প্রশংসা করা হয় এবং যে দোয়া পড়া হয়; তা কবুল করা হয়।

বৃক্ষ রোপন করার ফযিলত

মুসলমানদের এটাই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হওয়া প্রয়োজন যে, তারা পৃথিবীর জীবনে মানুষসহ সকল প্রাণীর প্রতি সর্বোত্তম আচরণ করবে এবং নিজের অনুপম চারিত্রিক গুণাবলীর মাধ্যমে অন্যের কল্যাণ সাধন করবে। শুধুমাত্র নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত, তাসবীহ্ তাহলীলের মধ্যে নিজেকে মগ্ন রাখা এবং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি সম্পর্কে উদাসীনতার পরিচয় দেয়ার নাম ইবাদাত নয়। নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত, তাসবীহ্-তাহলীল ইত্যাদি মানুষকে দুনিয়া-আখিরাতের বৃহৎ কল্যাণ অর্জনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এসব থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত বাস্তবায়ন করতে হবে, তাহলেই যথাযথ ইবাদাতের হক আদায় করা হবে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, মুসলিম জনগোষ্ঠী নিজেকে, নিজের পরিবারকে, নিজের এলাকা, রাস্তা-পথ তথা চলাফেরা ও বসবাসের স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে এবং এভাবে নিজেরসহ অন্যের কল্যাণ সাধন করবে। নির্মল বাতাস ও ছায়ার জন্যে বৃক্ষ রোপণ করবে, এসব বৃক্ষ থেকে শুধু মানুষই কল্যাণ লাভ করে না, ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ অসংখ্য প্রাণীও এসব বৃক্ষ থেকে উপকার লাভ করে। এসব বৃক্ষে পিপিলীকার থেকেও ক্ষুদ্র প্রাণী বাসা বাঁধে, পাখী নিজের বাসস্থান গড়ে তোলে, এর ফলমুল আহার করে, ছায়া লাভ করে, সেই সাথে মানুষ পায় নির্মল বাতাস। এই কাজের মাধ্যমে একদিকে যেমন সমাজ ও দেশের প্রতি বিরাট দায়িত্ব পালন করা হয়, সেই সাথে এই মহৎ কাজ অনেক বড় নেকীর কাজ। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা আমলনামা পরিপূর্ণ করে এ কাজের বিনিময় দান করবেন।

বৃক্ষ রোপণ করা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, এটা সাদকায়ে জারিয়ার কাজ। কেউ যদি একটি বৃক্ষ রোপণ করে আর সেই বৃক্ষ থেকে পৃথিবী এবং পৃথিবীর যে সকল প্রাণী যতদিন পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করবে, সেই ব্যক্তির আমলনামায় ততদিন পর্যন্ত নেকী জমা হতে থাকবে এমনকি কবরে গিয়েও সে ব্যক্তি সওয়াব অর্জন করতে থাকবে। বৃক্ষের ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ প্রত্যেকটি অংশই মহান আল্লাহর তাসবীহ্ করতে থাকবে। বৃক্ষ রোপণকারীর আমালনামায় সেই সওয়াব জমা হতে থাকে।

সুতরাং বৃক্ষ কর্তন নয়, প্রয়োজনে বৃক্ষ কর্তনের পূর্বে আরেকটি বৃক্ষ রোপণ করতে হবে। বনভূমির ভক্ষক নয়– রক্ষক হতে হবে। বৃক্ষ কর্তন তথা বনভূমি উজার করার মাধ্যমে পরিবেশ বিপন্ন করে এবং অসংখ্য অগণিত প্রাণীর বাসস্থান ধ্বংস করে অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ার অর্থই হলো জাহান্নামে নিজের বাসস্থান নির্ধারিত করা। এ জন্যে প্রত্যেকেরই উচিত নিজের জায়গায় হোক, অন্যের জায়গায় হোক বা পথের ধারেই হোক বৃক্ষ রোপণ করা। যাদের বাড়ির ছাদে জায়গা রয়েছে, সেখানেও পরিকল্পিতভাবে সবুজের সমারোহ ঘটানো যেতে পারে।

এটা গেলো দুনিয়ার কথা, এবার জান্নাতে বৃক্ষ রোপণের উপায় সম্পর্কে কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করছি। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ قَالَ "سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ" غُرِسَتْ لَهٗ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ–

"যে ব্যক্তি বলেছে, 'সুবহানাল্লাহিল আযিমি ওয়া বিহাম্‌দিহী'। সে ব্যক্তির জন্যে জান্নাতে একটি খেজুর বৃক্ষ রোপণ করা হয়।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৪৬৪)

আরেকটি ঘটনা উপলক্ষ্যে তাসবীহ্, তাহ্মীদ ও তাকবীর এর সমন্বয়ে গঠিত বাক্য সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ يُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ كَلِمَةٍ مِنْهَا شَجَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ–

"সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করার বিনিময়ে তোমাদের জন্যে জান্নাতে বৃক্ষ রোপণ করা হয়।" (জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং- ২৬১৩)

হযরত নূহ (আঃ) নিজ সন্তানকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি তাসবীহ্ পড়ার উপদেশও দিয়েছিলেন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَأُوْصِيكَ بِسُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْخَلْقِ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ–

"আমি তোমাদের প্রতি অসিয়াত করছি, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহী' পড়তে থাকো, কারণ এ বাক্যটি সমগ্র সৃষ্টির দোয়া ও নামাজ এবং এরই কারণে সমগ্র প্রাণীকুলকে রিয্ক প্রদান করা হয়।" (আল আদাবুল মুফরাদ লিল বোখারী, হাদীস নং- ৫৪৮, আহ্মাদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭০)

সুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আল্লাহু আকবার, এগুলো শুধুমাত্র তাসবীহ্ বা যিক্র-ই নয়, বরং এগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ দোয়াও। কারণ সমগ্র সৃষ্টি এসব তাস্বীহ সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে জারী রেখেছে এবং এরই বরকতে তাদেরকে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা অফুরন্ত রিয্ক প্রদান করেন। একমাত্র মানুষই রিয্ক এর জন্যে হয়রান-পেরেশান থাকে, কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনো একটি প্রাণীও রিযুক এর জন্যে হয়রান-পেরেশান হয় না। উক্ত তাসবীহ্র বিনিময়ে মহান আল্লাহ সকল প্রাণীকে অফুরন্ত রিয্ক দান করেন। সুতরাং যে সকল মানুষকে রিয্ক-এর জন্যে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করতে হয় তাদের উচিত, উক্ত তাসবীহ্ অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করা।

আযানের পরে দোয়া করার ফযিলত

পৃথিবীতে যে সকল স্থানে মুসলমান রয়েছে, সেখানেই পরিবেশ অনুকুল হলে দিনরাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মুয়ায্যীন পাঁচবার মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, একত্ব এবং নবী করীম (সাঃ)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য অত্যন্ত উচ্চ নিনাদে ঘোষণা করে এবং

মানুষকে নামাজের প্রতি আহ্বান জানায়। মুসলমানদের মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তি কতই না ভাগ্যবান, যারা আযান শোনার সাথে সাথে নিজের সব কাজকর্ম পরিহার ও ব্যস্ততা থেকে অবসর নিয়ে মহান মালিকের সন্তুষ্টি এবং নিজের কল্যাণের জন্যে দ্রুত মসজিদের দিকে ছুটে আসে। তারাই তো মহাসৌভাগ্যবান যাদের হৃদয়-মন বাঁধা থাকে মসজিদের সাথে এবং আযান শোনার সাথে সাথে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের জন্যে মসজিদে এসে আল্লাহর তা'য়ালার সম্মুখে দুই হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে এ কথার প্রমাণ দেয় যে, প্রকৃত অর্থেই তারা মহান মালিকের গোলাম।

আযান শোনার সাথে সাথে আযানের প্রত্যেক বাক্যের জবাব দেয়া সুন্নাত এবং খুবই নেকীর কাজ। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা মুয়ায্যীনের আযান শুনবে তখন মুয়ায্যীন যেসব বাক্য বলে তোমরাও অনুরূপ বাক্য বলবে। মুয়ায্যীন যখন 'হাই-ইয়া আলাস্ সালাহ্' ও হাই-ইয়া আলাল ফালাহ্' বলবে তখন তোমরা 'লা হাওলা ওয়া লা কুউ-ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' বলবে। (বোখারী, হাদীস নং- ৬১১, মুসলিম, হাদীস নং- ৩৮৪, আবু দাউদ, হাদীস নং- ৫২৩, তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৬১৪)

আযানের জবাব দানকারী সম্পর্কে হাদীসে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هٰذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ–

"যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মুয়ায্যীনের আযানের জবাব দিয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মাজমাউ'য যাওয়ায়েদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৩)

আযানের জবাব দেয়া যেমন উচ্চ পর্যায়ের নেকীর কাজ তেমনি আযানের পরে দোয়া কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَاِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ–

"মুমিন বান্দারা যেমন বলে তুমিও তাদের অনুরূপ বলো। যখন আযান সমাপ্ত হয় তখন আল্লাহর কাছে চাইতে থাকো, যা কিছু চাইবে (বৈধ) তাই তোমাকে দেয়া হবে।" (আবু দাউদ, হাদীস নং- ৫২৪, ইবনে হাব্বান, হাদীস নং- ১৬৯৩)

নেক কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ফযিলত

সবসময় অর্জন করার মতো সাধারণ নেকীর কাজও কখনো কখনো বড় নেকীর তুলনায় উত্তম হয়। আমরা যদি ইসলামের আরকানসমূহ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে সেই অটল বাস্তবতা উপলব্ধি

করা যায় যে, প্রত্যেক ইবাদাতই চিরন্তন, চলমান ও স্থায়ী যা সবসময়ই জারী রয়েছে। ফরজ নামাজসমূহের পূর্বে ও পরে সুন্নাতে মুয়াক্কাদার অস্তিত্ব, এরপরে নফলের ফযিলত সেই চিরন্তন ধারাবাহিকতার কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আবার যাকাত ছাড়াও রয়েছে দান-খয়রাতের ধারাবাহিকতা, রমজান মাসের ফরজ রোজার পরেও রয়েছে প্রতি মাসের প্রত্যেক সপ্তাহে ও মাসে নফল রোজা রাখার ব্যবস্থা, হজ্জ আদায়ের পরেও রয়েছে ওমরাহ্ ও তাওয়াফ করে সওয়াব অর্জনের চিরন্তন ধারাবাহিকতা।

ইবাদাতের ধারাবাহিকতার উদ্দেশ্যই এটাই যে, ফরজ ও ওয়াজিব পালন করার সাথে সাথে নফলকে নেকী অর্জনের উপকরণ বানানো হয়েছে। নেকী অর্জনের যে ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করা হয়েছে তা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, এসব কিছুই যথেষ্ট নয়। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল কাজের যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো তা এক বছরকাল আদায় করার পরে আত্মতৃপ্তি লাভ করা যে, অনেক করেছি আর প্রয়োজন নেই, বিষয়টি এমন নয়। বরং পৃথিবীতে জীবিত থাকা পর্যন্ত এসব ইবাদাতের ধারাবাহিকতা জারী রাখতে হবে আর একেই স্থায়ী বা চিরন্তন ইবাদাত বলে। মুসলমান নিজের সমগ্র জীবনকালে আল্লাহর ফরজ নির্দেশ পালন করেও একে যথেষ্ট বলে মনে করে না বিধায় নফল ইবাদাতের ধারাবাহিকতা জারী রাখে।

আমরা যতই নেক বা উত্তম কাজ করি না কেনো এ প্রচেষ্টা থাকতে হবে যে, জীবনকালে এই কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিচ্ছিন্ন বড় আমল থেকে ধারাবাহিক ছোট আমল শ্রেয়। যার ধারাবাহিকতা সবসময় বজায় রাখা যায় এমন ধরণের ছোট ছোট নেকীর কাজ ঐসব বড় নেকীর কাজের তুলনায় অনেক উত্তম, যে বড় নেকীর কাজ মাঝে মধ্যে করা হয়। নবী করীম (সাঃ)-এর প্রত্যেক নেকীর কাজই ছিলো চিরন্তন। অর্থাৎ তিনি সকল নেকীর কাজে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেন।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) ঐসব আমল সর্বাধিক পসন্দ করতেন যার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়। অর্থাৎ জীবনকালের প্রত্যেক সময় যে কাজগুলো করা যায় তাই তিনি পসন্দ করতেন। আরেক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) ঐ সকল আমল সর্বাধিক পসন্দ করতেন যা বান্দাহ্ সবসময় করতে পারে। যদিও সে আমল খুবই ছোট এবং হালকা হোক না কেনো। (বোখারী, হাদীস নং- ৪৪৩, ৪৬৬, মুসলিম, হাদীস নং- ৭৮২, ৭৮৩, আবু দাউদ, হাদীস নং- ১৩৬৮, ১৩৬৯, তিরমিযী, হাদীস নং- ২৮৫৬, ইবনে হাব্বান, হাদীস নং- ২৫০৭)

আমাদেরকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে, আমরা যে নেকীর কাজগুলো করছি তা প্রকাশ্য দিক দিয়ে যতই ক্ষুদ্র বা হালকা হোক না কেনো, তা যদি সবসময় করা যায় তাহলে সেটাই উত্তম বলে বিবেচিত হবে। কেননা সেই নেকীর কাজই উপকারী ও কল্যাণকর বলে প্রতীয়মান হবে যার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়। আর আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্যই হলো নেকী অর্জন করা। নেকী অর্জন বা সৎকাজ করাই হলো মানব জীবনের সফলতা। জীবনের পথপরিক্রমায় নেকী অর্জনের ক্ষেত্রে কখনো বিরতি দেয়া বা থমকে দাঁড়ানো যাবে না, এটাই জীবনের লক্ষ্য হতে হবে। কারণ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাওয়া জীবনকালে নেকী অর্জনের সুযোগ একবারই পাওয়া যাবে, দুই বার পাওয়া যাবে না।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ধৈর্য্য ধারণ করার ফযিলত

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে দাওয়াত ও প্রচারের কাজ করা, বক্তৃতা করা ও ক্ষেত্র বিশেষে আদেশ দেয়া, সংশোধন ও প্রশিক্ষণমূলক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, উপদেশ দেয়া এবং স্মরণ করিয়ে দেয়ার কাজ যারা আঞ্জাম দেন, তাদের হতাশায় নিমজ্জিত হওয়া যাবে না। মানুষ যদি কথা না শোনে, দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করে শত্রুতা শুরু করে, তবুও আমাদেরকে পরিণতির কথা চিন্তা না করেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ আঞ্জাম দিয়ে যেতে হবে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এবং এর কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানানো প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবত আসতেই পারে।

কিন্তু এসব কিছুকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়াই পূর্ণ ও দৃঢ় ঈমানের পরিচয়। যেমন নবী করীম (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যাবতীয় বিপদ-মুসিবতের মোকাবেলায় দৃঢ়, অটল- অবিচল থেকেছেন। ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে গিয়ে তায়েফে নবী করীম (সাঃ)-কে যে বর্ণনাতীত মুসিবতের মোকাবেলা করতে হয়েছিলো, এ সম্পর্কে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন, ওহূদের ময়দানে আমার ওপর যে মুসিবত এসেছিলো, তার থেকেও বড় মুসিবত এসেছিলো তায়েফে যখন আমি মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম।

আমি যখন কতিপয় গোত্র যেমন ইবনে আব্দ ইয়ালিল এবং ইবনে আব্দে কুলালের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলাম, তখন তারা আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলো। আমি

আঘাত, দুশ্চিন্তা ও বিষন্নতা নিয়ে ফিরে এলাম। এ মুহূর্তে জিবরাঈল (আঃ) আগমন করে বললেন, আপনার দাওয়াতী কথা শুনে তায়েফবাসী আপনার সাথে যে নিকৃষ্ট আচরণ করেছে, তা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা অবগত রয়েছেন। আমার সাথে পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশ্তাগণ রয়েছেন। আপনি অনুমতি দিলে এই দুটো পাহাড় একত্রিত করে তাদেরকে পিষে ফেলি। নবী করীম (সাঃ) বললেন-

بَلْ أَرْجُوْ أَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ اَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لَايُشْرِكُ بِهِ شَيْأً-

"না! আমি মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি নির্ভর করি, তিনি ঐ সকল লোকের বংশ থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যারা একমাত্র আল্লাহরই গোলামী করবে শির্ক করবে না।" (বোখারী, হাদীস নং- ৩২৩১, মুসলিম, হাদীস নং- ১৭৯৫)

মানুষকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান জানানো, কল্যাণ ও উত্তম কাজের দিকে ডাকা প্রকৃতই এক বড় নেকীর কাজ। এই কাজ সমগ্র আম্বিয়ায়ে কেরামের চিরস্থায়ী সুন্নাত। ঠিক এ কারণেই এই কাজ মহান আল্লাহর দরবারে একান্তই প্রিয় ও পসন্দনীয় কাজ। কারণ প্রত্যেক নবী-রাসূলই এই কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন।

আমাদের জীবনকেও ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত করতে হবে। দ্বীনের প্রতি দাওয়াত ও দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে যারা ইসলামী আন্দোলনে করেন তাদেরকে পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা না করেই শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই সারা জীবন এই কাজের আঞ্জাম দিয়ে যেতে হবে। কল্যাণকর কাজের প্রতি আহ্বান জানানো এবং অকল্যাণকর কাজের প্রতি নিষেধ করা মুসলমানদেরই দায়িত্ব। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ-

"তোমরাই হচ্ছো দুনিয়ায় সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উত্থান, তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর তোমরা নিজেরাও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখবে।" (সূরা আলে ইমরান-১১০)

প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ–

"তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তাদের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাবাদ করা হবে।" (বোখারী, হাদীস নং- ৮৯৩, মুসলিম, হাদীস নং- ১৮২৩)

জ্ঞানের তৃষ্ণা ও আলেমদের প্রতি ভালোবাসার ফযিলত

ইলম্ ও আলেম তথা জ্ঞান ও জ্ঞানীদের সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اُغْدُ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ مُسْتَمِعًا اَوْ مُحِبًّا وَلاَ تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكُ–

"আলেম হও অথবা ইলমের অনুসন্ধানকারী হও, জ্ঞানের কথা শ্রবণকারী হও অথবা আলেমদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করো এবং পঞ্চম হয়ো না, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।" (ফয়যুল কাদীর, হাদীস নং- ১২১৩)

উল্লেখিত হাদীসে চারজনের একজন হতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে জ্ঞানী হতে হবে অথবা জ্ঞান অর্জনকারীদের একজন তথা ছাত্র হতে হবে। জ্ঞানের কথা যারা শোনে তাদের একজন হতে হবে অথবা যারা জ্ঞানী তাদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এই চারজনের একজন হতে হবে কিন্তু পঞ্চম হওয়া যাবে না। অর্থাৎ এই চার শ্রেণীর বাইরে অবস্থান করা যাবে না, এর বাইরে গেলেই ধ্বংস হতে হবে।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আব্দুর রউফ মানাভী বিখ্যাত তাবেঈ ইমাম আতা (রাহঃ)-এর এ কথাটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আলেম-ওলামাদের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাদের সাথে অহেতুক বিতর্ক করে, সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কারণেই পঞ্চম গুণ বিশিষ্ট হতে নিষেধ করা হয়েছে।' পঞ্চম গুণ বিশিষ্ট মানুষ হলো তারা, যারা আলেম হয়নি, ইলমের অনুসন্ধানও করেনি, যেখানে জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা হয় সেখানেও যোগ দেয়নি এবং আলেম তথা জ্ঞানীদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসাও পোষণ করেনি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহান আল্লাহর কাছে চাওয়ার পদ্ধতি

নবী করীম (সাঃ) নিজ উম্মতকে প্রত্যেকটি কল্যাণকর কাজ করা ও অকল্যাণকর কাজ থেকে মুক্ত থাকার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এটা কোনো কোনো মুসলমানের জন্যে সৌভাগ্যের বিষয় যে, সে অকল্যাণকর কাজ থেকে মুক্ত থেকে কল্যাণ আর নেকীর কাজ করার জন্যে অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। নবী করীম (সাঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দান করেছেন। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করার ব্যাপারে যেমন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, তেমনি পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও একে অপরের সাথে লেনদেন কিভাবে করতে হবে এসব বিষয়েও বিস্তারিত পথনির্দেশনা দিয়েছেন।

এমনকি কারো কাছে কিছু প্রার্থনা করতে হলে কিভাবে করতে হবে সেটাও তিনি শিখিয়েছেন। একদিনের একটি ঘটনা, একজন সাহাবী নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আবেদন জানালেন, আমি যখন আমার প্রতিপালকের কাছে কিছু চাইবো এবং নিজের প্রয়োজনের আবেদন জানাবো, তখন কিভাবে আবেদন জানাবো?

كَيْفَ أَقُوْلُ حِيْنَ اَسْأَلُ رَبِّىْ؟

"আমি আমার প্রতিপালকের কাছে কিভাবে আবেদন করবো?"

সাহাবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম (সাঃ) তাঁকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিয়ে বললেন, এই দোয়া তোমার দুনিয়া-আখিরাতকে পরিপূর্ণ করে দিবে। যদি তুমি এভাবে দোয়া করো–

أَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ–

আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী ওয়ার হাম্‌নী ওয়া আ'ফিনী ওয়ার যুক্‌নী।

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে মাগফিরাত দান করো, আমাদের প্রতি রহম করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং রিযক দান করো।"

এই দোয়াটির মধ্যে চারটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে নিজের হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করে বলছিলেন, 'আংটি ব্যতীত'। তারপর তিনি বললেন, এই দোয়া তোমার দুনিয়া-আখিরাতের প্রত্যেকটি কাজই সহজ করে দিবে।

এটা সেই গুরুত্বপূর্ণ ও ছোট্ট দোয়া যা মাত্র চারটি বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং যা উচ্চারণ করতে খুবই অল্প সময় ব্যয় হয়। কিন্তু এই ছোট্ট দোয়াটির মধ্যে দুনিয়া-আখিরাতের সকল কল্যাণ যেমন নিহিত রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিপুল বিনিময়।

এই দোয়াটির মধ্যে দুনিয়ার জীবনকালে রিয্ক এর প্রাচুর্যতা কামনা করা হয়েছে, নিজের এবং নিজের পরিবার-পরিজনের জন্যে ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছে। দুনিয়ার জীবনে সকল কর্মকান্ডে মহান আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ যেমন চাওয়া হয়েছে, তেমনি আখিরাতেও মাগফিরাতের প্রার্থনা করা হয়েছে। সুতরাং এই দোয়াটিতে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ সম্পর্কে চিন্তা করে এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে এবং দোয়াটি প্রত্যেক সময়ে স্মরণে রাখতে হবে। আর এরই ভিত্তিতে নিজেদের দুনিয়া-আখিরাত গড়তে হবে।

গোনাহ্ মাফের শ্রেষ্ঠ দোয়া

মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা অনেক অনেক নেকীর কাজ এবং এর ফযিলত ও মর্যাদা অনেক উচ্চে। নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনে কোনো গোনাহ্ ছিলো না, তিনি ছিলেন নিষ্পাপ-মাসুম। তবুও তিনি প্রত্যেক দিন মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন, 'আমি প্রতিদিন ৭০ বারেরও অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করি।' বান্দা যখন মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ্ অত্যন্ত খুশী হন এবং সেই বান্দার দিকে রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

ক্ষমা না চাওয়ার এবং বা নিজের ভুলের স্বীকৃতি না দেয়ার অর্থই হলো অহঙ্কার, দাম্ভিকতা, আত্মম্ভরীতা ও নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা। আর এই বিষয়টিকে আল্লাহ তা'য়ালা সবথেকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। অহঙ্কার সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, 'যারা অহঙ্কার করে তারা যেনো মহান আল্লাহর চাদর ধরে টানাটানি করে এবং যার হৃদয়ে শরিষা পরিমাণ অহঙ্কার রয়েছে, সে ব্যক্তি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।' অহঙ্কার একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যেই শোভনীয়, সেই অহঙ্কারের অংশীদার যদি অন্য কেউ হতে চায়, তাহলে সে ব্যক্তির জন্যে ধ্বংস ব্যতীত অন্য কিছুই নেই।

ভুল হলে ভুলের স্বীকৃতি দেয়া বা ক্ষমা চাওয়া নবী-রাসূলদের নীতি। প্রথম মানব, প্রথম নবী-রাসূল হযরত আদম (আঃ) যখন উপলব্ধি করতে পারলেন তিনি ভুল করেছেন। একটি মুহূর্তও তিনি দেরী করেননি, সাথে সাথে নিজের ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে মহান মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সিজদাবনত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

আর ভুলের স্বীকৃতি না দেয়া, ভুলের স্বীকৃতি দিতে লজ্জানুভব করা, ভুলের স্বীকৃতি দিলে নিজে ছোট হয়ে যাবো বলে ধারণা করা, ভুল করে সেই ভুলের ওপর অটল থাকা হলো ইবলিস শয়তানের নীতি। অভিশপ্ত এই শয়তানই সবথেকে বড় ভুল করলো। অথচ সে ভুলের স্বীকৃতি না দিয়ে দাম্ভিকতা প্রকাশ করে নিজের ভুলের ওপর থেকে চির অভিশপ্ত হয়ে গেলো এবং জাহান্নামই হবে তার শেষ আশ্রয়স্থল। এ জন্যে ভুল হলে অবশ্যই ভুলের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সাথে সাথে মহান আল্লাহর কাছে ইস্তেগ্ফার করতে হবে তথা তাওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্তেগফার করা শুধু মাত্র গোনাহের কাফ্ফারা আদায় বা গোনাহ্ মাফের কারণই নয়, বরং পৃথিবীর জীবনে বিপদ-আপদ, মুসিবত, হয়রানি-পেরেশানী থেকে মুক্ত থাকারও কারণ। যে ব্যক্তি মহান মালিক আল্লাহর কাছে যত বেশী ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্তেগফার করে, সেই ব্যক্তি পৃথিবীর জীবনে ততবেশী মানসিক প্রশান্তির সাথে জীবনকাল অতিবাহিত করে।

মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করার তথা ইস্তেগফার করার যত দোয়া নবী করীম (সাঃ) শিখিয়েছেন, তার মধ্যে একটি দোয়াকে 'সাইয়েদুল ইস্তেগফার' বা সবথেকে বড় ক্ষমা প্রার্থনা বলা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দোয়াটি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দিনে পড়বে, সন্ধ্যার পূর্বে যদি সেই ব্যক্তি ইন্তেকাল করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সন্ধ্যা বা রাতে পড়বে, সকাল হবার পূর্বে যদি সেই ব্যক্তি ইন্তেকাল করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে দোয়াটি হলো–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لَاإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ– خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا عَبْدُكَ– وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ– أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ– أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ– وَأَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَإِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ–

আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা ই-লাহা ইল্লা আন্তা খালাক্বতানী ওয়া আনা 'আবদুকা, ওয়াআনা 'আলা আহ্দিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্বা'তু, আউ'যুবিকা, মিন শাররি মাসানা'তু আবূ উ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবূ উ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগ্ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা।

"হে আল্লাহ! তুমিই আমার রব, তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো ইলাহ্ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমার বান্দাহ্। যতক্ষণ আমার সামর্থ রয়েছে, ততক্ষণ আমি তোমার আনুগত্য ও অঙ্গীকারের ওপর অবিচল রয়েছি। আমি আমার অশুভ কর্মের অশুভ পরিণতি থেকে তোমার কাছে পানাহ্ চাচ্ছি। আমি তোমার সকল নিয়ামতের প্রতি সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং প্রশংসা করছি, যা তুমি আমাকে প্রদান করেছো। আমি আমার সকল গোনাহের জন্যে লজ্জিত, তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ তুমি ব্যতীত কেউ-ই গোনাহ্ ক্ষমা করতে পারেনা।" (বোখারী, হাদীস নং-৬৩০৬, ৬৩২৩)

অগণিত নেকী বৃদ্ধি ও অসংখ্য গোনাহ্ মাফের আমল

'সুবহানাল্লাহ্' তাস্‌বীহ্ এর অর্থ হলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্রতা বর্ণনা করা এবং এ কথা ঘোষণা করা যে, তাঁর পবিত্র সত্তা যে কোনো প্রকার অংশীদাত্বের অকল্যাণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই তাস্‌বীহ এতই সহজসাধ্য যে, এর ওপর আমল করতে খুবই সামান্য সময় ও শ্রম ব্যয় হয়। আর বিনিময়ে অসংখ্য-অগণিত নেকী উপার্জন করা যায়। পবিত্র কোরআন-হাদীসের প্রায় স্থানেই যে সকল নেকীকে 'অবশিষ্ট' (অর্থাৎ যে নেক কাজের বিনিময় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা দিবেন) নেকী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'সুবহানাল্লাহ্'-এর মধ্যে অন্যতম।

'সুবহানাল্লাহ্' তাস্‌বীহ এমন এক তাস্‌বীহ্, যা সমগ্র সৃষ্টিসমূহের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে ঘোষণা করছে। এই তাস্‌বীহ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১০০ বার এই তাসবীহ পড়লে ১০০০ হাজার বার পড়ার সওয়াব পাওয়া যায় এবং হাজার দোষ-ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি তথা গোনাহ্ ক্ষমা করা হয়। ইমাম মুসলিম (রাহঃ) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ اَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ اَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ، كَيْفَ يَكْسِبُ اَحَدُنَا اَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ اَلْفُ حَسَنَةٍ اَوْ يُحَطُّ عَنْهُ اَلْفُ خَطِيئَةٍ–

"প্রত্যেক দিন এক হাজার নেকী উপার্জনের কথাটি কি তোমাদের মধ্যে কারো জানা রয়েছে? উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন জানতে চাইলো, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, প্রত্যেক দিন এক হাজার নেকী উপার্জনে সক্ষম? জবাবে নবী

করীম (সাঃ) বললেন, যদি তোমরা একশত বার তাস্‌বীহ আদায় করো তাহলে এক হাজার নেকী লেখে দেয়া হয় এবং এক হাজার গোনাহ্ মুছে দেয়া হয়।" (মুসলিম, হাদীস নং- ২৬৮৯)

বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন, মাত্র এক মিনিট সময় ব্যয় করলে ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ্' পড়া যায় এবং মাত্র এক মিনিটেই আমলনামায় ১০০০ হাজার নেকী বৃদ্ধি ও ১০০০ গোনাহ্ মুছে দেয়ার মতো বিরাট আমলও করা যায়। এভাবে ১০ মিনিটে ১০০০ বার 'সুবহানাল্লাহ্' এবং ২০ মিনিটে ২০০০ বার এ তাসবীহ্ আদায় করলে কি বিপুল পরিমাণ সওয়াব আমলনামায় লেখা হবে এবং অসংখ্য-অগণিত গোনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে, কল্পনা করে দেখুন।

আমাদের সকলেরই প্রবল আকাঙ্খা যে, কিয়ামতের ময়দানে আমরা একটি স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন ও গোনাহ্ মুক্ত আমলনামা নিয়ে মহান আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হবো। এমন আমালনামা নিয়ে আমরা কেউ-ই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হতে চাই না, যে আমলনামা থাকবে গোনাহে পরিপূর্ণ এবং হাশরের ময়দানে উপস্থিত মানুষ, জ্বীন ও ফিরিশ্তাগণ ঘৃণা পোষণ করবে। সুতরাং গোনাহ্ মুক্ত আমালনামা প্রস্তুত করার জন্যে আমাদেরকে পৃথিবীতে আমাদের জীবনের মূল্যবান কিছু সময় অবশ্যই ব্যয় করতে হবে।

নানা ধরণের অর্থহীন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে, পার্কে-ক্লাবে গিয়ে আমরা কত সময় অপচয় করি। টেলিভিশন, ডিভিডি, ভিসিডি ইত্যাদি দেখে, নানা ধরণের উপন্যাস পড়ে এবং বন্ধু-বান্ধবদের সাথে খোশ গল্পে মূল্যবান সময় বরবাদ করছি, কিন্তু মাত্র দশ বিশ মিনিট সময় ব্যয় করে অসংখ্য নেকী অর্জন ও অগণিত গোনাহ্ মুছে দেয়ার ব্যবস্থা করছি না। জীবনে এমন এক সময় অবশ্যম্ভাবী, যখন আমাদেরকে আফসোস আর অনুতাপের আগুনে কপাল পোড়ানো ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।

সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ গোনাহ্ মাফের আমল

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের একটি অক্ষর উচ্চারণ করলে দশটি নেকী পাওয়া যায়। সূরা ফাতিহা দশ বার পড়লে আমলনামায় চৌদ্দ হাজার নেকী লেখা হয়। সূরা ইখলাস এক বার পড়লে গোটা কোরআনের তিনভাগের এক ভাগ পড়ার অনুরূপ সওয়াব পাওয়া যায়। তিনবার পড়লে একবার সমগ্র কোরআন পড়ার সওয়াব পাওয়া যায়। সূরা ইখলাস ২১ বার পড়তে অল্প কিছু সময়ের প্রয়োজন হয় এবং এ সূরা ২১ বার পড়লে সাত বার কোরআন খতম দেয়ার সওয়াব পাওয়া যায়।

এর অর্থ এটা নয় যে, আমরা কোরআন তিলাওয়াত ছেড়ে দিয়ে শুধু সূরা ইখলাসই পড়তে থাকি। বরং সম্পূর্ণ কোরআন তিলাওয়াতে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যেই ছোট্ট

সূরা ইখলাস ১ বার পড়ার মধ্যে কি পরিমাণ সওয়াব রয়েছে তা বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের একটি ছোট্ট সূরা তিলাওয়াত করলে যদি পবিত্র কোরআনের তিনভাগ তিলাওয়াতের সমান সওয়াব পাওয়া যায়, তাহলে সম্পূর্ণ কোরআন একবার তিলাওয়াত করলে কি পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে তা কল্পনাও করা যায় না।

স্বল্প সময়ের মধ্যেই পবিত্র কোরআনের ২/৩ পৃষ্ঠা তিলাওয়াত করা যায়। তাহলে প্রত্যেক পৃষ্ঠার সকল আয়াত ও অক্ষর পড়লে অনুমান করা যেতে পারে, তিলাওয়াতকারী কত পরিমাণ নেকী অর্জন করলো।

لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদির।

"আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

উক্ত দোয়াটি একবার পড়লে ১০টি গোলাম মুক্ত করার সমান সওয়াব পাওয়া যায়, তাহলে সামান্য কিছু সময় ব্যয় করে দোয়াটি ১০ বার পড়লে ১০০ টি গোলাম মুক্ত করার সমান সওয়াব পাওয়া যাবে। আরো কিছু সময় ব্যয় করে উক্ত ছোট্ট কালামটি ২০ বার পড়লে ২০০ টি গোলাম মুক্ত করার সমান সওয়াব পাওয়া যাবে।" (আহ্মাদ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪১৮, মাজমাউ'য যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৪, তাবারাণী)

'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহী' কালামটি উচ্চারণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে, গোনাহ্ যদি সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণও হয়, এই কালামটি ঈমান ও আন্তরিকতার সাথে উচ্চারণ করলে উক্ত গোনাহ্ও ক্ষমা করে দেয়া হয়। এখন অনুমান করা যেতে পারে, মাত্র এক থেকে দুই মিনিট সময় ব্যয় করে এই ছোট্ট কালামটি কত অসংখ্য বার পড়া যেতে পারে এবং এর বিনিময়ে কত অসংখ্য অগণিত গোনাহ্ ক্ষমা পাওয়া যায়।

কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, কারো জীবনের শেষ কথা যদি এই কালেমা হয়, তাহলে সে ব্যক্তি অবশ্য অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অনুরূপভাবে 'লা হাওলা ওয়া লা কুউ-ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আ'যিম'

কালামটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই বাক্যসমূহের মধ্যে ৯৯ প্রকারের দুঃখ-যন্ত্রণা ও অস্থিরতার দূরীকরণের চিকিৎসা রয়েছে। ঠিক একইভাবে এমন অসংখ্য ছোট্ট ছোট্ট সহজ বাক্য ও নেক আমল রয়েছে, যা মাত্র কয়েক সেকেন্ড বা মিনিটেই আদায় করা সম্ভব। কিন্তু এসব কিছুর মূল কথা হলো, মহান আল্লাহর প্রতি প্রবল আশা পোষণ করে, একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে এবং প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে সময়ের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে এসব আমল করতে হবে। সময় সম্পর্কে আরবী ভাষায় প্রবাদ বাক্য রয়েছে–

اَلْوَقْتُ أَثْمَنُ مِنَ الذَّهَبِ–

'সময় সোনার চেয়েও দামী।' মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রার্থনা, আমরা যেনো সময়ের মূল্য সম্পর্কে সচেতন হই এবং সময়কে যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করি, এই তাওফীক তিনি যেনো আমাদেরকে দান করেন। আমীন।

গোনাহ্কে নেকীতে পরিণত করার আমল

মহান আল্লাহ তা'য়ালার অসীম দয়া ও অনুগ্রহের কোনো তুলনা করা যায় না। মহান মালিক তাঁর আপন সৃষ্টির প্রতি সর্বাধিক মায়া-মমতা ও ভালোবাসা পোষণ করেন। অপরাধ করার পরে বান্দা যখন অনুতাপ আর অনুশোচনার আগুনে জ্বলতে থাকে, বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বার বার মহান্ আল্লাহর কাছে কৃত অপরাধের স্বীকৃতি দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, পুনরায় ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরণের অপরাধে লিপ্ত না হবার অঙ্গীকার করে ক্ষমা চাইতে থাকে, তখন আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। তিনি বান্দার চোখের পানি সহ্য করতে পারেন না। অনুতাপের আগুনে দগ্ধ সে বান্দার প্রতি পরম মমতায় ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

শুধু তাই নয়, সেই বান্দা যে সকল মন্দ কাজ করেছিলো, সেই মন্দ কাজের সংখ্যানুসারে সৎকাজ আমলনামায় লিখে দিয়ে সওয়াব প্রদান করেন। অর্থাৎ বান্দার অতীতে করা মন্দ কাজকে সৎকাজে পরিণত করে দেন। পবিত্র কোরআনে এ কথা অনেক স্থানে বলা হয়েছে, অনুতাপ আর অনুশোচনার আগুনে ঝলসে কোনো মানুষ যখন নিজেকে মহান আল্লাহর কাছে নিবেদন করে, আল্লাহ্ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে সেই বান্দাকে ক্ষমা করে দিয়ে তার অকল্যাণকর কাজগুলো কল্যাণকর কাজে পরিণত করে দেন। অর্থাৎ অকল্যাণকর কাজের অবশ্যম্ভাবী যে মন্দ পরিণতি তাকে ভোগ করতে হতো, সেই নিকৃষ্ট পরিণতি থেকে তাকে হেফাজত করে শুভ কল্যাণকর পরিণতির দিকে এগিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ-

"যারা তওবা করেছে, আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ তা'য়ালা এমন লোকদের অতীতের গোনাহ্সমূহ তাদের নেক আমল দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন।" (সূরা আল ফোরকানঃ ৭০)

ইমাম ইবনে কাসীর (রাহঃ) বলেন-

اَنَّ تِلْكَ السَّيِّاٰتِ الْمَاضِيَةَ تَنْقَلِبُ بِنَفْسِ التَّوْبَةِ النُّصُوْحِ حَسَنَاتٍ-

"অতীতে যেসব গোনাহ্ সংঘটিত হয়েছে, এ ব্যাপারে যদি প্রকৃতই তাওবা করা হয় তাহলে তাওবা করার কারণে গোনাহ্সমূহ নেকীতে পরিবর্তিত করে দেয়া হয়।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৩৮)

لَيَأْتِيَنَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأُنَاسٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَاَوْا أَنَّهُمْ قَدِ اسْتَكْثَرُوا مِنَ السَّيِّاٰتِ وَقِيْلَ مَنْ هُمْ يَاأَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ-

"প্রকৃত অর্থেই তাওবাকারী লোকদের গোনাহ্সমূহ নেকীতে পরিবর্তিত হতে দেখে কিয়ামতের ময়দানে একশ্রেণীর লোকজন ঈর্ষা পোষন করে বলবে, 'আফসোস! আমরাও যদি দুনিয়ার জীবনে ঐ লোকগুলোর অনুরূপ অধিক পরিমাণে গোনাহ্ করে তাওবা করতাম! তাহলে আজ আমাদের গোনাহ্সমূহকে নেকীতে পরিণত করা হতো। যাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে এমন কথা লোকজন বলতে থাকবে, তাদের পরিচয় সম্পর্কে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, এরা হলো ঐসব লোক যাদের গোনাহ্কে নেকীতে পরিবর্তন করে দেয়া হবে।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৩৮)

ইমাম বাগাভী আশ্ শাফী' (রাঃ) ৫১৬ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। পবিত্র কোরআনের বিখ্যাত তাফসীর, 'তাফসীরে বাগাভী'-এর রচয়িতা ছিলেন তিনি। উক্ত তাফসীরে তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَرَأْنَاهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَتَيْنِ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ الآيَة، ثُمَّ نَزَلَتْ اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَمَارَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِحَ بِشَيْءٍ قَطُّ كَفَرْحِهٖ بِهَا-

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে আমরা দুই বছরব্যাপী এ আয়াত, 'ঐ সকল লোক যারা আল্লাহ্র দাসত্ব করার সাথে সাথে অন্য মাবুদেরও দাসত্ব করে না' তিলাওয়াত করতাম। তারপর যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, 'যারা তওবা করেছে, আল্লাহ্র ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ্ তা'য়ালা এমন লোকদের অতীতের গোনাহ্সমূহ তাদের নেক আমল দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন' তখন নবী করীম (সাঃ)-কে এতই আনন্দিত হতে দেখলাম যা অন্য কোনো ব্যাপারে কখনো দেখিনি।"

আল্লামা শাব্বির আহ্মাদ উসমানী (রাহঃ) তাফসীরে উসমানীতে লিখেছেন, 'মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে তাওবাকারীর গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দিয়ে তাদের তওবা ও আমলে সালেহ তথা সৎকাজের বরকতে গোনাহ্সমূহের অনুপাতে নেকী প্রদান করবেন। এ ধরণের ঘটনা সম্বলিত একটি হাদীস রয়েছে–

اِنِّىْ لَأَعْلَمُ اٰخِرَ رَجُلٍ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ، اٰخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ وَاٰخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتٰى بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَعْرِضُوْا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوْبِهٖ وَارْفَعُوْا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوْبِهٖ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، فَيَقُوْلُ نَعَمْ، لَايَسْتَطِيْعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوْبِهٖ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ فَاِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٌ فَيَقُوْلُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَاأَرَاهَا هَاهُنَا فَلَقَدْرَأَيْتُ رَسُوْلَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ-

"হযরত আবু যর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন, আমি সেই ব্যক্তিকেও ভালো করে জানি, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সেই ব্যক্তিকেও ভালোভাবে জানি, যাকে জাহান্নাম থেকে সকলের শেষে বের করা হবে। কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। এরপর আদেশ করা হবে, এই ব্যক্তির ছোট ছোট গোনাহসমূহ তার সম্মুখে রাখা হোক আর বড় গোনাহ্সমূহ গোপন রাখা হোক। যখন ছোট গোনাহসমূহ তার সম্মুখে রেখে বলা হবে, তুমি অমুক অমুক গোনাহ্ করেছো। তখন সে স্বীকার করবে। কারণ অস্বীকার করার কোনো সুযোগই থাকবে না।

সে ব্যক্তি মনে মনে বলবে, এগুলো তো ছোট গোনাহ্, বড় গোনাহ্সমূহ যখন দেখানো হবে তখন না জানি কি পরিস্থিতি হবে। এ কথা ভেবে সে আতঙ্কিত হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে আদেশ দেয়া হবে, এই ব্যক্তির প্রত্যেক ছোট গোনাহের পরিবর্তে একটি করে নেকী দেয়া হোক। এ কথা শুনে সে ব্যক্তি বলবে, এখনো তো আমার অনেক গোনাহ্ অবশিষ্ট আছে, সেগুলো তো এখানে দেখা যাচ্ছে না। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সেই লোকটি যে কথা বলবে, তা বলতে গিয়ে হাসলেন। ফলে তাঁর পবিত্র দাঁত দেখা গেলো। নবী করীম (সাঃ)-এর হাসির কারণ ছিলো এই যে, যেসব গোনাহ্ প্রকাশ হয়ে পড়ায় সে আতঙ্কিত ছিলো, এখন সে নিজেই সেগুলো প্রকাশ করার জন্যে বলছিলো।" (মুআলিমুত তানযিল লিল বাগাভী, পৃষ্ঠা- ৯৩৩)

গোনাহ্ ক্ষমা পাবার ব্যাপারে সাধারণত দুটো বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে। একটি হলো ইস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা ও আরেকটি হলো তাওবা অর্থাৎ এমন কাজ আর করবো না বলে ওয়াদা করা। এই তাওবাই হলো প্রকৃত বিষয় এবং ইস্তেগফার হলো তাওবার দিকে প্রত্যাবর্তনের পথ। তাওবার মধ্যে তিনটি জিনিসের সমন্বয় ঘটে থাকে। প্রথমটি হলো অনুতাপ, অনুশোচনা, লজ্জা ও দুঃখবোধ। দ্বিতীয়টি হলো, গোনাহ পরিত্যাগ করা, পাপাচার থেকে বিরত থাকা এবং পাপের প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করা। তৃতীয়টি হলো, পাপাচারে লিপ্ত হবো না বা পুনরায় ইচ্ছাকৃতভাবে আর গোনাহ্ করবো না বলে দৃঢ় অঙ্গীকার করা।

মহান আল্লাহর বান্দা, তা সে বান্দা যত বড় অপরাধীই হোক না কোনো, উক্ত বান্দা যদি গোনাহের কারণে লজ্জিত হয়ে, অনুতাপ আর অনুশোচনায় নতশীরে মহান আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে চোখের পানি ঝরাতে থাকে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দার এই অবস্থা খুবই পসন্দ করেন। মনে রাখতে হবে, চোখের পানির মূল্য অনেক বেশী এবং এই পানি ফেলতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর কাছে। আল্লামা বাগাভী (রাহঃ) লিখেছেন–

وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْحُوْ بِالنَّدَمِ جَمِيْعَ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يُثْبِتُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً-

"কতিপয় লোকজন (ইসলামী চিন্তাবিদগণ) বলে থাকেন, অনুতাপ আর অনুশোচনার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা সকল গোনাহ্ ক্ষমা করে দিয়ে গোনাহের স্থানে নেকী লেখে দেন।" (মাআ'লিমুত তানযিল, পৃষ্ঠা-৯৩৩)

অশুভ পরিণতি থেকে মুক্তি লাভের আমল

নেকীর কাজ সম্পর্কে কিছু মানুষের ধারণা হলো শুধুমাত্র নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, দান-খয়রাত এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ কাজই নেকীর কাজ। এই ধারণার কারণে অন্যান্য মানুষের অধিকারের ব্যাপারে এরা অবহেলা প্রদর্শন করে। ব্যক্তিগত দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে এরা খুবই পরিশ্রমের সাথে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে, কিন্তু মানুষের সাথে মেলামেশায়, লেনদেনে, আচার-আচরণ ব্যবহারে অন্যের অধিকার তো বুঝিয়ে দেয়ই না, বরং অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। অথচ হাদীসে মানুষের সাথে উত্তম আচরণ ও তাদের অধিকার বুঝিয়ে দেয়াকে প্রকৃত দ্বীন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি পৃথিবীতে জীবনকালে অন্য মুসলমানের কল্যাণে আসে, অন্যকে সেবাযত্ন ও সাহায্য সহযোগিতা করে, অন্যের সমস্যার সমাধান করে, অন্যের সাথে মেলামেশা করে তার কাজকর্মে সহযোগিতা করে, অক্ষম, দুর্বল, গরীব, নিঃস্ব অসহায় লোকদের কল্যাণে আসে, অন্যের প্রয়োজন পূরণ করে দেয়, তার জন্যে সবথেকে বড় সুসংবাদ রয়েছে। এ ধরণের লোকদের বড় পুরস্কার ও সম্মান হলো এরা ধ্বংস হওয়া বা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকে। অর্থাৎ ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় এ ধরণের লোকদের ইন্তেকাল হয়। দ্বিতীয় বড় ধরণের বিনিময় হলো, দুনিয়া-আখিরাতে যে কোনো বিপদ-মুসিবতে তাদেরকে হেফাজত করা হয়। তৃতীয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার হলো, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির জন্যে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ চিহ্ন নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে, যা দেখে সকলেই চিনতে পারবে যে, এ ব্যক্তি হলো সেই ব্যক্তি যিনি পৃথিবীতে অন্য মানুষের উপকারে আসতেন।

আমরা আমাদের শক্তি-সামর্থ এবং ক্ষমতা অনুযায়ী অন্য মুসলমানের কল্যাণে আসতে পারি এবং সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারি। এই কাজেও সীমাহীন সওয়াব রয়েছে। এ কথা যদি আমরা প্রকৃতই অনুধাবন করতে সক্ষম হতাম এবং এর

অপরিসীম মূল্য অনুভব করতে পারতাম, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিই এই নেকী অর্জনের লক্ষ্যে জীবন পর্যন্ত কোরবান করতে প্রস্তুত থাকতো। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِيْ مَصَارِعَ السُّوْءِ وَالْاٰفَاتِ وَالْهَلَكَاتِ، وَاَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِيْ الدُّنْيَا هُمْ اَهْلُ الْمَعْرُوْفِ الْاٰخِرَةِ–

"নেকী অর্জনকারী, লোকদের সাথে ইহসানকারী এবং নেক কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তি ধ্বংস হওয়া থেকে, বিপদ-মুসিবত থেকে এবং নিঃশেষ হওয়া থেকে মুক্ত থাকতে পারে। পৃথিবীতে ইহসান ও নেক কাজ সম্পাদনকারী লোক আখিরাতেও ইহসান ও নেকী অর্জকারী লোক হবে।" (জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং- ৩৭৯৫)

কবরের আযাব থেকে মুক্তি লাভের আমল

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের প্রত্যেকটি অক্ষরই সর্বাধিক সম্মান-মর্যাদাপূর্ণ এবং উচ্চ ফযিলত সম্পন্ন। কিন্তু সমগ্র কোরআন প্রত্যেক দিন সকলের জন্যে তিলাওয়াত করা সম্ভব হয় না। এ জন্যে নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং পবিত্র কোরআনের কোনো কোনো আয়াত এবং সূরার নাম উল্লেখ করে তার ওপর আমল করে উচ্চ ফযিলত অর্জন করার জন্যে মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। যেমন সূরা আলিফ লাম মিম সিজ্‌দা এবং সূরা মুল্‌ক, এ দুটো সূরা খুবই ছোট ছোট আয়াতসম্পন্ন সূরা, যা তিলাওয়াত করতে খুব বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। আর মুখস্থ করে নিতে পারলে তো খুবই ভালো। এ দুটো সূরা প্রত্যেক দিন ঘুমানোর পূর্বে নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং তিলাওয়াত করেছেন এবং অন্যদেরকেও বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَاَ اَلٓمٓ اَلسَّجْدَةَ وَتَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ–

"নবী করীম (সাঃ) সূরা আলিফ লাম মিম সিজ্‌দা ও সূরা মুল্‌ক তিলাওয়াত না করা পর্যন্ত ঘুমাতেন না।" (জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং- ৪৮৭৩, তিরমিযী, হাদীস নং- ২৮৯২)

আরেক হাদীসে সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা যুমার তিলাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা মুল্‌ক সেই মর্যাদাপূর্ণ সূরা যা সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لَوَدِدْتُ اَنَّهَا فِيْ قَلْبِ كُلِّ اِنْسَانٍ مِنْ اُمَّتِيْ–

"এটা আমার হৃদয়ের আকাঙ্খা যে, এই সূরাটি আমার প্রত্যেক উম্মত হৃদয়ে সংরক্ষণ করুক। অর্থাৎ তিলাওয়াতের জন্য মুখস্থ করুক।" (ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং-১১৬৩, মুস্তাদরাকে হাকেম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৬৫)

এ সূরা সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) অন্যত্র বলেছেন, মহান আল্লাহর কিতাবে এমন একটি সূরা রয়েছে যার আয়াত সংখ্যা ২৩, এ সূরাটি তিলাওয়াতকারীর জন্যে ঐ পর্যন্ত সুপারিশ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তাকে পুরস্কৃত করা হবে। (মুসনাদে আহ্‌মাদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৯-৩২১)

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, পবিত্র কোরআনে এমন একটি সূরা (সূরা মুল্‌ক) রয়েছে, যা তিলাওয়াতকারীর পক্ষে কিয়ামতের দিন ঐ পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে, যতক্ষণ না তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। (মাজমাউ'য যাওয়ায়েদ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭২, জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং-৩৬৪৪)

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে–

سُوْرَةُ تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ–

"সূরা তাবারাকাল্লাযি অর্থাৎ সূরা মুল্‌ক কবরের আযাব প্রতিরোধ করে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়মিত সূরা মুল্‌ক তিলাওয়াত করবে, সে ব্যক্তিকে কবরের আযাব থেকে মুক্ত রাখা হবে।" (জামেউ'স সাগীর, লিল আলবানী, হাদীস নং- ১১৪০)

নবী করীম (সাঃ) ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, সূরা মুল্‌ক যেনো তাঁর সকল উম্মত তিলাওয়াত করে। সুতরাং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর ইচ্ছে পূরণ করার বিনিময় যে কত বিশাল তা কল্পনাও করা যায় না। এ সূরাটি তিলাওয়াত করলে একদিকে যেমন নবী করীম (সাঃ)-এর ইচ্ছে পূরণ করা হয়, তেমনি এ সূরা তিলাওয়াতের কারণে কবরের আযাব থেকেও মুক্ত থাকা যায়। দুনিয়ার শেষ মঞ্জিল হলো কবর এবং আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল হলো কবর। আখিরাতের এই প্রথম মঞ্জিলে যদি কেউ গ্রেফতার হওয়া থেকে মুক্ত থাকে, তাহলে আশা করা যায় সে ব্যক্তি অন্যান্য সকল মঞ্জিল থেকেই মুক্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। এ জন্যে আমাদের সকলেরই উচিত প্রত্যহ সূরা মুল্‌ক তিলাওয়াত করা।

এ সূরাটি শুধু তিলাওয়াতই যথেষ্ট নয়, এ সূরার অনুবাদ ও ব্যাখ্যাও আমাদেরকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্যে বাংলা ভাষায় অনূদিত তাফসীর গ্রন্থ বিশেষভাবে তাফহীমুল কোরআন অধ্যয়ন করা উত্তম। তাহলে এ সূরাটির ওপর আমল করা সহজ হবে। সেই সাথে সূরাটি মুখস্থ করার জন্যে প্রত্যেক দিন একটি অথবা দুটি

করে আয়াত মুখস্থ করতে হবে। তাহলে এক সময় পূর্ণ সূরাটিই মুখস্থ হয়ে যাবে। এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

سُوْرَةٌ فِي الْقُرْاٰنِ خَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبِهَا حَتّٰى أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ

"এ সূরাটি কিয়ামতের দিন তার তিলাওয়াতকারীকে জান্নাতে না পৌছানো পর্যন্ত মহান আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতেই থাকবে।" (জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং-৩৬৪৪)

তিরমিযী শরীফের আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

هِيَ الْمَانِعَةُ، هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ–

এ সূরা (সূরা মুল্‌ক) কবরের আযাব প্রতিরোধ করে এবং নাজাত দেয়ার ব্যবস্থা করে, অর্থাৎ কবরের আযাব থেকে নাজাত দেয়। (তিরমিযী, হাদীস নং-২৮৯০)

কবরের অন্ধকার দূর করার আমল

পৃথিবীর সকল নিয়ামতের তুলনায় দুই রাকাআত নফল নামাজ অধিক মূল্যবান। নফল দুই রাকাআত নামাজের সওয়াব ধারণারও অতীত এবং খুবই বরকত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আমল। দিন বা রাতের যে কোনো সময়ে মাত্র পাঁচটি মিনিট ব্যয় করে দুই রাকাআত নফল নামাজ আদায় করা যায়। একটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ فَقَالَ مَنْ صَاحِبُ هٰذَا الْقَبْرِ؟ فَقَالُوْا فُلاَنٌ فَقَالَ رَكْعَتَانِ أَحَبُّ اِلٰى هٰذَا مِنْ م بَقِيَّةِ دُنْيَا كُمْ–

"নবী করীম (সাঃ) একদিন সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে কবরস্থানে একটি কবরের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, 'এই কবরটি কোন্ ব্যক্তির?' সাহাবায়ে কেরাম জানালেন, কবরটি অমুক ব্যক্তির। এ সময় নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমাদের জন্যে সারা দুনিয়ার সকল কিছুর তুলনায় এই কবরের জন্যে দুই রাকাআত নফল নামাজ সর্বাধিক কল্যাণকর এবং প্রিয়।" (তারগীব, হাদীস নং- ৫৫৬)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন–

صَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ فِيْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ لِوَحْشَةِ الْقُبُوْرِ وَصُوْمُوْا يَوْمًا شَدِيْدًا حَرُّهٗ لِطُوْلِ يَوْمِ النُّشُوْرِ–

"রাতে দুই রাকাআত নফল নামাজ আদায় করে নিজের কবরের অন্ধকার দূর করো আর প্রচন্ড গরমের মৌসুমে নফল রোজা রেখে কিয়ামতের দিনের অকল্পনীয় গরম থেকে নিজেদের হেফাজত করো।"

সাধারণভাবে দুই রাকাআত নফল নামাজ আদায় করা খুবই সহজ কাজ এবং এই নেকীর কাজ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী দিন বা রাতের যে কোনো সময় আঞ্জাম দিতে পারে। এই নেকীর কাজটির মাধ্যমে যেমন নির্জন কবরের অন্ধকার দূর হবে তেমনি কিয়ামতের ঐ মুসিবতের দিনে বিরাট কল্যাণ বয়ে আনবে, যে সময় একটি দিন বর্তমানের পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। দুই রাকাআত নফল নামাজ আদায় করে এই নেকী অর্জনের জন্যে মাত্র পাঁচটি মিনিট সময় ব্যয় হবে। কিন্তু আফসোস, আমরা কত মূল্যবান সময় অবহেলাভরে নষ্ট করে দিচ্ছি, অথচ এই মূল্যবান সময় সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছি। আমরা দিনরাতের যে সময় অকারণে নষ্ট করে দিচ্ছি, সে সময়ে অসংখ্য নেকী অর্জন করে নিজেদের আমলনামা পরিপূর্ণ করতে পারি।

কবর ও হাশরের দিনে ফিতনা থেকে মুক্তি লাভের আমল

দুনিয়া-আখিরাতে শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র পথই হলো নেকী। পবিত্র কোরআন ও হাদীসের অধিকাংশ স্থানে নেক তথা সৎকাজের ব্যাপারে পথনির্দেশনা সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস রয়েছে। এসব আয়াত ও হাদীসে বলা হয়েছে, নেক কাজ তথা সৎ কাজের বিনিময়ে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমতে মানুষ বিভিন্ন ধরণের শাস্তি থেকে সুরক্ষিত থাকে।

মহান আল্লাহর যিক্র বেশী বেশী করা গুরুত্বপূর্ণ নেক কাজের মধ্যে একটি কাজ, যা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

مَاعَمِلَ اٰدَمِیٌّ عَمَلاً اَنْجٰی لَهُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِاللّٰهِ تَعَالٰی-

"মানুষের কাজের মধ্যে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি লাভের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মহান আল্লাহর যিক্র করা।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৭৪, আত তারগীব ওয়াত্ তারহীব, ৮ম খন্ড, হাদীস নং- ২২, জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং- ৫৬৪৪)

দুনিয়া, আখিরাত, কবর ও হাশরের দিনের ফিতনা, আযাব ও বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়ার মতো নেকীর কাজ মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা। এটা অতি সহজলভ্য নেকীর কাজ, যা প্রত্যেক মানুষই সহজভাবে প্রতি মুহূর্তে আঞ্জাম দিয়ে নিজের হেফাজতের উপকরণ প্রস্তুত করতে পারে।

উল্লেখিত হাদীস আমাদেরকে পথনির্দেশ দিচ্ছে যে, কবরের আযাব থেকে মুক্তি লাভের পথই হলো সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা। ঠিক এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) নিজ উম্মতকে নসীহত করেছেন, সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্ত তোমার জিহ্বাকে মহান আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত রাখো। সবসময় আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণকারী ব্যক্তিই নিজেকে গোনাহ্ থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়।

পৃথিবীতে জীবনকালে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে যিনি মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেন, তার কবরের জীবনেও তিনি এই মহান নেকীর কাজের সওয়াব পাবেন, তখন এর গুরুত্ব অনুভব করে চক্ষু শীতল হয়ে যাবে। এ সময় প্রত্যেক ব্যক্তিই আফসোস করে বলবে, আহা! যদি আমি মহান আল্লাহ্‌কে এর থেকেও বেশী স্মরণ করতাম!

কিয়ামতের দিন মর্যাদা বৃদ্ধির দোয়া

একান্ত অত্যাবশ্যকীয় দোয়ার মধ্যে প্রথম দোয়া সেটাই যা অযুর পরে পড়তে হয়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অযু করার পরে এ (নীচের) দোয়াটি পড়ার প্রতি গুরুত্ব দিবে সে ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে এ দোয়াটি একটি উৎকৃষ্টমানের কাগজের ওপর লেখা হবে। তারপর সেটির ওপরে মোহর লাগিয়ে কিয়ামতের ধ্বংসকারিতা থেকে তা হেফাজত করা হবে। ঐ দোয়াটি পড়লে কিয়ামত পর্যন্ত বিপুল সওয়াব পেতে থাকবে। কিয়ামত সংঘটিত হবার পরে সে কাগজটি খুলে দোয়া পাঠকারীকে উচ্চ সম্মান-মর্যাদায় ভূষিত করা হবে। (জামেউস্ সাগীর, হাদীস নং- ৬১৭০, তারগীব, হাদীস নং- ৩৪৯)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর বর্ণনাকৃত হাদীসে দোয়াটি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ اِلَيْكَ–

সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশ্‌হাদু আল লা-ইলাহা ইল্লা আনতা আস্‌তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।

"হে আল্লাহ! তুমি অত্যন্ত পাক-পবিত্র এবং সকল প্রশংসাই তোমার। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমি কেবলমাত্র তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি।"

রোগ দিয়ে পরীক্ষা ও জান্নাতের সুসংবাদ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কোনো বান্দারই শক্তি-সামর্থের বাইরে পরীক্ষা গ্রহণ করেন না। এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারার ২৮৬ ও সূরা তালাক-এর ৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। রোগ বা অসুস্থতাও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দার জন্যে পরীক্ষা বিশেষ। পবিত্র কোরআন এবং হাদীস থেকে জানা যায় যে, রোগের কারণে গোনাহ্ ঝরে যায় বা ক্ষমা করা হয় এবং সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। বান্দা যতক্ষণ রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার আমল নামায় নেকী লেখা হতে থাকে।

মুসলমান যখন রোগাক্রান্ত হয় তখন তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, রোগ যন্ত্রণার কারণে কারো কাছে কোনো অভিযোগ করা যাবে না বরং মহান আল্লাহর কাছে এর বিপুল বিনিময়ের আশা পোষণ করতে হবে। রোগকে কল্যাণ অর্জনের তথা নেকী লাভের মাধ্যমে পরিণত করতে হবে। যেমন বেশী বেশী আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ পড়তে হবে, সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে মহান আল্লাহ নামের যিক্‌র করতে হবে। রোগাক্রান্ত অবস্থায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া রয়েছে এবং এই দোয়ার মধ্যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

এই দোয়া সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে কেউ রোগাক্রান্ত অবস্থায় এই দোয়া পড়বে এবং সেই রোগেই যদি তার ইন্তেকাল হয় তাহলে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

مَنْ قَالَ: لاَاِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ لاَاِلٰهَ الاَّ أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ وَاِذَا قَالَ: لاَاِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ– قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ لاَاِلٰهَ الاَّ أَنَا وَحْدِىْ وَاِذَا قَالَ: لاَاِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، قَالَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ الاَّ أَنَا وَحْدِىْ لاَ شَرِيْكَ لِىْ وَاِذَا قَالَ : لاَ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، قَالَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ الاَّ أَنَا لِىَ الْمُلْكُ وَلِىَ الْحَمْدُ وَاِذَا قَالَ: لاَ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ، قَالَ لاَاِلٰهَ الاَّ أَنَا وَلاَ حَوْلَ

وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِيْ وَكَانَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَهَا فِيْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ–

"যখন কোনো ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' উচ্চারণ করে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তির উচ্চারিত বাক্যের বিনিময় দান করেন এবং বলেন, 'অবশ্যই আমি একমাত্র ইলাহ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ'। পুনরায় বান্দাহ যখন উচ্চারণ করে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্ দাহু' তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'অবশ্যই আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই এবং আমি এক ও অদ্বিতীয়।' পুনরায় বান্দা যখন উচ্চারণ করে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্ দাহু লা শারিকা লাহু' তখন মহান আল্লাহ বলেন, "অবশ্যই আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই, আমি এক ও অদ্বিতীয় এবং আমার কোনো অংশীদার নেই।'

বান্দা যখন পুনরায় উচ্চারণ করে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুল্‌ক ওয়া লাহুল হাম্‌দ' তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং সার্বভৌমত্ব, ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য কেবলমাত্র আমারই এবং সকল প্রশংসাও একমাত্র আমার।' পুনরায় বান্দা যখন উচ্চারণ করে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' তখন মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। আমি ব্যতীত রক্ষাকারী, সহায়তাকারী এবং প্রবল শক্তি ক্ষমতা অধিকারী কেউ আছে?' এরপর নবী করীম (সাঃ) বললেন, যে কোনো ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবার পরে যদি এই দোয়া পড়ে এবং সেই রোগেই যদি তার ইন্তেকাল হয়, তাহলে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৪৩০)

দোয়া

لاَاِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ وَاللّٰـهُ أَكْبَرُ، لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰـهُ وَحْدَهُ– لاَاِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ–

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্ দাহু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্ দাহু লা শারিকা লাহু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুল্‌ক ওয়া লাহুল হাম্‌দ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।

রোগ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক পরীক্ষা বিশেষ এবং যখন কোনো বান্দা রোগকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ফায়সালা' মনে করে ধৈর্য ধারণ করে উল্লেখিত দোয়া পড়তে থাকে, তখন সে বান্দা আল্লাহর কাছে পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়। মহান মালিকের কাছে সে বান্দা প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়। উক্ত রোগেই যদি সে বান্দার ইন্তেকাল হয় তাহলে উক্ত দোয়া সেই বান্দার জন্যে মুক্তির কারণ হয়।

সামান্য কিছু সময় তাসবীহ্ পড়ার বিনিময় জান্নাত

এ পর্যায়ে আমরা এমন এক 'তাসবীহ্'-এর উচ্চ মর্যাদা ও ফযিলত সম্পর্কে আলোচনা করবো, যা আমল করা খুবই সহজ এবং এ বিষয়টি আমল করতে অতি অল্প সময় ব্যয় হয়। কিন্তু বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবী পরিপূর্ণ করে সওয়াব দান করা হয় এবং আমলকারী ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশের পথে কোনো বাধা থাকে না। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

خَصْلَتَانِ لاَ يُحْصِيْهِمَا عَبْدٌ الاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ يُسَبِّحُ اَحَدُكُمْ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا فَتِلْكَ مِائَةٌ وَخَمْسُوْنَ بِاللِّسَانِ وَاَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِى الْمِيْزَانِ– وَاِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ يُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَيَحْمَدُ ثَلاَثًا وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَاَلْفٌ فِى الْمِيْزَانِ–

"দুটি বিষয় (দুটি নেকী) এমন যে, যে কোনো ব্যক্তি একে স্মরণ করে (অর্থাৎ এর অর্থ উপলব্ধি করে সবসময় পড়তে থাকে এবং এর ওপর আমল করে) তাহলে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ দুটো নেকীর কাজ করা খুবই সহজ কিন্তু অল্প সংখ্যক মানুষই এর ওপর আমল করে। প্রত্যেক (ফরজ) নামাজের পরে দশবার 'সুবহানাল্লাহ' দশ বার 'আল হাম্‌দু লিল্লাহ' এবং দশ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়া অথবা জিহ্বার মাধ্যমে (মুখ বন্ধ রেখে শুধু জিহ্বা নড়াচড়া করে) উচ্চারণ করলে ১৫০ বার উচ্চারণ করা হয়। (দশটি করে তিনটি তাসবীহ পড়লে প্রত্যেক ওয়াক্তে ৩০ বার পড়া হবে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে প্রত্যেক দিন ১৫০ বার পড়া হবে) কিন্তু এটা ওজনে হবে ১,৫০০ বারের সমান। (কারণ আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ

করে তাঁর বান্দার একটি নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়ার ওয়াদা করেছেন) এবং রাতে বিছানায় গিয়ে ঘুমানোর পূর্বে 'সুবহানাল্লাহ্' ৩৩ বার, 'আল হামদু লিল্লাহ্' ৩৩ বার, এবং 'আল্লাহু আকবার' ৩৪ বার পড়ে অথবা জিহ্বার মাধ্যমে উচ্চারণ করে, তাহলে উক্ত তিনটি তাসবীহ্ সর্বমোট ১০০ বার পড়া হয়। কিন্তু ওজন দেয়া হবে ১০০০ বারের সমান। অর্থাৎ ১০০০ বার পড়ার সমান বিনিময় দান করা হবে।" (ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং- ৬৯২, তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৪১০, আবু দাউদ, হাদীস নং- ৫০৬৫, ইবনু হাব্বান, হাদীস নং- ২০১৫)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমতের বৃষ্টিধারা বান্দার প্রতি বর্ষিত হবার জন্যে সুত্রের সন্ধানে থাকে। বান্দার সামান্যতম একটু নেক কাজের সুত্র পেলেই সেই মহান রহমত বৃষ্টিধারার মতোই বান্দার প্রতি বর্ষিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা সময়ের সদ্ব্যবহার করছি না। কত মূল্যবান সময় আমরা উদাসীনতা আর অবহেলাভরে অপচয় করছি, অথচ সামান্য সময় ব্যয় করে অগণিত নেকী অর্জন করছি না। মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আকুল আবেদন, তিনি আমাদেরকে সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন ও সময়ের যথাযথ ব্যবহার করার মতো মন-মানসিকতা দান করুন, আমীন।

জান্নাতে প্রবেশের সহজ আমল

আয়াতুল কুরসী পবিত্র কোরআনের সবথেকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আয়াত এবং এই আয়াতের অসংখ্য ফযিলতের মধ্যে এটাও শামিল রয়েছে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে আয়াতুল কুরসী পড়বে সে কোনো ধরণের প্রতিবন্ধকতা ব্যতীতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আয়াতুল কুরসী পড়তে ১/২ মিনিট সময় ব্যয় হয়। এটি অত্যন্ত কম সময়ে আদায় করার মতো খুবই সহজসাধ্য আমল, কিন্তু এর বিনিময়ে প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ قَرَأَ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ عَقْبَ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ اِلاَّ أَنْ يَمُوْتَ–

"প্রত্যেক (ফরজ) নামাজের পরে যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী পড়বে সে ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনো বাধা নেই।" (সহীহ্ আল জামে, হাদীস নং- ৬৪৬৪, নাসাঈ, হাদীস নং- ১০০)

অর্থাৎ যতক্ষণ মহান আল্লাহ জীবন দান করেছেন ততক্ষণ জীবিত থাকবে এবং যখনই মৃত্যু এসে পৃথিবীর জীবনের ইতি ঘটাবে, তখন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আয়াতুল কুরসী পড়ার সময় এর তরজমা ও তাৎপর্য স্মরণে রাখতে হবে। কারণ এর তরজমা ও তাৎপর্য যতটা প্রভাব বিস্তার করবে ঠিক ততটাই ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সেই সাথে মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতা, কুদরত, শক্তি এবং তাঁর অন্যান্য গুণ-বৈশিষ্ট্যও হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করবে।

তাহ্লীল পাঠকারীর জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ

প্রত্যেক মুসলমানই এ কথা জানে যে, মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করার জন্যে তাকবীর বলা হয় এবং তাঁর একত্বের ঘোষণা দেয়ার জন্যে কালেমায়ে তাওহীদ পড়া হয়। আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও প্রিয় কথা তাৎপর্যপূর্ণ এই বাক্যের মধ্যে রয়েছে। তাকবীরের ঘোষণা দেয়াই মহান আল্লাহর কাছে তাওহীদ এবং পূর্ব-পশ্চিমের সর্বত্র তাওহীদের আওয়াজ যখন পৌঁছায়, তখন অগণিত বার এই তাওহীদের আওয়াজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে নাজাত দেয়ার এই তাকবীর ও তাহলীল যুক্ত প্রার্থনামূলক বাক্য নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে অত্যন্ত পসন্দনীয় এবং প্রিয় ছিলো। এ কারণে তাঁর পবিত্র জীবনের প্রত্যেক স্পন্দনেই তাকবীর ও তাহ্লীল উচ্চারিত হতো। এই মহাপবিত্র কথার ফযিলত এতই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন যে, যার জিহ্বা থেকেই এই কথাগুলো উচ্চারিত হয়, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ ঘোষণা করা হয়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَا اَهَلَّ مُهِلٌّ قَطُّ وَلاَ كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قَطُّ اِلاَّ بُشِّرَ بِالْجَنَّةِ–

"কোনো ব্যক্তি যখন তাহলীল পড়ে (অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু উচ্চারণ করে ইহ্রাম বেঁধে লাব্বাইক আল্লাহুমা লাব্বাইক পড়ে) অথবা তাকবীর উচ্চারণ করে, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শোনানো হয়।" (জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং- ৫৫৬৯, মাজমাউ'য যাওয়ায়েদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠ-২২৪, বায়হাকী, হাদীস নং- ৪০২৯)

তাহলীলের অর্থ তালবিয়াও হয় যা ইহরাম বেঁধে পড়তে হয়। এর ফযিলত সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যে হাদীসে জান্নাতের সুসংবাদের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, যেদিন কোনো ব্যক্তি তালবিয়া পড়ে ঐ দিন সূর্য অস্ত যাবার পূর্বেই তালবিয়া পাঠকারীর গোনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (তাবারাণী, তারগীব ওয়াত্ তারহীব, হাদীস নং- ১৭০৪)

এই বিরাট সুসংবাদ ঐ সকল মুসলমানের জন্যে যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ করে তৃপ্তিবোধ করে এবং যারা ইহরাম পরিধান করে তালবিয়া উচ্চস্বরে উচ্চারণ

করতে থাকে। এ সকল মুসলমানের গোনাহ্ ক্ষমা করে দেয়ার সাথে সাথে জান্নাতের সুসংবাদও দেয়া হয়। যখন কোনো মুসলমান তালবিয়া উচ্চারণ করে, তখন তার সাথে সাথে সৃষ্টির অনু-পরমাণুও তালবিয়া উচ্চারণ করতে থাকে।

সহজ একটি বাক্য উচ্চারণের বিনিময় জান্নাত

সহজসাধ্য ও সহজলভ্য নেকীর মধ্যে আরেকটি ছোট্ট কল্যাণময় বাক্য– যা মুখে উচ্চারণ করা খুবই সহজ এবং ত্রিশ সেকেন্ডেরও কম সময় ব্যয় হয়। পাঁচ মিনিটে এ বাক্যটি কমপক্ষে পঞ্চাশ বার উচ্চারণ করা যায় এবং এর বিনিময়ে বিপুল সওয়াবই শুধু পাওয়া যায় না, বরং সেই ব্যক্তির প্রতি জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি হৃদয়-মন দিয়ে বলেছে–

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلاً– وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ–

রাদ্বিতু বিল্লাহি রাব্বা ওয়া বিল ইসলামে দ্বীনান ওয়া বিমুহাম্মাদিন (সাঃ) রাসূলা।

"মহান আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে নিজের (নির্ভুল) জীবন বিধান হিসেবে এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে রাসূল হিসেবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট, সেই ব্যক্তির প্রতি জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" (আবু দাউদ, হাদীস নং- ১৫২৯, মুসলিম, হাদীস নং- ১৮৮৪)

মুসলিম শরীফের আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহকে নিজের প্রতিপালক, ইসলামকে নিজের জীবন ব্যবস্থা ও নবী করীম (সাঃ)-কে রাসূল হিসেবে পেয়ে মনে-প্রাণে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়েছে, সেই ব্যক্তির জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

সর্বাগ্রে যাঁরা জান্নাতে প্রবেশ করবেন

যে কোনো অবস্থায় মহান আল্লাহর প্রশংসা করা এমনই এক নেকীর কাজ যা অনেক বড় নেকীর তুলনায় বেশী ভারী। প্রকৃত প্রশংসা বলতে যা বুঝায় তা হলো, মানুষ মুখে মহান আল্লাহর শোকর আদায় করবে এবং মুখে উচ্চারিত শোকর অনুযায়ী বাস্তবে কাজের সাথেও সামঞ্জস্য থাকবে। মুখে আল্লাহর প্রশংসা করবে আর কাজে আল্লাহর নাফরমানী করবে, বিষয়টি যেনো এমন না হয়। সুসময় এবং দুঃসময় যে কোনো অবস্থাতেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করা অর্থাৎ 'আল হামদু লিল্লাহ' বলাই হলো বড় ধরণের নেকীর কাজ।

বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রশংসা করা রাব্বুল আলামীনের কাছে অত্যন্ত পসন্দনীয় কাজ। আর এর বিনিময়ে কিয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহর প্রশংসাকারী বান্দা সর্বপ্রথমে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করবে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّـةِ الَّذِيْنَ يَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ-

"সর্বপ্রথমে জান্নাতের দিকে ঐ সকল লোককে আহ্বান জানানো হবে, যারা সুসময়ে বা দুঃসময়ে যে কোনো অবস্থাতেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করেছে।" (মাজমাউ'য যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, হাদীস নং- ৯৫, তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং- ২৩২৪, মুস্তাদরাকে হাকেম, ১ম খন্ড, হাদীস নং- ৫০২)

আপনিও নিশ্চয়ই এটা চান যে, আপনিও ঐ মহাসৌভাগ্যবানদের অনুরূপ হয়ে এবং সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার লাভ করুন! তাহলে আসুন, আমরা সকলেই যে কোনো অবস্থাতেই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা করতে থাকি।

যেসব লোক জান্নাতের পথ ভুলে যাবে

প্রিয়জন, একান্ত আপনজন বা ঘনিষ্ঠজনের বিচ্ছেদ বেদনা অনুভবের প্রবণতা, প্রিয়হারা মর্মযন্ত্রণায় কাতর হওয়া এবং মায়া-মমতা অনুভব করার প্রবণতা মানুষসহ প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যেই দেয়া হয়েছে। প্রাণী জগতের প্রতি লক্ষ্য করলে তাদের একে অপরের প্রতি আকর্ষণ, প্রাণী জগতে শাবকের প্রতি পিতামাতার মমতা দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। মানুষ যেমন নিজের প্রাণের সর্বাধিক মমতা ও ভালোবাসা অনুভব করে, ঠিক তেমনি সে নিজের পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ও নিকটজনদের প্রতিও প্রবল মমতা অনুভব করে। মানুষের এই মমতা সংক্রামিত হয়ে অপরিচিত আরেক মানুষ পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। সকল মানুষই হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তান এবং এ কারণেই অপরিচিত হলেও একজন মানুষের বিপদে আরেকজন মানুষ হৃদয়ে বেদনা অনুভব করে।

একজন মুসলমানের মায়া-মমতা ও ভালোবাসা অন্যান্য সকল মানুষের মায়া-মমতা ও ভালোবাসার অনুরূপ নয়। মুসলমানের বাহ্যিক জীবন যেমন মহান আল্লাহর বিধানের অধীন, তেমনি তার অভ্যন্তরীণ জগতও আল্লাহর বিধানের অধীন। তার মায়া-মমতা, ভালোবাসা, আবেগ-উচ্ছ্বাস ও হৃদয়ের আকর্ষণ সবই নিয়ন্ত্রিত হবে

কোরআন-সুন্নাহর বিধান অনুসারে। মুসলমানের দুনিয়া-আখিরাতের সাফল্য নির্ভর করে কেবলমাত্র নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি সর্বাধিক আকর্ষণ, তাঁর প্রতি প্রবল ভালোবাসা, মায়া-মমতা এবং সবথেকে বেশী হৃদয়ের টান এবং সেই সাথে তাঁর উপস্থাপিত আদর্শ অনুসরণের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর উপর। এই দুটো জিনিস ব্যতীত কেনো মুসলমানের পক্ষেই দুনিয়া-আখিরাতে সাফল্য লাভ করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। নিজের প্রাণ, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও ধন সম্পদের তুলনায় সবথেকে বেশী ভালোবাসতে হবে নবী করীম (সাঃ)-কে।

হযরত উমার (রাঃ) ইসলাম কবুল করার পরে রাসূল (সাঃ) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি তোমার সকল কিছুর তুলনায় আমাকে সর্বাধিক ভালোবাসতে সক্ষম হয়েছো?' জবাবে তিনি বললেন– 'না, আমি আমার প্রাণের তুলনায় আপনাকে বেশী ভালোবাসতে এখনো পারিনি।' নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'তাহলে তো তুমি পূর্ণ ঈমানদার হতে পারোনি।' তাঁর কথায় হযরত উমার (রাঃ)-এর মধ্যে ভাবান্তর ঘটলো। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে চিন্তা করলেন, 'এই মহামানবের কারণে পৈতৃক আদর্শ পরিত্যাগ করেছি, পৃথিবীর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সহায়-সম্পদ ত্যাগ করেছি। তাহলে প্রাণের মমতাও কেনো ত্যাগ করতে পারবো না! মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় যদি সকল কিছু ত্যাগ করতে পারি, তাহলে শুধুমাত্র প্রাণের মমতার কারণে আমার সকল ত্যাগ বৃথা হয়ে যাবে!'

এই উপলব্ধিবোধ তাঁর মধ্যে জাগ্রত হবার সাথে সাথে তিনি ঘোষণা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! এখন আমি আপনাকে আমার প্রাণ এবং পৃথিবীর সকল কিছুর তুলনায় সর্বাধিক ভালোবাসি।' রাসূল (সাঃ) মৃদু হেসে বললেন, 'এখন তুমি পূর্ণ ঈমানদার হয়েছো।'

নবী করীম (সাঃ)-কে দেখে হোক বা না দেখে হোক, সর্বাধিক ভালোবাসা ঈমানের দাবী। তাঁকে যদি সর্বাধিক ভালোই বাসতে না পারি, তাহলে মুসলিম হিসেবে আমাদের কোনোই মূল্য নেই। আর তাঁর প্রতি ভালোবাসার প্রমাণই হলো, তাঁর আদর্শ অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং তাঁর প্রতি বেশী বেশী দরুদ পাঠ করা। অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ আমলের মধ্যে সর্বাধিক দরুদ পাঠ করা অন্যতম আমল। পৃথিবীর জীবনে যে মুসলমান সর্বাধিক দরুদ পাঠ করবে, জান্নাতে সেই মুসলমান নবী করীম (সাঃ)-এর সান্নিধ্যে অবস্থান করবে। তিনি বলেছেন–

مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَنَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ (أَوْ فَخَطِئَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ) خَطِئَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ–

"যে ব্যক্তির সম্মুখে আমার নাম উচ্চারিত হলে সে ব্যক্তি যদি আমার প্রতি দরুদ পাঠ না করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশের রাস্তা ভুলে যাবে।" (সহীহ্ আল জামে হাদীস নং-৬২৪৫)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ–

আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা সাইয়্যেদিনা ওয়া নাবিইয়্যিনা ও হাবিবিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আস্হাবিহী।

জাহান্নাম থেকে মুক্ত থাকার দোয়া

মানুষের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণকর জিনিসই হলো তার সৎকাজ বা নেক আমল। নেক আমল ব্যতীত মানুষসহ অন্যান্য সকল কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর আখিরাতে মাত্র দুটো স্থানই মানুষের জন্যে নির্ধারিত করা হবে, একটি জান্নাত অপরটি জান্নাত। এ সময় কে চাইবে না যে সে জাহান্নাম থেকে মুক্ত থাক? নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যদি তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাও তাহলে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ–

সুবহানাল্লাহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' পড়তে থাকো। এই বাক্যের মধ্যে তাস্বীহ্, তাহ্লীল ও তাকবীর রয়েছে। যা মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং পসন্দনীয়।

নবী করীম (সাঃ) আরো বলেছেন–

جُنَّتُكُمْ مِنَ النَّارِ، قُوْلُوْا، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، فَاِنَّهُنَّ يَاْتِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مُجَنِّبَاتٍ وَمُعَقِّبَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصّٰلِحَاتُ–

"তোমাদের জন্যে জাহান্নাম থেকে মুক্ত থাকার ঢাল হলো, সুবহানাল্লাহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। এগুলো সেই বাক্য– যা

কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্যে মুক্তির উসিলা হবে, তোমাদের মুক্তির কারণ হবে এবং সর্বদা এই নেকী জারি থাকবে।" (মুস্তাদরাক হাকীম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৫৪১, শুআ'বুল ঈমান, হাদীস নং- ৬০৬, তাবারাণী, ১ম খন্ড, হাদীস নং- ১৪৫)

অল্প সময়ের আমলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব

নবী করীম (সাঃ) যে সকল দোয়া করেছেন, এসব দোয়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, উম্মতকে শিখানোর জন্যে তিনি প্রত্যেক দোয়াতেই কবরের আযাব এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চেয়েছেন। এসব দোয়া তিনি সাহাবায়ে কেরামকেও শিখিয়েছেন এবং তাঁরা এ সকল দোয়াকে দৈনন্দিন জীবনের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় অংশে পরিণত করেছিলেন। জান্নাতে প্রবেশ করা ও জাহান্নাম থেকে মুক্ত থাকা একান্তই মহান আল্লাহর রহমতের ওপর নির্ভর করে আর এ জন্যেই মহান আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী হয়ে বার বার তাঁর কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইতে হবে।

এ কারণে নবী করীম (সাঃ) তাঁর উম্মতদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত থাকার অগণিত পথের সন্ধান যেমন দিয়েছেন, তেমনি শিখিয়েছেন অসংখ্য দোয়া। এর মধ্যে এমন একটি দোয়া তিনি শিখিয়েছেন, যা আকারে ছোট হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মুখস্থ করে আমল করাও খুবই সহজ। তিনি বলেছেন–

اِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِى مِنَ النَّارِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ فَاِنَّكَ اِنْ مُتَّ مِنْ يَوْمِكَ كَتَبَ اللّٰهُ لَكَ جِوَارًا مِنَ النَّارِ وَاِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ، فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ فَاِنَّكَ اِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ كَتَبَ اللّٰهُ لَكَ جِوَارًا مِنَ النَّارِ–

"যখন তুমি সুবহে সাদিকের সময় অর্থাৎ ফজরের নামাজ আদায় করবে, তখন কারো সাথে কথা বলার পূর্বে সাত বার এই দোয়া পড়বে 'আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্ নার'। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!

যদি তুমি সেই দিনই ইন্তেকাল করো তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নাম থেকে মুক্তদের তালিকায় তোমাকে অন্তর্ভুক্ত করবেন। আর মাগরিবের নামাজের পরে

সাতবার এই দোয়া পড়ো, তাহলে সেই রাতে যদি তোমার ইন্তেকাল হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা জাহান্নাম থেকে মুক্তদের তালিকায় তোমাকে অন্তর্ভুক্ত করবেন।" (আবু দাউদ, হাদীস নং-৫০৭৯, ইবনে হাব্বান, হাদীস নং-৩২৪৬)

উক্ত দোয়াটি আকারে খুবই ছোট এবং সহজে মুখস্থ্ করার মতো দোয়া। প্রত্যেক দিন ফজরের ফরজ নামাজের সালাম ফিরিয়ে কারো সাথে কথা বলার পূর্বে সাতবার পড়তে মাত্র দশ সেকেন্ড সময় ব্যয় হবে। মাত্র দশ সেকেন্ড সময় ব্যয় করলে জাহান্নামের অকল্পনীয় লোমহর্ষক আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, এর থেকে বড় সুসংবাদ মুসলমানদের জন্যে আর কি হতে পারে!

কোনো ফাঁসির আসামীকে যদি বলা হয়, তুমি মাত্র দশ মিনিট সময় ব্যয় করে যদি অমুক কাজটি করো, তাহলে ফাঁসির দন্ড মওকুফ করে তোমাকে যাবজ্জীবন কারদন্ড দেয়া হবে। ফাঁসির আসামী এ কথা শুনলে দশ মিনিট কেনো, হাজার ঘন্টা সময় ব্যয় করে হলেও নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার কোনো চেষ্টাও করছি না এমনকি জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছি।

অথচ প্রতিদিন আমরা এমন অসংখ্য কাজ করছি, যে কাজ করলে অবশ্য অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে। সুতরাং জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রেখে, মহান আল্লাহর রহমতের ওপর নির্ভর করে প্রত্যেক দিন এই ছোট্ট আমলটি ফজর ও মাগরিবের নামাজের সময় করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে মুক্ত রাখুন, আমীন।

সপ্তম অধ্যায়

দরুদ পাঠকারী ঈমানের ওপরে ইন্তেকাল করে

একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমত ও অনুগ্রহেই মানুষ নির্ভুল পথনির্দেশনা পেয়ে থাকে এবং নেক কাজ করার সুযোগ পায়। মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালার রহমতেই মানুষ কল্যাণময় সঠিক পথে চলতে পারে এবং একমাত্র তাঁরই করুণা ও অনুগ্রহেই মানুষ ঈমানের ওপর অবিচল থেকে অনন্ত অসীম আখিরাতের জগতের দিকে যাত্রা করতে পারে। সহীহ্ হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, প্রত্যেক মানুষের ইন্তেকালের নির্ধারিত সময় মহান আল্লাহর দরবারে পরিদৃশ্যমান রয়েছে এবং মানুষের জীবনের শেষ দিনগুলোয় তার জন্যে মুক্তি ও কল্যাণের ঠিকানা নির্ধারিত হয়ে যায়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِخَوَا تِيْمِهَا-

মানব জীবনের সকল কর্মের মধ্যে শেষ কর্মটিই নির্ভরশীল। (বোখারী, হাদীস নং- ৬৪৯৩, মুসলিম, হাদীস নং- ১১২)

সকল সাহাবায়ে কেরাম, সালফে সালেহীন ও বুযর্গানে দ্বীন সম্পর্কে জানা যায় যে তাঁরা সমগ্র জীবনব্যাপী তাদের শেষ পরিণতি উত্তম অবস্থায় হবার জন্যে এভাবে দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! ঈমানের সাথে যেনো আমাদের পৃথিবীর জীবন নিঃশেষ হয়। হযরত উমার (রাঃ) দোয়া করতেন, 'আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু নসীব করো।' তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর দোয়া এমন ছিলো–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ-

"আল্লাহুম্মার যুক্বনী শাহাদাতান ফী সাবিলিকা ওয়াজ্ আ'ল মাওতী ফী বালাদি রাসূলিকা অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদাতের মৃত্যু দিও এবং তোমার রাসূলের শহরে আমাকে মৃত্যু দিও।"

প্রত্যেক মুসলমানের জীবনের সর্বোত্তম উদ্দেশ্য এটাও হওয়া উচিত যে, তার যেনো শাহাদাতের মৃত্যু নসীব হয়। কবি বলেছেন–

شہادت ہے مطلوب و مقصود مؤمن

نہ مال غنیْمت نہ کشور کشائی

"মুমিন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই হলো শাহাদাতের মৃত্যু, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা সাম্রাজ্য অর্জন নয়।"

কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানই জানে না যে, সর্বাধিক দরুদ পাঠ করার মাধ্যমেই কেবলমাত্র উচ্চ সম্মান ও মর্যাদাজনক মৃত্যু নসীব হতে পারে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বলেছে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

"আল্লাহুম্মা সাল্লিআ'লা মুহাম্মাদ (সাঃ), আল্লাহুম্মা আনযিলহুল মাকুআ'দাল মুক্বাররাবা ই'নদাকা ইয়াও মাল কিয়ামাতি অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! রাসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতি সালাত ও সালাম নাযিল করো, হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তোমার সান্নিধ্যে উচ্চমর্যাদা তাঁকে নসীব করো।' সেই ব্যক্তির জন্যে আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়।" (আহ্মাদ, চতুর্থ খন্ড, হাদীস নং- ১০৮, জামেউ'য যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৬৩)

ইমাম মোল্লা আলী কারী (রাহঃ) লিখেছেন–

وَفِيْهِ اِشَارَةٌ اِلَى بِشَارَةِ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ–

"এর মধ্যে (উল্লেখিত হাদীসে) সর্বোত্তম শেষ পরিণতির প্রতি দিক-নির্দেশনা রয়েছে।" (আল মুরকাহ্, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৭)

একবার দরুদ পাঠের বিনিময় ৭০ বার ক্ষমা প্রাপ্তি

নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি সর্বাধিক দরুদ পড়া ও সালাম প্রেরণ করা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আমল এবং অধিক নেকীর কাজ। কোনো কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্যক্তি ১ বার নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি দরুদ পড়বে তার ১০টি গোনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে, ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হবে এবং তার আমলনামায় ১০টি নেকী লেখা হবে। আমরা এখানে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস উল্লেখ করছি, যে হাদীসে বলা হয়েছে, ১ বার দরুদ পাঠ করলে আল্লাহ তা'য়ালা ও ফিরিশ্তাগণের পক্ষ থেকে দরুদ পাঠকারীর প্রতি ৭০ বার রহমত ও বরকত নাযিল করা হয়।

অর্থাৎ ১ বার দরুদ পাঠকারীর জন্যে ফিরিশ্তাগণ ৭০ বার ক্ষমা ও রহমতের দোয়া করে থাকেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاحِدَةً
صَلَّى اللّٰهُ وَ مَلَائِكَتُهُ عَلَيْهِ سَبْعِيْنَ صَلَاةً–

"যে ব্যক্তি ১ বার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'য়ালা ও ফিরিশ্তাগণ ঐ ব্যক্তির জন্যে ৭০ বার রমহত ও ক্ষমা নাযিল করেন।" (আহ্মাদ, হাদীস নং- ৬৭৫৪, মাজমাউ'য যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ১৬০)

আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে সালাত প্রেরণ করার অর্থ হলো, আল্লাহ তা'য়ালা ঐ সৌভাগ্যবান মুসলমানের প্রতি ৭০ বার ক্ষমা অবতীর্ণ করেন, ৭০টি মর্যাদা বৃদ্ধি

করে দেন এবং ৭০টি গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন। আর ফিরিশ্‌তাগণের সালাত প্রেরণের অর্থ হলো, দরুদ পাঠকারীর জন্যে তাঁরা ৭০ বার রহমতের আবেদন, ৭০টি মর্যাদা বৃদ্ধির ও ৭০ বার ক্ষমার আবেদন করেন।

এটাও অতি সহজে নেকী অর্জনের একটি উপায়। এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বিপুল সওয়াব দান করেন ও সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন।

জিহ্বাই মুক্তি ও শাস্তির কারণ

আমরা আমাদের জিহ্বার মাধ্যমে যে শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ করি তার প্রত্যেকটি শব্দ লেখার জন্যে কিরামান-কাতিবীন প্রস্তুত রয়েছে এবং দ্রুত তাঁরা খাতায় লিপিবদ্ধ করছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ–

"তোমরা যখন যা করছো আমি তা এখানে সেভাবেই লিখে রাখছি।" (সূরা জাসিয়াহ্ঃ ২৯)

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র বলেন–

وَاِنَّا لَهُ كَاتِبُوْنَ–

"আমি তার জন্যে তার প্রতিটি কাজই লিখে রাখি।" (সূরা আম্বিয়াঃ ৯৪)

সূরা ইয়াছিনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ–

"যা কিছু তারা নিজেদের কর্মকান্ডের চিহ্ন হিসেবে এ পৃথিবীতে রেখেছে ও রাখছে, সেগুলো সবই আমি যথাযথভাবে লিখে রাখি।" (সূরা ইয়াছিনঃ ১২)

নবী করীম (সাঃ) বলেন–

اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا يَزِلُّ بِهَا اِلَى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ–

"বান্দা একটি বাক্য উচ্চারণ করে কিন্তু এতে সাবধানতা অবলম্বন করে না, ফলে সে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান পথ জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হয়।" (বোখারী, হাদীস নং- ৬৪৭৮)

অর্থাৎ মানুষের একটি মাত্র অশোভনীয় কথার কারণেই জাহান্নামের দিকে সে ঐ পরিমাণ পথ এগিয়ে যায়, যে পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। সুতরাং চিন্তা করা প্রয়োজন, আমরা দিনরাতে কত সংখ্যক অশোভনীয় কথা বলে জাহান্নামের কত কাছাকাছি পৌছে যাচ্ছি। আরেক হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَا يُلْقِىْ بَالاً يَرْ فَعُهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لاَيُلْقِىْ لَهَا بَالاً يَهْوِىْ بِهَا فِىْ جَهَنَّمَ–

"বান্দা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক একটি শব্দ উচ্চারণ করে, যা তার জন্যে নেকীর কারণ হয়, কিন্তু সে ধারণাও করতে পারে না যে তার উচ্চারিত এই শব্দের বা বাক্যের কারণে সে বিপুল পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হচ্ছে। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ তাঁর ঐ বান্দার উচ্চারিত কথার কারণে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

অনুরূপভাবে বান্দা পাপাচার, গোনাহের ও মহান আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করার মতো শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করে কিন্তু এ ব্যাপারে সে অনুভবও করতে পারে না যে, সে কত জঘন্য শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করেছে। কিন্তু তার উচ্চারিত ঐ শব্দ বা বাক্যের জন্যে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।" (বোখারী, হাদীস নং- ৬৪৭৮)

আমরা দিনরাত অহর্নিশি কত শব্দ, কথা ও বাক্য উচ্চারণ করি? চব্বিশ ঘন্টায় আমাদের জিহ্বা কত কিছুই না বলে এবং কত কথাই না উচ্চারণ করতে থাকে? কিন্তু অসতর্কভাবে মনে যা কিছু আসছে তাই মুখে উচ্চারণ করা হচ্ছে, সাধারণভাবে এর পরিণতি খুবই খারাপ। একদিন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর মুখ থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে একটি কথা উচ্চারিত হলো। উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) সম্পর্কে অসতর্কভাবে বললেন, তাঁর দেহের আকৃতি ছোট (বেঁটে)। নবী করীম (সাঃ) এ কথা শুনতে পেয়ে হযরত আয়িশা (রাঃ)-কে বললেন, তুমি তাঁর সম্পর্কে যে কথা বলেছো, তা এতটাই কঠিন ও খারাপ যে, এ কথা যদি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হতো তাহলে (এ অপসন্দনীয় কথার কারণে) সমুদ্রের পানি দুর্গন্ধময় হয়ে যেতো।

لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ–

"হে আয়িশা! তুমি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করেছো, যদি তা সমুদ্রের পানিতে নিক্ষেপ করা হতো, তাহলে সমুদ্রের পানি গন্ধময় হয়ে যেতো।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ২৫০৪, আবু দাউদ, হাদীস নং- ৪৮৫৭)

বনী ইসরাঈলীদের কাছ থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ কথার ওয়াদা ও শপথ গ্রহণ করা হয়েছিলো তার মধ্যেও একটি কথা এমন ছিলো–

قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا–

"মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলবে।" (সূরা বাকারাঃ ৮৩)

আমাদের প্রতিও সেই একই আদেশ করা হয়েছে আমরাও যেনো জিহ্বার সংযত ব্যবহার করে সকলের সাথে সর্বাবস্থায় ভালো কথা বলি। এ জন্যে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালা ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেনো উত্তম কথা বলে নতুবা নীরব থাকে। (বোখারী, হাদীস নং- ৬৪৭৬, মুসলিম, হাদীস নং- ৪৮)

জিহ্বার সংযত ব্যবহার

মহান আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদের প্রতি ঈমান-আকীদা পোষণ করার প্রতিই মানুষের সকল আমল নির্ভর করে। ঈমান ও ইখলাসের এক নিজস্ব তাৎপর্য রয়েছে। অনুরূপভাবে নামাজ এবং ইসলামের অন্যান্য আরকানেরও এর নিজস্ব অবস্থানে এক অটল বাস্তবতা রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) উক্ত সকল আমল-আকীদা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ও ওয়াজিবের তাৎপর্য বর্ণনা করার পরে এক তাৎপর্যমূলক কাজের প্রতি নির্দেশ করেছেন। এ ব্যাপারে জিহ্বার গুরুত্ব পর্যন্ত পৌঁছে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন–

اَلاَ اُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذٰلِكَ كُلِّهٖ؟ كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا وَأَشَارَ اِلٰى لِسَانِهٖ

"সমগ্র আমলের মোকাবেলায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কি আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করবো না? এরপর জিহ্বার প্রতি ইশারা করে তিনি বললেন, একে সংযত রাখো।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ২৬১৬)

এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) আরো বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ تَعَلٰى عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ فَلْيَنْظُرْ عَبْدٌ مَاذَا يَقُوْلُ–

"অবশ্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক মানুষের জিহ্বার কাছেই রয়েছেন, মানুষের এটা উচিত সে কিছু বলার পূর্বে চিন্তা করবে সে কি বলছে।" (ইবনে আবি শাইবাহ্, ৮ম খন্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৩২, হাদীস নং- ৫৩)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সম্পর্কে একজন বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে রুকনে ইয়ামানী ও কা'বা শরীফের দরজার মধ্যবর্তী স্থানে নিজের জিহ্বার অগ্রভাগ ধরা অবস্থায় দেখেছি। তিনি বলছিলেন, 'তোমার সর্বনাশ হোক! কথা যদি বলতে চাও তাহলে উত্তম কথা বলো, তোমার ভালো হবে। অথবা অশুভ ও নিকৃষ্ট কথা বলার চেয়ে নীরব থাকো, তুমি নিরাপদ থাকবে।'

ঘটনা বর্ণনাকারী জানতে চাইলেন, 'হে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)! কি ব্যাপার, আপনি জিহ্বার অগ্রভাগ ধরে আছেন যে?' জবাবে তিনি বললেন, 'এটা আমি উপলব্ধি করেছি যে, বান্দার শরীরে জিহ্বার তুলনায় বিপদজনক জিনিস আর নেই, এই জিহ্বার কারণেই কিয়ামতের দিনে আযাব হবে।' (আবি নাঈম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২৮)

হযরত আ'দী ইবনে হাতীম (রাঃ) বলতেন–

اِنَّ أَيْمَنَ امْرَءٍ وَأَشْأَمَهُ بَيْنَ لِحْيَيْهِ يَعْنِى لِسَانَهُ–

"একজন মানুষকে উত্তম এবং নিকৃষ্ট বানানোর জিনিসই হলো জিহ্বা।" (জামেউয্ যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০)

অর্থাৎ একজন মানুষের জিহ্বা থেকে যদি উত্তম কথা উচ্চারিত হয় তাহলে সে মানুষকে অন্যান্য মানুষ ভালো বলে। আর যদি তার জিহ্বা থেকে অশ্লীল, অশালীন, গালি-গালাজ, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, অভিশাপ, কটাক্ষ ও মনে আঘাতমূলক কথা উচ্চারিত হয়, তাহলে সে মানুষকে সকলেই খারাপ বলে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলতেন–

مَا مِنْ شَىْءٍ أَحَقُّ بِطُوْلِ السِّجْنِ مِنَ اللِّسَانِ–

"প্রতারণার ক্ষেত্রে জিহ্বা নামক অঙ্গের মোকাবেলায় সর্বাধিক শাস্তি লাভের যোগ্য দ্বিতীয় কোনো অঙ্গ নেই।" (তাবারাণী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৪)

আরেক হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ صَمَتَ نَجَا–

"যে নীরব থাকে সে-ই মুক্তি পাবে।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ২৫০১)

বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখিত হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য এ কথাই প্রমাণ করে যে, আমাদেরকে নিজের জিহ্বাকে পরিপূর্ণরূপে সংযত করতে হবে। জিহ্বার মাধ্যমে কোনো শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করার পূর্বে একাধিকবার চিন্তা করতে হবে, উচ্চারিত বাক্যে কারো জন্যে যন্ত্রণার কারণ হবে না তো? উচ্চারিত বাক্য ইসলামী শরীয়াতের বিপরীত হবে না তো? উচ্চারিত বাক্য মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে অসন্তুষ্ট করবে না তো? এসব ব্যাপারে যদি সামান্যতম সন্দেহেরও উদ্রেক হয়, তাহলে জিহ্বা দিয়ে কিছু উচ্চারণ করার পরিবর্তে নীরব থাকাই সর্বাধিক উত্তম। কবি বলেছেন–

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامُ

وَلَا يَلْتَامُ مَاجَرَحَ اللِّسَانُ،

"তেগ-তরবারীর আঘাতজনিত ক্ষত দ্রুত শুকিয়ে যায়, কিন্তু জিহ্বা কর্তৃক আঘাতজনিত ক্ষত কখনো মুছে যায় না।"

আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার প্রকৃত তাৎপর্য

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, ঈমান আনার পরে মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার তুলনায় উত্তম জিনিস আর কিছুই নেই। (তিরমিযী, হাদী নং-৩৫৫৮)

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেন, 'তাঁর কথার মূল তাৎপর্য হলো, ঈমানের পরে সবথেকে বড় সম্পদ হলো মহান আল্লাহর অসীম গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস ও নির্ভরতা।' অন্যান্য চিন্তাবিদগণ বলেন, ইয়াকিন বা নিশ্চিত বিশ্বাস ও নির্ভরতা হলো ঈমানের দ্বিতীয় পুরস্কার। মহান আল্লাহ তা'য়ালার অসীম গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন ও নির্ভর করার উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী শরীয়াত অনুসারে বৈধ উপকরণ সংগ্রহে রেখে মহান আল্লাহর প্রতি ত্রুটিহীন বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্ভর করা। প্রয়োজনীয় প্রকাশ্য উপকরণ সংগ্রহে না রেখে আল্লাহর প্রতি নির্ভর করার নাম 'প্রকৃত নির্ভরতা' নয়। বরং এটা অত্যন্ত 'নিম্ন স্তরের নির্ভরতা ও এক বড় ধরণের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা।'

ইয়েমেনের অধিবাসীগণ যখন হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে নিজের এলাকা থেকে বের হতো, তখন তারা বাড়িতে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ কিছুই সাথে নিতো না এবং বলতো, 'আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল'। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা বাকারার আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের ঐ মৌলিক ভুল ধ্যান-ধারণা অপনোদন ও সংশোধনের লক্ষ্যে আদেশ দিলেন যে, প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহে রাখো। (সূরা বাকারাঃ ১৯৭)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি বলেন, ইয়েমেনের অধিবাসীগণ হজ্জ আদায়ের লক্ষ্যে আসতো, কিন্তু তাঁরা পাথেয় কিছুই আনতো না এবং বলতো, 'আমরা আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করেছি।' যখন তাঁরা মক্কা পর্যন্ত পৌঁছাতো তখন লোকজনের কাছে সাহায্য চাইতো। এ সময় মহান আল্লাহ্ আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন যে, 'পাথেয় গ্রহণ করো এবং সর্বোত্তম পাথেয় হলো আল্লাহভীরুতা'। অর্থাৎ অন্যের কাছে হাত বাড়ানো থেকে বিরত থাকা। (বোখারী, হাদীস নং- ১৫২৩)

মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণের অপরিহার্যতা সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ اِحْرِصْ عَلٰى مَايَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلاَ تَعْجَزْ وَاِنْ اَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ اَنِّيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَاللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ–

"শক্তি-সাহস ও সামর্থবান মুমিন, দুর্বল ও সাধারণ পর্যায়ের মুমিনের তুলনায় উত্তম। উভয় মুমিনই উত্তম কিন্তু তোমার জন্যে যা কল্যাণকর তা অর্জন করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখো এবং মহান আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল হও এবং নির্ভর করো। দুর্বলতা ও অসাহয়ত্ব প্রদর্শন করো না, যদি তোমাদের প্রতি আকস্মিকভাবে কোনো ধরণের বিপদ-মুসিবত, দুর্ঘটনা নেমে আসে বা আঘাত পাও, তাহলে এ কথা বলো না যে, 'আমি যদি ওমন করতাম তাহলে এটা হয়ে যেতো' বরং এ কথা বলো, 'যা কিছু মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিলো তাই-ই হয়েছে'। কারণ 'যদি' শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে শয়তানী আমলের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।" (মুসলিম, হাদীস নং- ২৬৬৪)

উল্লেখিত হাদীসে ঐসব মুমিনদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা অতি সাধারণ, দুর্বল ও কর্মবিমুখ না হয়ে দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণের জন্যে সাধ্যানুযায়ী শ্রম দেয়, প্রকাশ্য বৈধ উপকরণ সংগ্রহে রাখে এবং সেই সাথে মহান আল্লাহর প্রতিও আস্থাশীল থেকে তাঁরই প্রতি নির্ভর করে।

মহান আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে একটি নাম 'আল ওয়াকীল'। এই নামের তাৎপর্যের ব্যাপারে ইবনুল আসীর (রাহঃ) ও ইমাম গায্যালী (রাহঃ) লিখেছেন,

'মুমিন তার প্রত্যেক স্পন্দনে ও কাজেকর্মে আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রতি নির্ভর করে, এ জন্যেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে একটি নাম 'আল ওয়াকীল' রেখেছেন। (আন্ নিহায়া, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২২১)

আল ওয়াকীল আরবী শব্দ এবং এটি মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম। এর অর্থ হলো, যার প্রতি নির্ভর করা যায়, যিনি অন্যের কাজ করে দেন, যিনি অন্যের কাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই শব্দ থেকেই বাংলাভাষায় উকিল শব্দটি এসেছে অর্থাৎ ইংরেজী ভাষায় যাকে এ্যাডভোকেট বলা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) ও ইবনুল আ'স (রাঃ) বলেছেন, তাওরাতে নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশ এভাবে লেখা ছিলো–

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَحِرْزً لِّلْاُمِّيِّيْنَ، اَنْتَ عَبْدِيْ وَرَسُوْلِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ–

"হে নবী (সাঃ)! আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ প্রদানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং আরবের অধিবাসীদের রক্ষাকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। আপনি আমার বান্দাহ্ ও রাসূল, আমিই আপনার নাম 'মুতাওয়াক্কিল' (নির্ভরকারী, ভরসাকারী) রেখেছি।" (বোখারী, হাদীস নং- ৪৮৩৮)

ইমাম ইবনে হাজার (রাহঃ) লিখেছেন, নবী করীম (সাঃ)-কে অল্পে তুষ্টিসম্পন্ন, দান-সাদকাকারী এবং অসীম ধৈর্যশীল বানানো হয়েছিলো। তাঁর এই অভ্যন্তরীণ গুণ-বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাঁকে 'মুতাওয়াক্কীল' নামে পরিচিত করা হয়েছে। (ফতহুল বারী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৫০)

মুসলমান পৃথিবীতে জীবনকালে নিজের দ্বীন-দুনিয়ার সফলতার জন্যে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয়-স্বজনের কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে যে বৈধপন্থা অবলম্বন করে, এটাই যদি সে ঈমান, ইখলাস ও ইসলামী শরীয়াতের আওতায় থেকে করে তাহলে এটাকেই ইবাদাত বলা হয়। জীবন ধারণের বাহ্যিক উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করে তারপর মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থার মাধ্যমে একান্তভাবে তাঁরই প্রতি নির্ভরশীল হতে হবে। যদি নির্ভরতার উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি পৌঁছতে পারে, তখন মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে গায়েবী সাহায্যও অর্জন করা যায়। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে–

لَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرُزِقْتُمْ كَمَا

يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا–

"যদি তুমি আল্লাহর প্রতি নির্ভর করতে থাকো এমনভাবে নির্ভর করো যেমনভাবে নির্ভর করা উচিত। তাহলে তোমাকে এমনভাবে রিয্ক পৌছানো হবে, পাখীসমূহকে যেমনভাবে রিয্ক দেয়া হয়। প্রভাতে শূন্য উদরে তারা বাসা থেকে বের হয় আর সন্ধ্যায় পরিপূর্ণ পেটে বাসায় ফিরে আসে।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ২৩৪৪)

আরেক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে–

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ اَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ اَفْئِدَةِ الطَّيْرِ–

"জান্নাতে এমন মানুষ প্রবেশ করবে, যাদের হৃদয় পাখীর হৃদয়ের মতো হবে।" (মুসলিম, হাদীস নং- ২৮৪০)

হাদীসে পাখীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার মধ্যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। পাখীর হৃদয় খুবই কোমল ও পরিচ্ছন্ন হয়। অনুরূপভাবে মুসলমানদেরকেও হৃদয়কেও কোমল এবং অন্যের ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন করতে হবে। দ্বিতীয় তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা হলো পাখী মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে। তারা সঞ্চয়ও করে না বা সংঘ-সমিতিও ও অন্যান্য পথও অবলম্বন করে না। প্রত্যেক দিন সকালে রিয্কের অন্বেষণে বের হয়ে যায়, মহান আল্লাহ তাদেরকে রিয্ক দিয়ে দেন। প্রত্যেক মুসলমানকেই রিয্কের অন্বেষণ করতে হবে এবং নির্ভর করতে হবে মহান আল্লাহর প্রতি যে, তিনিই রিয্কদাতা এবং তিনিই রব, প্রতিপালক। মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করার অর্থ এটা নয় যে, মানুষ নিজের হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে মনে করবে যে, যা তাকদীরে রয়েছে তাই পাওয়া যাবে। বরং প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে এর পরিণতি মহান আল্লাহর প্রতি ছেড়ে দেয়ার নামই হলো তাঁর প্রতি নির্ভর করা।

ইমাম তিরমিযী (রাঃ) উদ্ধৃত করেছেন–

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض)قَالَ، قَالَ رَجُلٌ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ، أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ، اَعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ–

"হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন এক ব্যক্তি আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে আল্লাহর প্রতি

নির্ভর করবো, না কিছু সংগ্রহ করা ব্যতীতই আল্লাহর ওপর নির্ভর করবো? জবাবে নবী করীম (সাঃ) বললেন, প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করেই মহান আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল হও এবং নির্ভর করো।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ২৫১৭)

উল্লেখিত হাদীস থেকে এ কথা জানা যায় যে, মহান আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থাশীল হওয়া এবং তাঁরই প্রতি নির্ভরশীল হওয়া ও হালাল রিয্ক অন্বেষণ করা জান্নাত লাভের উপায়। মানুষের জন্যে এটা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ও চরম সতর্কবাণী যে, হে মানুষ! তোমার থেকে পাখী অনেক উত্তম। কারণ পাখীর আজকের দিনের রিয্কের চিন্তা রয়েছে, কিন্তু আগামী কালের চিন্তা নেই। কেননা যিনি মাওলা, যিনি স্রষ্টা, তিনিই রায্যাক। তিনিই আজ রিয্ক দিচ্ছেন, আগামীকালও তিনিই দিবেন।

কিন্তু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের অবস্থা এমন যে, পার্থিব সুখ-শান্তির আশায় বৈধ ও অবৈধ যে কোনো পন্থা অবলম্বনেও দ্বিধা করে না। মৃত্যুর পরের জগত, কবরের জীবনকাল এবং কিয়ামতের ভয়ঙ্কর দিনের কথা স্মরণেই থাকে না, অথচ সে সময়ের একটি দিন পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দীর্ঘায়িত হবে।

প্রবাস জীবনে মৃত্যুবরণকারীর উচ্চমর্যাদা

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهٖ قِيْسَ لَهٗ مِنْ مَوْلِدِهٖ اِلٰى مُنْقَطَعِ اَثَرِهٖ فِى الْجَنَّةِ-

"মানুষ (ঈমানদার মুসলমান) নিজ মাতৃভূমি থেকে কোনো দূরদেশে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার জন্মের স্থান থেকে মৃত্যুবরণের স্থানের দূরত্ব পরিমাপ করে জান্নাতে স্থান দেয়া হয়।" (মিশকাতুল মাসাবীহ্, হাদীস নং- ১৫৯৩, ফয়যুল কাদীর, হাদীস নং- ১৯৮৫, জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং- ১৬১৬)

সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের অভ্যন্তরে এমন কিছু প্রবণতা দান করা হয়েছে, যা প্রত্যেক মানুষের জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিজ মাতৃভূমি বা জন্মস্থানের প্রতি এক অপ্রতিরোধ্য দুর্দমনীয় আকর্ষণ। মানুষ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করে এবং যেটি তার প্রকৃত দেশ সে দেশের প্রতি মানুষ স্বভাবগতভাবেই মায়া-মমতা অনুভব করে এবং সে দেশকেই প্রিয় মনে করে। নবী করীম (সাঃ) পবিত্র মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মক্কার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিলো অতুলনীয়। হিজরতের পরে পবিত্র ভূমি মক্কার প্রতি তাঁর স্বভাবগত মায়া-মমতা ও ভালোবাসার চিত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আদী আয্যুহ্রী (রাঃ) এভাবে অঙ্কন করেছেন-

رَأَيْتُ رَسُوْلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلٰى رَاحِلَتِهٖ عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ وَاللّٰهِ انَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ أَرْضِ اللّٰهِ وَلَوْ لَاانِّىْ أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَاخَرَجْتُ–

"আমি নবী করীম (সাঃ)-কে সেই অবস্থায় দেখেছি, তিনি নিজ বাহনের ওপর বসে বলছিলেন, হে মক্কা! তুমি মহান আল্লাহর কাছে সবথেকে প্রিয় ও কল্যাণময় যমীন। আমাকে যদি এখান থেকে বের করে না দেয়া হতো তাহলে আমি কখনোই এ স্থান ত্যাগ করতাম না।" (তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৯২৫, ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং- ১৩০৮, আহ্মাদ, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫)

হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের দেশের প্রতি প্রবল আকর্ষণবোধের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। (হিজরতের পরে মদীনার আবহাওয়া অনুকূল না হবার কারণে) হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত বিলাল (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। উম্মুল মুমিন হযরত আয়িশা (রাঃ) সেবাযত্নের লক্ষ্যে তাদের কাছে গেলেন। এ সময় প্রবল অসুস্থতার মধ্যেও নিজ মাতৃভূমির প্রতি মায়া-মমতা, ভালোবাসা এবং মাতৃভূমি মক্কার বিচ্ছেদ বেদনা, দুঃখ-যন্ত্রণাবোধ আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিলো। হযরত আয়িশা (রাঃ) ফিরে এসে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে নিজ পিতা হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত বিলাল (রাঃ)-এর মাতৃভূমি মক্কার বিচ্ছেদ বেদনা সম্পর্কে বলা কথাগুলো বললেন, তখন রাসূল (সাঃ) মহান আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে আবেদন করলেন–

أَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ اَوْاَشَدَّ–

"হে আল্লাহ! আমাদের হৃদয়ে মদীনা মুনাওয়ার প্রতি প্রবল আকর্ষণ মায়া-মমতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও, যেমন দিয়েছো মক্কার প্রতি। বরং মক্কার তুলনায় মদীনার প্রতি অধিক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও।" (বোখারী, হাদীস নং- ১৮৮৯, মুসলিম, হাদীস নং- ১৩৭৬)

শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নিজ মাতৃভূমির প্রতি মায়া-মমতা ও আবেগ-উচ্ছ্বাস ত্যাগ করে প্রবাসে জীবন-যাপন করে এবং এ অবস্থায় যদি কারো ইন্তেকাল হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্যে অবশ্যই সেই বিরাট সুসংবাদ রয়েছে, যা প্রথমেই উল্লেখিত হাদীস থেকে আমরা জানতে পেরেছি।

উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আব্দুর রউফ আল মানাভী বলেছেন, যে মুসলমান প্রবাসে ইন্তেকাল করে এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়, এ অবস্থায়

তার জন্মভূমি থেকে মৃত্যুর স্থান পর্যন্ত কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়। তার কবর থেকে জান্নাত পর্যন্ত একটি দরজা খুলে দেয়া হয়। এই বিশাল সম্মান-মর্যাদা ঐ ব্যক্তির জন্যেই প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি প্রবাস জীবনে কোনো ধরণের গোনাহ্ ও নাফরমানী থেকে দূরে অবস্থান করেছে। (ফয়যুল কাদীর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৬)

কিছু সংখ্যক আলেম-ওলামা বলেছেন, প্রবাসে ঈমান ও আমলে সালেহ্ তথা আল্লাহর বিধান অনুসরণরত অবস্থায় যারা ইন্তেকাল করেছে, তাদের জন্যেই জান্নাতে সম্মান-মর্যাদা রয়েছে। কতিপয় আলেম বলেছেন, তাদের কবর প্রশস্ত করে দেয়া হয়। আবার কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন, যিনি প্রবাসে ইন্তেকাল করেছেন তার জন্যে কবর এবং জান্নাত উভয় স্থানেই সম্মান-মর্যাদা রয়েছে। মহান আল্লাহ্র রহমতের প্রশস্ততা অসীম অকল্পনীয়। প্রবাসে মৃত্যুবরণ করা সেই মৃত্যু, যার প্রতি মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা রহমত বর্ষণ করে থাকেন।

কিন্তু শর্ত হলো, প্রবাসে যিনি ইন্তেকাল করেছেন তিনি ঈমানের সাথে ইন্তেকাল করলে হাদীসে বর্ণিত বিষয়গুলো তার জন্যে প্রযোজ্য হবে। নাফরমান, আত্মম্ভরী-অহঙ্কারী, বিদ্রোহী, অপরাধী-দোষী, কবীরা গোনাহে লিপ্ত সীমালংঘনকারী হঠকারী ব্যক্তির জন্যে উক্ত হাদীসের বর্ণনা প্রযোজ্য নয়।

প্রবাসে বা সফর অবস্থায় মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তির জন্যে এটা এক বিরাট সুসংবাদ যে, প্রবাস জীবন বা সফরের অবস্থাই তার জন্যে মাগফিরাতের উসিলায় পরিণত হয়। এটা তার জন্যে মহাসৌভাগ্যের বিষয় যে, তার জন্ম ও মৃত্যুবরণের স্থান, এর মাঝে যতটুকু দূরত্ব হবে তা পরিমাপ করে তার কবর সেই পরিমাণ প্রশস্ত করে দেয়া হবে এবং তার কবরের সাথে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দেয়া হবে।

বর্তমানে আমাদের মধ্যে অসংখ্য মুসলমান এমন রয়েছে যে, তাঁরা নিজ মাতৃভূমি থেকে দূর-বহুদূরে অবস্থান করছেন। তাদের জন্যে উল্লেখিত হাদীস এক মহাসুসংবাদ বিশেষ। কিন্তু প্রবাসে অবস্থানকারী মুসলিম নারী-পুরুষদের জন্যে এটি অতি জরুরী শর্ত যে, তাঁরা প্রবাসে ইসলামের যাবতীয় নীতিমালা অনুসরণ করে জীবন অতিবাহিত করবেন। নিজে যেমন ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবেন এবং নিজের সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত জনদের সাধ্যানুযায়ী ইসলামের প্রশিক্ষণ দিবেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়ে নিজ পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিদের একত্রিত করে ওসিয়াত এবং নসিহত করেছিলেন–

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ–

"তোমরা কোনো অবস্থাতেই ইসলামী জীবন বিধানের আনুগত্য স্বীকার ব্যতীরেকে মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা বাকারাঃ ১৩২)

প্রত্যেক মুসলমানের জীবনের একমাত্র লক্ষ-উদ্দেশ্য এটাই হওয়া উচিত যে, তারা মহান আল্লাহর দাসত্ব করবে এবং আখিরাতের চিন্তা-চেতনা হৃদয়ে জাগ্রত রাখবে। এ জন্যে ঈমানদারদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا–

“হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেদের ও নিজেদের পরিবার-পরিজনদের জাহান্নামের কঠিন আগুন থেকে বাঁচাও।” (সূরা তাহ্রীমঃ ৬)

নিজ মাতৃভূমি থেকে দূরে অবস্থান করেও নিজের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভুলে থাকা যাবে না। প্রবাস জীবনেও যেমন নিজে ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে, তেমনি অন্যের কাছেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে এবং সেই সাথে নিজের জন্মভূমির কথাও স্মরণে রাখতে হবে। পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনে চাকচিক্যময় লোভনীয় ভোগ-বিলাসে নিজেকে হারিয়ে ফেলা যাবে না, বরং আখিরাতের অনন্ত জীবনের কথা সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে স্মরণে রাখতে হবে।

নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে ভিন্ন দেশে প্রবাস জীবনে অন্যের সভ্যতা-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, নিয়ম-পদ্ধতি, আচার-আচরণে প্রভাবিত না হয়ে বরং নিজের ঈমানী ও রুহানী শক্তি, সৎ আমল ও উত্তম স্বভাব-চরিত্রের প্রভাব অন্যের ওপর বিস্তার করতে হবে। মুসলমান পৃথিবীর যেখানেই অবস্থান করবে, সেখানেই সে ইসলামের একজন মুজাহিদ ও প্রচারকের ভূমিকা পালন করে নিজেকে দা’ঈ ইলাল্লাহর পর্যায়ে উত্তীর্ণ করবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَا لْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَا هَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ–

“ঐ ব্যক্তিই হলো জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধিসম্পন্ন যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে (অর্থাৎ নিজের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন) এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্যে পাথেয় সংগ্রহ করেছে। (অর্থাৎ আখিরাতের জীবনের জন্যে দুনিয়ার জীবনে সর্বোত্তম আমল করেছে) আর নির্বোধ-বোকা ও দুর্বল হলো সেই ব্যক্তি, যে নফসের অনুসরণ করেছে এবং মহান আল্লাহর প্রতি আশা পোষণ করে সবকিছুর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে। অর্থাৎ কোনো প্রকার সৎ আমল ও নেকী অর্জন না করেই ধারণা করেছে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন।” (তিরমিযী, হাদীস নং-২৪৬১)

দুঃখ-কষ্টের বিনিময়ে সওয়াবের বর্ষণ

পৃথিবীতে মুসলমানদের জীবনে প্রত্যেক পদে পদে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষার ধারাবাহিকতা অব্যহত রয়েছে। পরিপূর্ণ মুমীন ব্যক্তি যে কোনো পরিস্থিতি ও পরীক্ষায় ধৈর্য্যের বর্মে নিজেকে আবৃত করে দুনিয়া-আখিরাতে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করতে থাকে। পৃথিবীতে মুসলমানদের জীবনে যতই দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, যন্ত্রণা ও কঠিন বিপদ-মুসিবত আসুক না কেনো, তা বাহ্যিক দিক থেকে একান্তই আকস্মিক এবং সময়ের ব্যবধানে তা দূর হয়ে যায়। জীবনের কঠিন পরীক্ষায় যারা ধৈর্য্য ধারণ করে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশায় দুঃখ-যন্ত্রণা ও বিপদ-মুসিবতের মোকাবেলায় অবিচল থেকে সাফল্যের সাথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাদের জন্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাসুসংবাদ রয়েছে।

সকল মুসলমানকেই নিজের পরিবার-পরিজন, বংশীয় আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজ জীবনের অন্যান্যদের ব্যাপারে প্রবল ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে হবে আর এর বিনিময়ে রয়েছে অগণিত সওয়াব। হযরত আলী (রাঃ) পবিত্র কোরআনের এই আয়াতের–

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ–

'ধৈর্য্যশীলদের পরকালে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।" (সূরা যুমার-১০)

ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'প্রত্যেক অনুসরণ ও আনুগত্যকারীর সকল কাজই উঠিয়ে ওজন দেয়া হবে কিন্তু ধৈর্য্যশীলদের কোনো আমল ওজন দেয়া হবে না। বরং তাদেরকে মুষ্টি পরিপূর্ণ করে অগণিত সওয়াব দান করা হবে এবং এ কথাও বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবন যারা বিপদ-মুসিবতের মধ্যে অতিবাহিত করেছে তাদের জন্যে সেই ভয়ানক দিনে কোনো দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে না এবং বিচারালয়ও স্থাপন করা হবে না। বরং তাদের প্রতি কোনো ধরণের হিসাব ব্যতীতই সওয়াবের বর্ষণ হতে থাকবে।' (তাফসীরে বাগাভী, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৭০, তাফসীরে কুরতুবী, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫, তাফসীরুল লুবাব ফি উলুমুল কিতাব, খন্ড নং-১৬, পৃষ্ঠা-৪৮৭)

পৃথিবীতে দুঃখ-যন্ত্রণা ও বিপদ-মুসিবতে যারা ধৈর্য্য অবলম্বন করেছে, শত্রুর শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোকাবেলায় যারা ধৈর্য্য ধারণ করেছে, বিরক্তিকর ও অপসন্দনীয় অবস্থায় যারা চরম ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছে, কিয়ামতের দিন এসব লোকজন উচ্চ সম্মান-মর্যাদায় ভূষিত হবে এবং তাদের উচ্চ মর্যাদা দেখে সকল লোকজন এই ইচ্ছা পোষণ করবে যে, 'আমরাও যদি জীবনে এ ধরণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতাম তাহলে আমরাও এমন সম্মান-মর্যাদা লাভ করতাম!' এমনকি লোকজন এ কথাও বলবে যে, 'আমাদেরকে খন্ড-বিখন্ড করা হতো, আমাদের দেহকে কেটে টুকরো টুকরো করা

হতো, করাত দিয়ে আমাদেরকে কাটা হতো আর সেই অবস্থায় আমরা যদি ধৈর্য্য ধারণ করতাম, তাহলে আজ এই উচ্চ সম্মান-মর্যাদার স্থান অর্জন করতে পারতাম!' নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

يَوَدُّ اَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يُعْطَى اَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ اَنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيْضِ–

"দুনিয়ার জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা, বিপদ-মুসিবত যাদের নিত্য সাথী ছিলো, বিপদে ধৈর্য্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লোকদের সেই দলকে যে বিনিময় দেয়া হবে তা দেখে কিয়ামতের ময়দানে অন্যান্য লোকজন আকাঙ্খা প্রকাশ করবে, আহা! আমাদের দেহের চামড়া যদি কাঁচি দিয়ে কেটে নেয়া হতো!" (তিরমিযী, হাদীস নং- ২৪০২, মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫)

পৃথিবীতে যে মুসলমানকে একাধিকবার রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, যন্ত্রণা, বিপদ-মুসিবত ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, এ সকল পরীক্ষাকে যে নিজের মালিক মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ভালোবাসার নিদর্শন বলে গণ্য করে ঈমান ও অসীম ধৈর্য্যের সাথে মোকাবেলা করে এগুলো আত্মশুদ্ধির মাধ্যম বানিয়ে নেয়, সে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র দরবারে উচ্চমর্যাদার স্থানে নিজেকে উন্নীত করে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

اِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ، فَلاَ يَزَالُ يَبْتَلِيْهِ بِمَا يَكْرَهُ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ اِيَّاهَا–

"প্রত্যেক মানুষের জন্যেই মহান আল্লাহ্র দরবারে বিশেষ সম্মান-মর্যাদার আসন নির্ধারিত রয়েছে। সাধারণ কোনো নেক আমলের মাধ্যমে বান্দা উক্ত মর্যাদার আসন লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বান্দার অপসন্দনীয় কাজের (যেমন বিপদ-মুসিবত, রোগ-শোক, দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষেপ করে) মাধ্যমে বান্দাকে পরীক্ষা করতে থাকেন এবং এভাবেই বান্দাকে উক্ত সম্মান-মর্যাদার আসন পর্যন্ত পৌঁছে দেন।" (সহীহ আল জামে, হাদীস নং- ১৬২৫)

দৈহিকভাবে রোগে আক্রান্ত করে অথবা অন্যান্য বিপদ-মুসিবতে নিক্ষেপ করে, ফাসিক, কাফির ও দুষ্কৃত প্রকৃতির লোকদের শত্রুতা এবং হয়রানির মাধ্যমেও এ ধরণের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। পক্ষান্তরে যে সকল মুসলমান মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরম ধৈর্য্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে অবশ্যই বিপুল বিনিময় দান করে ধন্য করবেন।

পরিবারে ইসলামের প্রশিক্ষণঃ বিনিময়ে হজ্জের সমান সওয়াব

ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান ও শরীয়াতের বিধি-বিধান শেখা এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা অনেক বড় নেকীর কাজ। মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্যে গিয়ে নামাজ শেষে কিছু সময় ব্যয় করে অভিজ্ঞ আলেমের কাছে ইসলামী শরীয়াতের বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলের দুই একটি বিষয় প্রতিদিন জেনে নেয়ার কাজটিও অত্যন্ত সহজ নেকীর কাজ। এই কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখলে একটু একটু করে শিখতে শিখতে এক সময় অনেক কিছুই শেখা হয়। শিক্ষক, প্রশিক্ষক, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী, জ্ঞান শিক্ষা দানকারী ও গ্রহণকারী এবং জ্ঞান অনুসন্ধানকারী সকলের ব্যাপারেই হাদীসে বড় ধরণের সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে, এই নেক কাজে সকলেই সমান সওয়াবের অধিকারী হয়।

নামাজের পরে মসজিদে বা অন্য কোনো শিক্ষা কেন্দ্রে ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্যে যারা যাতায়াত করে তাদের সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُرِيْدُ اِلاَّ اَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا اَوْ يُعَلِّمَهُ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حَجَّتُهُ–

"যে ব্যক্তি দিনে এই সঙ্কল্প করে মসজিদে গিয়েছে যে, কোনো কল্যাণকর কথা শিখি এবং শিক্ষা দিই, সেই ব্যক্তির জন্যে একটি পরিপূর্ণ হজ্জের সওয়াব রয়েছে।" (মুস্তাদরাকে হাকেম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯১, মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১২২)

বিষয়টি শুধুমাত্র মসজিদ বা অন্য কোনো শিক্ষা কেন্দ্রের সাথেই সম্পর্কিত নয়। ইচ্ছে করলে নিজেদের বাসস্থানকেও ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত করা যেতে পারে এবং বিনিময়ে একটি পরিপূর্ণ হজ্জের সমান সওয়াবও অর্জন করা যেতে পারে। প্রতিদিন সময় নির্ধারিত করে পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে বৈঠক করে মুসলিম হিসেবে যা না জানলেই নয়, এ সম্পর্কিত ইসলামী সাহিত্য, পবিত্র কোরআন-হাদীসের তাফসীর ও ফিকাহ্-এর কিতাবসমূহ থেকে পাঠ করে আলোচনা করা যেতে পারে। এই নেক কাজের নগদ লাভ যেমন পরিপূর্ণ হজ্জের সওয়াব পাওয়া যায়, তেমনি পরিবারের সদস্যগণও ইসলামী বিধি-বিধান জেনে এর ওপর আমল করে কল্যাণ অর্জন করতে পারে।

আল্লাহর পথে বের হবার প্রকৃত অর্থ

মুসলিম উম্মাহ্র জন্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা বিশেষ নিয়ামত যে, মুসলিম উম্মাহ্কে মানব স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা দান করার সাথে সাথে

সবথেকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এই উম্মাতের শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও পথপ্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মানব সম্প্রদায়ের জন্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হিসেবে পবিত্র কোরআন দান করেছেন এবং জীবন সমস্যার সমাধানে কোনো ধরণের সামান্যতম তৃষ্ণাও আল্লাহ তা'য়ালা অপূর্ণ রাখেননি। কারণ পৃথিবী টিকে থাকবে কি থাকবে না, এটা নির্ভরই করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা টিকে থাকার ওপর।

ইসলাম মানুষকে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে, মানব জীবনের জটিল সমস্যার প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে বৈরাগ্যবাদ অবলম্বন করতে বলেনি বরং বৈরাগ্যবাদকে ইসলাম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল এ পৃথিবীতে মানুষের জন্যে যা বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন, তা সংগ্রহ করে জীবনকে সুন্দরভাবে সাজানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশ্বনবী এবং বিশ্বনেতা নবী করীম (সাঃ) মানব জাতির জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত একমাত্র মহান শিক্ষক ও পথপ্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। মানব জীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই, যে দিক ও বিভাগ সম্পর্কে তিনি শিক্ষা দেননি।

তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছেন, আমিই তোমাদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'য়ালাকে সবথেকে বেশী ভয় করে, আমিই তোমাদের মধ্যে সবথেকে বেশী মুত্তাকী-পরহেযগার। আমি রোজাও রাখি এবং ইফতারও করি। অর্থাৎ রোজাও রাখি এবং রোজা পরিত্যাগও করি। আমি রাতে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করি এবং ঘুমও ত্যাগ করি না। আমি নারীদের সাথে বিয়ের বন্ধনেও আবদ্ধ হয়েছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নিয়ম-নীতিরীতি, পদ্ধতি ও আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, আমার আদর্শের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করবে, সেই ব্যক্তি আমার দলভূক্ত নয়। (বোখারী, হাদীস নং- ৫০৬৩, মুসলিম, হাদীস নং- ১৪০১)

আমাদের অধিকাংশের মধ্যে একটি বিরাট ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, মুত্তাকী, পরহেযগারী ও দ্বীনদারী বলতে আমরা শুধুমাত্র নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত, কোরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ্-তাহ্লীল ও অন্যান্য কতিপয় বিষয়কে বুঝি। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, মহান আল্লাহ্ এবং নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিয়ম অনুসারে যে কোনো কাজ করাই দ্বীনদারী, পরহেযগারী ও মুত্তাকীর কাজ। লেখাপড়া ও চিন্তা-গবেষণা করা, চাকরী বা ব্যবসা-বাণিজ্য করা, নেতৃত্ব দেয়া এবং কর্মী হিসেবে নেতার অনুসরণ করা, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিশাল কোনো দেশ বা সমগ্র পৃথিবীর মানব সমাজকে পরিচালনা করা, পরিবার-পরিজনের প্রতি দায়িত্ব পালন করা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সাথে কথা-বার্তা বলা তথা মুসলমানদের যে

কোনো কাজই দ্বীনদারী বা পরহেযগারীর মধ্যে শামিল হবে এবং সকল কাজের বিনিময়ে অসীম সওয়াব অর্জন করা যাবে, যদি এ সকল কাজ রাসূল (সাঃ)-এর নিয়ম অনুসারে করা হয়।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ্ 'আল্লাহর রাস্তা' বা 'আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার' ব্যাপারে মারাত্মক ধরণের বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। দাড়িসম্পন্ন, টুপি-পাগড়ী ও লম্বা জুব্বা ব্যবহারকারী কিছু সংখ্যক মুসলিম ভাইগণ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত মানব সমাজের জটিল সমস্যার সমাধানের প্রতি ও মানব জীবনের প্রকৃত চিত্রের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপ না করার ফলে, নবী করীম (সাঃ)-এর বাস্তব জীবন ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি তাঁর সর্বোত্তম শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের প্রতি মনোযোগী না হবার কারণে 'আল্লাহর রাস্তা' ও 'আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার' ব্যাপারে যথাযথ ধারণা অর্জন করতে পারেননি। দুনিয়ার সাথে নবী-রাসূল (আঃ) ও তাঁদের অনুসারীদের সম্পর্ক কেমন ছিলো, মানব সমাজসহ পৃথিবীর সকল কিছুর প্রতি তাঁরা কোন্ ধরণের দায়িত্ব এবং কিভাবে সে দায়িত্ব পালন করেছেন, এ বিষয়টিও তারা বুঝতে ভুল করেছেন বলে মনে হয়। কেননা তাদের কথা শুনলে ও বাস্তব জীবন-যাপন প্রণালী দেখলে এ সত্যই প্রতীয়মান হয়।

আবার আরেক শ্রেণীর মানুষ ইসলামের প্রচার-প্রসার ও জিহাদের জন্যে বের হওয়াকেই শুধুমাত্র 'আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া' বলে মনে করে, এখানেও বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারার কারণেই এ ভুলের শিকার হতে হয়েছে। হযরত কা'ব ইবনে আজরা (রাঃ) বর্ণনা করেন–

قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَجُلٌ فَرَاَى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَلْدِهٖ وَنَشَاطِهٖ فَقَالُوْا يَاۤ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَوْكَانَ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى عَلٰى وَلَدِهٖ صِغَارًا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنْ خَرَجَ يَسْعٰى عَلٰى اَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيْرَيْنِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى عَلٰى نَفْسِهٖ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنْ كَانَ

خَرَجَ يَسْعٰى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِىْ سَبِيلِ الشَّيْطَانِ–

"তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) কতিপয় সাহাবায়ে কেরামের সাথে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় একজন লোক তাঁদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করলো। লোকটির দৈহিক গঠন ও পথ অতিক্রম করার অবস্থা সাহাবায়ে কেরাম খুবই পসন্দ করলেন। তাঁরা মন্তব্য করলেন, আহা! লোকটি যদি আল্লাহ্র রাস্তার একজন হতো! (অর্থাৎ লোকটি যদি তাঁর দেহের এই কর্মক্ষমতা ও আনন্দ উচ্ছাস আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যবহার করতো)

এ সময় নবী করীম (সাঃ) বললেন, এই ব্যক্তি যদি তাঁর নাবালেগ সন্তান-সন্ততির ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ উপার্জনের জন্যে বের হয়ে থাকে, তাহ্লে লোকটি আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়েছে। লোকটি তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতার খেদমত করার উদ্দেশ্যে কিছু উপার্জনের আশায় যদি পথে বের হয়ে থাকে, তাহ্লেও লোকটি আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়েছে। লোকটি যদি অন্যের কাছে হাত বাড়ানোর লজ্জা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে এবং নিজের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্যে উপার্জনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকে, তবুও লোকটি আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়েছে। আর এই লোকটি যদি কারো সাথে প্রতারণা-প্রবঞ্চনা করা, আত্মম্ভরী ও অহঙ্কার প্রদর্শন এবং সম্মান-মর্যাদা ও প্রশংসা-খ্যতি অর্জনের লক্ষ্যে বের হয়ে থাকে, তাহ্লে সে শয়তানের পথে বের হয়েছে।" (মাজমাউ'য যাওয়ায়েদ, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২৫, জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং- ১৪২৮)

সুতরাং একজন মুসলমানকে পৃথিবীর জীবনে যে সকল কাজে জড়িত হতে হয় এবং যে সকল কাজ সে আঞ্জাম দেয়, তা যদি মহান আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে ও নবী করীম (সাঃ)-এর আনুগত্যের ভিত্তিতে করা হয়, তাহ্লে মুসলমানের সকল কাজই আমলে সালেহ্ তথা নেকীর কাজের মধ্যেই গণ্য করে এর বিপুল বিনিময় দান করা হবে।

নারীদের জন্যে মহাসুসংবাদ

মানুষের জন্যে নেকীর কত যে বিরাট প্রয়োজন, তা এই পৃথিবীতে অনুভব করা না গেলেও কিয়ামতের ময়দানে বাস্তবে দৃষ্টির সম্মুখে নেকীর গুরত্বের বিষয়টি দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মাত্র একটি নেকীই মানুষকে সফলতার উচ্চ পর্যায়ে পৌছে দিতে পারে এবং একটি মাত্র নেকীর অভাবেই মানুষ ব্যর্থতার শেষ স্তরে গিয়ে পৌছে যেতে পারে। কিয়ামতের ময়দানে একটি মাত্র নেকীর কারণে মানুষ মহান আল্লাহ্র একান্ত অনুগ্রহে জান্নাতের অধিবাসী হতে পারে, আবার একটি

মাত্র নেকীর অভাবে মানুষ জাহান্নামের অধিবাসী হতে পারে। (মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের সকলকে এই অবস্থা থেকে হেফাজত করুন)

একটি মাত্র নেকীর জন্যে মানুষ কিয়ামতের ময়দানে অসংখ্য মানুষের সম্মুখে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দিবে, কিন্তু কেউ-ই কণামাত্র নেকী দিয়ে কাউকে সাহায্য করবে না। আদরের সন্তান, প্রিয়তমা স্ত্রী, জন্মদাতা পিতা, গর্ভধারিণী মাতা, ঘনিষ্ঠ বন্ধু সকলেই সেদিন দূরে সরে যাবে। মহাবিপদের ঘনঘটা দেখে কেউ কাউকে পরিচয় পর্যন্ত দিবে না। সেদিন অনুভব করা যাবে, মাত্র একটি বার 'সুবহানাল্লাহ্' শুধুমাত্র একটি বার 'আল হামদু লিল্লাহ' উচ্চারণের মূল্য সমগ্র পৃথিবীর সকল কিছুর তুলনায় কত বেশী।

নেকী অর্জন করা কত সহজ কাজ এবং কত সহজে অসংখ্য অগণিত নেকী অর্জন করা যায়, তা কোরআন-হাদীসের প্রত্যেক নির্দেশ ও উপদেশের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে স্পষ্ট অনুভব করা যায়। শুধু নেকীর কাজ করেই আত্মতৃপ্তিতে বিভোর হয়ে থাকা যাবে না, নেকীর কাজটি হতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং সে নেকীর কাজটি কবুল করার জন্যে মহান আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন জানাতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা দয়া করে নেকীর কাজগুলো কবুল করলে সে মানুষের ভাগ্য খুলে যাবে। মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহ্ বান্দার চোখের পানি সবথেকে বেশী পসন্দ করেন। নেকীর কাজ করে মহান মালিকের কাছে চোখের পানি ফেলে কবুলের আবেদন জানালে আশা করা যায়, সে কাজ আল্লাহ্ কবুল করবেন।

মুসলিম নারীগণ নিজের পরিমন্ডলে সংসারের গন্ডীতে যে সকল কাজ করে থাকেন, সেসব কাজের মাধ্যমে তারা প্রত্যেক দিন অসংখ্য ও অগণিত নেক আমল করে নিজের আমলনামা পরিপূর্ণ করতে পারেন। প্রয়োজন শুধু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করা। সংসারের প্রত্যেকটি কাজের শুরুতে যদি তারা 'বিস্‌মিল্লাহ্' উচ্চারণ করেন, তাহলে এর মাধ্যমে অগণিত নেকী আমলনামায় জমা হবে। যেমন ঘর পরিষ্কার করা, থালা-বাসন ধোয়া, কাপড় ধোয়া, সব্জী, মাছ, গোস্ত কাটা, রান্না করা, সন্তানদের শিক্ষা দেয়া, শিশু সন্তানদের পড়ার বই সাজিয়ে রাখা, তাদেরকে স্কুলে আনা-নেয়া, সন্তানদের পরিচর্যা করা, তাদেরকে খেতে দেয়া, তাদের সাথে খেলা, বিছানা ঝেড়ে ঠিক করা ইত্যাদি কাজের শুরুতে যদি 'বিস্‌মিল্লাহ্' উচ্চারণ করা হয়, তাহলে এ সকল কাজের বিনিময়ে আমলনামা সওয়াবে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

আরবী অক্ষরে 'বিস্‌মিল্লাহ্' লিখতে সাতটি অক্ষরের প্রয়োজন হয় এবং এ বাক্যটি পবিত্র কোরআনের আয়াত। হাদীসে বলা হয়েছে, পবিত্র কোরআনের একটি অক্ষর উচ্চারণ করলে একটির বিনিময়ে দশটি নেকী দেয়া হবে। সুতরাং আল্লাহ

তায়া'লাকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে দৃঢ় বিশ্বাসে সাতটি অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত 'বিস্‌মিল্লাহ্' উচ্চারণ করলে ৭০টি নেকী আমলনামায় লেখা হবে। এভাবে প্রত্যেকটি কাজের বিনিময়ে নারী-পুরুষ সকলেই যদি 'বিস্‌মিল্লাহ্' উচ্চারণ করে, তাহলে অনুমান করা যেতে পারে প্রত্যেক দিন তার আমলনামায় কি পরিমাণ নেকী জমা হবে।

শুধু তাই নয়, সাংসারিক কাজের মগ্ন থাকার সময় নীরব না থেকে মনে মনে বা নীরবে 'সুবহানাল্লাহ্, আল হামদু লিল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, লা হাওলা ওয়ালা কুউ-ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্, আসতাগফিরুল্লাহ, মহান আল্লাহর উত্তম নামসমূহের যিক্‌র করা যেতে পারে। তাহলে প্রতি দিন কয়েক কোটি নেকী উপার্জন করে আমলনামা পূর্ণ করা যায়।

সাংসারিক জীবনে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, সন্তানের প্রতি পিতামাতার এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের বিরাট অবদান রয়েছে। সেই সাথে পরিবারের অন্যান্য সকলেরই কিছু না কিছু অবদান থাকে। সকলের অবদানের বিনিময় দেয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু বিনিময় তো অবশ্যই দিতে হবে। সে বিনিময়ের ধরণ হলো, সাংসারিক কাজকর্মে মহান আল্লাহকে স্মরণ করলে পরিবারের সদস্যদের অবদানের শোকর আদায় করা হয়। কারো অবদানের শোকর আদায় বা তার বিনিময় দেয়ার ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ صَنَعَ اِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَاِنْ لَمْ يَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْنَهُ فَادْعُوْا لَهُ حَتّٰى تَرَوْا اَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ–

"যে কেউ তোমার সাথে নেকীর কাজ করলে (উপকার করলে) এর বিনিময় দাও, যদি বিনিময় দিতে না পারো তার জন্যে দোয়া করো। আর এত বেশী দোয়া করো যে, এর মাধ্যমে তুমি মনে করতে পারো তার বিনিময় দিয়ে দিয়েছো।" (আবু দাউদ, হাদীস নং-১৬৭২)

পুরুষের তুলনায় নারীর সওয়াব অর্জনের পথ অনেক বেশী। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, মহিলার যখন গর্ভাবস্থায় থাকে তখন গর্ভ ধারণের সম্পূর্ণ সময়ই সে প্রতিদান ও সওয়াব পায় যেমন সওয়াব এবং প্রতিদান একজন রোজাদার, রাত জেগে ইবাদাতাকারী, আল্লাহ-রাসূলের আনুগত্যকারী এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারী বান্দা পেয়ে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সময়ে মা যে কষ্ট ভোগ করে, এর বিনিময়ে যে প্রতিদান ও সওয়াব সে পেয়ে থাকে, তা কোনো সৃষ্টিই কল্পনা করতে পারেনা এবং সে সওয়াব যে কি এবং এর পরিমাণ কত, তা কেউ-ই অনুমান করতে পারে না।

অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগের পর মা সন্তান প্রসব করে, মা সন্তানকে দুধ পান করায়, প্রত্যেক ঢোক দুধের বিনিময়ে মা এমন সওয়াব পায়, যে সওয়াব পাওয়া যায় একজনকে জীবন দান করলে। (কানযুল উম্মাল)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে নারী নিজের সন্তানের পরিচর্যা, লালন-পালন ও স্বামীর সাংসারিক কাজের আঞ্জাম দেয়, সে নারী জান্নাতে অবস্থান করবে। (কানজুল উম্মাল)

একজন নারীর জন্যে এর থেকে বড় সুসংবাদ আর কি হতে পারে যে, সে জান্নাতে আল্লাহর হাবীব (সাঃ)-এর সাথে অবস্থান করবে! শুধু তাই নয়, সাংসারিক কাজকর্মের আঞ্জাম দেয়া নারীর জন্যে জিহাদের সমপরিমাণ সওয়াবের কাজ। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সংসারের দায়িত্ব পালন করা তোমাদের দায়িত্ব এবং এটাই তোমাদের জিহাদের কাজ।'

সন্তানের জন্য কষ্ট স্বীকার করা, তাদের প্রয়োজন পূরণ করা, তাদের পরিযর্চা করা, তাদের জন্যে অর্থ ব্যয় করা, তাদেরকে সময় দেয়া, শিক্ষা দেয়া, উত্তম আচরণ ও আদব শিক্ষা দেয়া, পোশাক পরিধান থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি কাজ শিখানো, সকল কিছুর বিনিময়ে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা আমলনামায় সওয়াব পরিপূর্ণ করে দিবেন। সুতরাং মহিলারা ঘরে বসেই সহজে জান্নাতে প্রবেশের যাবতীয় ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করতে পারেন।

গণশিক্ষা কার্যক্রম সাদকায়ে জারিয়াহ্

জ্ঞান অর্জন করা, জ্ঞান শিক্ষা দেয়া এবং জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটানো প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তির দায়িত্ব-কর্তব্য। ইসলাম এ ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বলেছে, জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে বা জ্ঞান বিস্তার করার জন্যে যারা বাড়ি থেকে বের হয়, তাদের চলার পথে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরিশ্তাগণ পাখা বিছিয়ে দেন এবং দোয়া করতে থাকেন। নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি হেরা পবর্তের গুহায় যে অহী অবতীর্ণ হয়েছিলো, তার সর্বপ্রথম শব্দই ছিলো 'পড়ো'। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করো, জ্ঞান অর্জন তাঁর সম্পর্কে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে প্রতিপালন করছেন এবং তোমার যাবতীয় প্রয়োজন যিনি পূরণ করছেন, সর্বপ্রথমে তাঁকে জানো। ঠিক এ কারণেই ইসলাম তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ভিত্তিতে পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার জন্যে যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন, ঐটুকু জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্যে ফরজ করে দিয়েছে।

বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি মহান আল্লাহ তা'য়ালা দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, পৃথিবীর অন্যান্য সকল মানুষকে সঠিক জ্ঞান শিক্ষা দেয়া। জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে ও

জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটিয়ে সকল মানুষের কল্যাণ সাধন করাই মুসলমানের সর্বপ্রধান দায়িত্ব। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ–

"তোমরাই হচ্ছো দুনিয়ার সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উত্থান, তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।" (সূরা আলে ইমরান-১১০)

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভালো-মন্দ উভয় গুণই রয়েছে, উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষার কারণে এসব ভালো গুণ বিকশিত হয়। মানুষের অভ্যন্তরীণ উত্তম গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে তাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করা মুসলমানদের সর্বপ্রধান দায়িত্ব এবং এটা অনেক বড় নেকীর কাজ। এই নেকীর কাজটি আঞ্জাম দেয়া এককভাবে কোনো মুসলিমেরই নয়, বরং এটা সামাজিক দায়িত্ব। যিনি যেখানে যে অবস্থায় রয়েছেন, সেখান থেকেই প্রত্যেককে এই মহান কাজটি আঞ্জাম দিতে হবে। নবী করীম (সাঃ) মুসলমানদেরকে চারটি স্তরে অবস্থান করতে বলেছেন এবং পঞ্চম স্তরে অবস্থানকারী সম্পর্কে বলেছেন, সে ব্যক্তি নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রথম স্তর হলো, আলেম হতে হবে। দ্বিতীয় স্তর হলো, ইলম্ অন্বেষণকারী অর্থাৎ ছাত্র হতে হবে। তৃতীয় স্তর হলো, দ্বীনি ইলমে সমৃদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা শুনতে হবে। চতুর্থ স্তর হলো, বিজ্ঞ আলেমদের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। উক্ত চারটি স্তরের বাইরে হলো পঞ্চম স্তর যা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করে।

এ পঞ্চম স্তরে যারা অবস্থান করবে অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে জ্ঞানীও হলো না, জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টাও করলো না, জ্ঞানী ব্যক্তিদের পরামর্শ ও উপদেশও শুনলো না এবং জ্ঞানী লোকদের সাথে সুসম্পর্কও রাখলো না, তাহলে সে ব্যক্তি তো জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে এবং জাহিলদের মাধ্যমে মানব সমাজের অকল্যাণ ব্যতীত কল্যাণ হতে পারেনা। আর এমন ব্যক্তির পক্ষে মানব সমাজ উপযোগী স্থান নয়, তার জন্যে অরণ্যে বসবাসকারী জন্তুরা-ই উপযোগী।

একজন মুসলিমের পক্ষে কল্যাণের সন্ধান ও উত্তম কৌশল লাভ করা মহান আল্লাহর রহমত বিশেষ। এ জন্যে আল্লাহর শোকর আদায় করার মাধ্যম হলো, কল্যাণের সেই বিষয়টি সে আরেক মুসলমানকে শিক্ষা দিবে, যেনো সে ব্যক্তিও এর মাধ্যমে কল্যাণ পেতে পারে। যে কৌশল অবলম্বন করে একজন মুসলিম উপকৃত হয়, সেই

একই কৌশল অন্য মুসলিম ভাইকে শিক্ষা দেয়া তার ঈমানী দায়িত্ব। অন্য মুসলিম ভাইকে শিক্ষা দেয়া, সুপরামর্শ দেয়া এবং উত্তম কৌশল শিক্ষা দেয়া অপরিসীম সওয়াবের কাজ।

নিজ পরিবারে বা এলাকায় যে ব্যক্তি নিরক্ষর রয়েছে, তাকে অক্ষর জ্ঞান দান করতে হবে। শিক্ষার কোনো বয়স নেই, তবে নিরক্ষর লোকদেরকে বয়স অনুপাতে পৃথক করে এলাকার মসজিদ, মাদ্রাসা বা স্কুলে অথবা অন্য কোনো স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত করে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হবে। নবী করীম (সাঃ) এই গণশিক্ষা কার্যক্রমের সূচনাকারী। যে কাজ স্বয়ং আল্লাহর নবী (সাঃ) করেছেন, সেই কাজ মহান আল্লাহর কাছে কত প্রিয় তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

নিজের মিল-কলকারখানায়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বা অধীনে যেসব নিরক্ষর লোক রয়েছে, এমনকি বাড়ির কাজের লোকটি পর্যন্ত, সকলকেই অক্ষর জ্ঞান দান করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত করে মুসলিম হিসেবে যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন, ততটুকু জ্ঞান দান করা, নামাজ-রোজা, অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হবার পদ্ধতি অর্থাৎ প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন মাসআলা মাসায়েল শিক্ষা দেয়া অবশ্যই কর্তব্য। আর একাজের বিনিময়ে আমলনামা সওয়াবে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

নবী করীম (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আপনি কেনো প্রেরিত হয়েছেন? জবাবে তিনি বলেছেন, আমাকে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। (ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং-২২৯)

জ্ঞান অর্জন করা, জ্ঞান বিতরণ করা, জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ঘটানো ও জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্যে যারা প্রচেষ্টা চালাবে, তাদেরকে মহাসুসংবাদ দিয়ে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ–

"যে ব্যক্তি জ্ঞান (অর্জন ও বিতরণ) করার পন্থা অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্ তা'য়ালা এ কারণে তার জন্যে জান্নাতের পথ সহজ ও প্রশস্ত করে দিবেন।" (তিরমিযী, হাদীস নং-২৬৪৬)

অন্য আরেকটি হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ–

"তোমাদের মধ্যে যারা অন্য মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণ করতে সক্ষম, তাদেরকে অবশ্যই সে কল্যাণকর কাজ করে দিতে হবে।" (মুসলিম, হাদীস নং-২১৯৯)

মুসলিম নারীদের মধ্যে সবথেকে বড় শিক্ষক ছিলেন হযরত আয়িশা (রাঃ)। কোরআন-হাদীসের যে জ্ঞান তিনি বিতরণ করে গিয়েছেন কিয়ামত পর্যন্ত অন্য কোনো নারী-পুরুষের পক্ষে কোনোক্রমেই তা সম্ভব নয়। অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন ও সুশিক্ষিতা মুসলিম নারীদেরকে হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে নিরক্ষর ও অজ্ঞ মুসলিম বোনদেরকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে হবে। কোনো মুসলমানের কাছ থেকে অন্য মুসলমান কল্যাণকর একটি শিক্ষা গ্রহণ করে বা কিছু শিখে তা যতক্ষণ আমল করতে থাকবে, ততক্ষণ শিক্ষা দানকারী সেই মুসলমানও সওয়াবের বিরাট অংশ লাভ করবে। এমনকি তার ইন্তেকালের পরেও সেই সওয়াবের ধারাবাহিকতা জারী থাকবে।

জ্ঞান শিক্ষা দেয়া, জ্ঞানের কথা আলোচনা করা, জ্ঞান বিতরণ করা, জ্ঞানের প্রচার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে বই-পুস্তক রচনা করা এবং বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ সিডি, ভিসিডি, অডিও-ভিডিও ক্যাসেট, ইন্টারনেট, পত্র পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হবে। বর্তমানে মোবাইল ফোনের যুগে পরিচিতজনদের কাছে সামান্য কিছু পয়সা খরচ করে সপ্তাহে একদিন হলেও কোরআন-হাদীসের একটি নির্দেশ অন্য মুসলিম ভাই বোনদের কাছে পৌঁছানো যেতে পারে।

পৃথিবীতে যারা জ্ঞান শিক্ষা ও প্রচার-প্রসারের কাজ করবে, ইন্তেকালের পরও তারা অনন্তকাল ধরে সওয়াব পেতে থাকবে। ইন্তেকালের পরে এসব লোকজনের সম্মান মর্যাদা যখন বৃদ্ধি পাবে, তখন তারা অবাক বিস্ময়ে ফিরিশ্তাদের কাছে জানতে চাইবে, 'আমরা এমন সম্মান-মর্যাদা লাভের কোনো কাজ করিনি, তাহলে আমরা এখন উচ্চ মর্যাদা লাভ করলাম কিভাবে?' জবাবে ফিরিশ্তাগণ জানাবেন, তোমরা যে জ্ঞান বিতরণ করে এসেছো, তুমি তোমার অমুক ভাই-বোনকে যে শিক্ষা দিয়ে এসেছো, তুমি জ্ঞানের যে প্রদীপ পৃথিবীতে জ্বালিয়ে এসেছো, সে কারণেই তোমার আমলনামায় নেকী জমা হচ্ছে এবং তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫টি জিনিসের তুলনায় অন্য ৫টি জিনিসের সীমাহীন গুরুত্ব

জীবন মৃত্যুর বাগডোর একমাত্র মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিয়ন্ত্রণে। তিনিই জীবিত রাখেন যতক্ষণ তিনি চান, তিনিই মৃত্যু দেন যখন তিনি চান। তিনি কতক্ষণ তাঁর কোন্ বান্দাকে পৃথিবীতে জীবিত রাখবেন, কখন কোন্ বান্দাকে মৃত্যু দিবেন এবং কোথায় মৃত্যু দিবেন, তা একমাত্র তিনিই জানেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ نِ- اَ لَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً - وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ-

"কতো মহান সেই পূণ্যময় সত্তা, যাঁর হাতে রয়েছে আকাশ-যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব, এ সৃষ্টি জগতের সব কিছুর ওপর তিনি একক ক্ষমতাবান। যিনি জন্ম-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে এর দ্বারা তিনি তোমাদের যাচাই করে নিতে পারেন, কর্মক্ষেত্রে কে এখানে তোমাদের মধ্যে বেশী ভালো, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি অসীম ক্ষমাশীল।" (সূরা মুল্ক-১-২)

জীবন-মৃত্যু আল্লাহ্ তা'য়ালা সৃষ্টিই করেছেন তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে। পৃথিবীতে এই স্বল্প সময়ের জীবনকালে তাঁর কোন্ বান্দা তাঁরই বিধানের অধীনে জীবন পরিচালনা করে নিজেকে মহান মালিকের দাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং কোন্ বান্দা তাঁর বিধান অমান্য করে বিদ্রোহী বান্দা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, এই পরীক্ষাই তিনি বান্দাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন।

মানুষের জীবনকাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, এই জীবনের প্রতি নির্ভর করা নিতান্তই বোকামী। যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর হিম শীতল থাবা এগিয়ে এসে সকল কিছুকে ম্লান করে দিয়ে দেহটিকে স্পন্দনহীন স্থবির লাশে পরিণত করে দিতে পারে। সকালে গর্ভধারিণী মাতা নিজ হাতে সুস্বাদু খাবার যুবক সন্তানের মুখে উঠিয়ে খাওয়ায়ে কলেজ-ভার্সিটিতে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে পাঠালেন, দুপুরে টেবিলে খাবার সাজিয়ে সন্তানের জন্যে মমতাময়ী মা অপেক্ষা করছেন, সন্তান এলে তার সাথে তিনিও খাবেন। কিন্তু সন্তান আর জীবিত ফিরে এলো না, এলো কফিনে আবৃত সন্তানের স্পন্দনহীন লাশ। এই তো জীবন, যার প্রতি একটি মুহূর্তও নির্ভর করা যায় না।

আমার দেশের বিখ্যাত কণ্ঠ শিল্পী ফিরোজ শাঁই মঞ্চে উঠে অগণিত দর্শকের সম্মুখে 'এক মিনিটের নেই ভরসা' গানটি গেয়ে শোনাচ্ছিলেন। গানটি তিনি শেষ করতে পারেননি, মঞ্চেই ঢলে পড়ে গেলেন। যে গানটি তিনি গেয়ে শোনাচ্ছিলেন, সেই গানটি যে তাঁরই জীবনে কঠিন বাস্তব হয়ে গান পরিবেশনের মঞ্চেই দেখা দিবে, তা কি তিনি কখনো কল্পনা করেছিলেন?

জীবনের সময়কাল খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ, যে সময়টুকু জীবনে পাওয়া যায় তা একান্তই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর নিয়ামত। এই নিয়ামতকে যথাযথ পন্থায় ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সঙ্কীর্ণ জীবনের এই ক্ষুদ্র পরিসরে জীবনকে মহান

আল্লাহর অনুগ্রহের অধীন করে দেয়াই সবথেকে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীর পরিচয়। যার হৃদয়-মনে মহান আল্লাহর সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা ও বিশ্বাস রয়েছে, সেই সাথে রয়েছে মহান মালিক রাব্বুল আলামীনের প্রতি ভীতি, সেই ব্যক্তি ক্ষুদ্র জীবনের স্বল্প সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্ত নেকী উপার্জনের কাজে ব্যয় করে থাকে।

আর যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে অফুরন্ত বলে মনে করে বা মৃত্যুকে ভুলে থাকে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে চেতনাহীন, আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস নেই, ভোগ-বিলাস আর চিত্তবিনোদনের প্রবল স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে, সেই সকল ব্যক্তিদের জন্যে আফসোস, মৃত্যুর পরে তাদের জন্যে অনুতাপের পথ ব্যতীত আর কোনো পথই খোলা নেই।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন শুধুমাত্র তাঁরই দাসত্ব করার উদ্দেশ্যে। মানুষ তাঁর দাসত্ব করবে, অন্য মানুষকে তাঁর বিধানের দিকে আহ্বান জানাবে, তিনি যে আদর্শ অবতীর্ণ করেছেন, সেই ইসলামকে অন্য মানুষের কাছে তুলে ধরবে, ইসলামের আলোয় নিজে আলোকিত হবে এবং অন্যকেও সেই আলোয় আলোকিত করবে, অর্থাৎ প্রত্যেক পদক্ষেপে সে নিজেকে ইসলামের শিক্ষক হিসেবে নিজেকে পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের সম্মুখে পেশ করবে, এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করে জীবনকাল দান করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ج رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ط اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّايَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ ط فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ–

"আযাবের অসহনীয় কষ্টে তারা সেখানে আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের মালিক, তুমি আজ আমাদের এ আযাব থেকে বের করে দাও, আমরা ভালো কাজ করবো, আগে যা কিছু করতাম তা আর করবো না। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদের দুনিয়ায় এক দীর্ঘ সময় জীবন দান করিনি? সতর্ক হতে চাইলে কেউ কি সতর্ক হতে পারতো না? তাছাড়া তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী নবী-রাসূলও এসেছিলো, সুতরাং এখন তোমারা আযাবের স্বাদ উপভোগ করো, মূলত যালিমদের সেখানে কোনোই সাহায্যকারী নেই।" (সূরা ফাতিরঃ ৩৭)

আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান এবং এসব মূল্যবান মুহূর্তগুলো আমাদের কাছে প্রত্যহ করুণ কণ্ঠে আবেদন করে, 'আমাকে বৃথা নষ্ট করো না,

আমাকে সদ্ব্যবহার করো'। জীবনের এই স্বল্প সময়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমাদেরকে সকল গোনাহ্ পরিত্যাগ করতে হবে। জীবনকালের মূল্য তথা সময়ের মূল্য দিয়ে প্রকৃত তাওবা করে নিজেকে সংশোধন করতে হবে। সময় ফুরিয়ে গেলে এ সময় আর ফিরে পাওয়া যাবে না। জীবন মাত্র একটি, দুটো নয়। একটি ফুরিয়ে গেলে আরেকটি কাজে লাগানোর কোনোই সুযোগ নেই।

মানব জীবনের উদাহরণ উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রখর রোদে রাখা বরফ খন্ডের মতো, যা অতিদ্রুত গলে নিঃশেষ হয়ে যায়। মানুষের জীবনকালও বরফের মতো অতিদ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। জীবনকাল নিঃশেষ হবার পূর্বেই সেই অনন্তকালের জীবনের পুজি সংগ্রহে নিজেকে ব্যস্ত রাখাই সর্বোত্তম কাজ। নবী করীম (সাঃ) পাঁচটি জিনিসকে গণীমাতের সম্পদের মতো মূল্যবান হিসেবে গণ্য করেছেন। গণীমাত বলা হয় যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে। একজন মানুষ যখন যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়, তখন সে মানুষটি জীবিত ফিরে আসবে এমন আশা করা যায় না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, অস্ত্রের আঘাত সহ্য করে, নিজ দেহের রক্ত ঝরিয়ে যুদ্ধে বিজয়ী হলে প্রতিপক্ষের ফেলে যাওয়া সম্পদ হস্তগত হতে পারে।

অর্থাৎ গণিমতের সম্পদ লাভ করতে হলে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয় বিধায় এই সম্পদের মূল্য তুলনাহীন। মানুষের জীবনের পাঁচটি অবস্থাকেও এ জন্যই নবী করীম (সাঃ) গণীমাতের সম্পদের সাথে তুলনা করে বলেছেন–

اِغْتَنِمُوْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ
سُقْمِكَ وَفَرَاغَكَ شُغْلِكَ وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ–

"পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের তুলনায় গণীমাত হিসেবে গণ্য করো। নিজের জীবনকালকে মৃত্যু আসার পূর্বে, নিজের সুস্থতাকে রোগগ্রস্থ হবার পূর্বে, নিজের অবসর সময়কে ব্যস্ততায় মগ্ন হবার পূর্বে, নিজের যৌবনকালকে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হবার পূর্বে এবং নিজের স্বচ্ছলতাকে দারিদ্রতা আসার পূর্বে গণিমাত হিসেবে গণ্য করো।" (সহীহ্ আল জামেউ'স সাগীর, হাদীস নং-১০৭৭)

বর্তমানে আমরা যারা জীবিত রয়েছি, তারা একটু সতর্ক হয়ে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদীহীর অনুভূতি জাগ্রত করে যদি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাওবা করি তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে আমাদের জীবনের গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দিবেন। নতুবা মৃত্যু এসে গ্রেফতার করার সাথে সাথে নেক কাজ করার সকল সুযোগ মুহূর্তেই হারিয়ে যাবে। সুযোগ যতক্ষণ রয়েছে, ততক্ষণ নেকী অর্জন করতে থাকি। ফজরের ফরজ নামাজের পূর্বে দুই রাকাআত সুন্নাত নামাজ আদায় করলে যে নেকী

রয়েছে, তা যথাযথভাবে আদায় করতে পারলেও আমলনামা নেকীতে পূর্ণ হয়ে যায়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ফজর নামাজের ফরজের পূর্বে দুই রাকাআত সুন্নাত দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তার তুলনায় অনেক বেশী উত্তম। (মুসলিম, হাদীস নং-৭২৫)

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, সুবহানাল্লাহ্, আল হামদু লিল্লাহ পড়লে নেকীর পাল্লাই শুধু ভারী হয় না, বরং এই নেকী পাল্লা পরিপূর্ণ করে দেয়। সুতরাং নিজের জীবনকালকে মৃত্যু আসার পূর্বে গণিমাত হিসেবে গণ্য করো। (মুসলিম, হাদীস নং-২২৩)

ঈমানের পরেই একজন মানুষের সবথেকে বড় সম্পদ হলো তার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে সকল ইবাদাত সুস্থ মনে সহজে আদায় করা যায়। কিন্তু রোগ হলে বিছানায় বা হাসপাতালের শয্যায় শায়িত থেকে আপসোস করা ব্যতীত আর কোনো উপায় থাকে না। এ জন্যে রোগগ্রস্থ হবার পূর্বেই সুস্থতাকে গণিমাত হিসেবে গণ্য করে মহান আল্লাহর বেশী বেশী ইবাদাত করতে হবে।

বর্তমানে অধিকাংশ লোকজন খেলাধুলা করে, খেলা দেখে, ক্লাবে আড্ডা দিয়ে, চিত্তবিনোদনের নামে পার্কে গিয়ে, টিভির অর্থহীন অনুষ্ঠান দেখে, ডিভিডি, ভিসিডির মাধ্যমে নোংরা সিনেমা দেখে, চরিত্র বিধ্বংসী উপন্যাস পড়ে অর্থাৎ নানা পন্থায় মূল্যবান সময় নষ্ট করে থাকে। অথচ আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমে এই সময়কে ব্যবহার করে অগণিত কল্যাণ লাভ করা যায়। জীবনে এমন সময় আসতে পারে, যখন নানা কাজে নিজেকে এতই ব্যস্ত হতে হবে যে, ইচ্ছে থাকার পরও ধৈর্য্যের সাথে প্রশান্তির নামাজ আদায় করা সম্ভব না-ও হতে পারে। সুতরাং এখনই অবসর সময়কে গণিমাত হিসেবে গণ্য করে এর যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।

মানুষের যৌবনকালই হলো জীবনের সবথেকে মূল্যবান ও স্বর্ণালী সময়। যৌবনকাল মহান আল্লাহর অনেক বড় নিয়ামত। এ সময় মানুষের দেহ থাকে বলিষ্ঠ, সুঠাম, কান্তিময় এবং দেহে বিরাজ করে উদ্যম ও শক্তি। যে কোনো গুরুপাক খাদ্য খেয়েও হজম করতে কোনো সমস্যা হয়না। মনে থাকে উৎসাহ, উদ্দীপনা, সঙ্কল্পে থাকে দৃঢ়তা, ইচ্ছা বাস্তবায়নে কঠিন শ্রম দিতেও ক্লান্তি আসে না। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে মানুষ হয়ে যায় দুর্বল, শক্তিহীন, লঘুপাক খাদ্য খেয়েও হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইচ্ছে থাকলেও তা বাস্তবায়ন করার মতো দৈহিক শক্তি ও মনোবল থাকে না। এ সময় যথারীতি নামাজ-রোজা আদায়েও দৈহিক অবস্থা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ জন্যেই নবী করীম (সাঃ) বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হবার পূর্বে যৌবনকালকে গণিমাত হিসেবে গণ্য করার তাগিদ দিয়েছেন। যৌবনের অফুরন্ত শক্তি সামর্থকে মহান আল্লাহর ইবাদাতে ব্যয় করার জন্যে বারবার উৎসাহিত করেছেন।

উল্লেখিত হাদীসে পাঁচ নম্বরে যে কথা বলা হয়েছে তাহলো, অস্বচ্ছলতা আসার পূর্বে স্বচ্ছলতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ধন-সম্পদ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাঁরই নির্দেশিত পথে ব্যয় করা। ধন-সম্পদ কখনো স্থায়ী হয় না। আজ যিনি ধনী কালই তিনি ভিখারী। আবার আজ যিনি ভিখারী কাল তিনি ধনী। এ দৃষ্টান্ত মানুষ অহরহ দেখে আসছে। ধন-সম্পদ যে কোনো মুহূর্তে মানুষের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। আগুনে পুড়ে, পানিতে ডুবে, ভূমিধ্বসে বা অন্য যে কোনো কারণে বিশাল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী মুহূর্তেই পথের ভিখারীতে পরিণত হয়।

এ জন্যে স্বচ্ছলতা বজায় থাকা অবস্থায় দান-সাদকা করে নিজের আমলনামা সওয়াবে পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করতে হবে। স্বচ্ছল অবস্থায় এক শ্রেণীর লোকজন একের পর এক নিত্য-নতুন বাড়ি আর গাড়ি করতেই থাকে। হজ্জ আদায়ের কথা স্মরণেই আসে না। স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বিপুল অর্থ ব্যয়ে ফূর্তি করতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যায়।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পবিত্র ভূমি মক্কায় গিয়ে একটি বার হজ্জ বা উমরাহ্ আদায় করে না। বাড়ির কাছে বা এলাকার মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা, রাস্তাপথ, স্কুল-কলেজের জরাজীর্ণ অবস্থা, অথবা প্রতিবেশী এবং নিকট আত্মীয়দের দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোটে না, সেদিকে তাদের দৃষ্টি নেই। এসব লোকদের জীবনে এমন সময় আসতে পারে, যখন দান-সাদকা করতে মন চাইবে কিন্তু সামর্থ থাকবে না। এ জন্যেই হাদীসে বলা হয়েছে, দারিদ্রতা আসার পূর্বেই স্বচ্ছলতাকে গণিমাত হিসেবে গণ্য করো।

স্ত্রী-সন্তান-সন্তুতি নেকী উপার্জনের মাধ্যম

নামাজ-রোজা আদায় করা, যাকাত দেয়া, হজ্জ আদায় করা, কোরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ্-তাহ্লীল তথা বাহ্যিক কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠান পালন করার নামই ঈমান নয়, বরং বাহ্যিক ইবাদাতের সাথে মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণ-বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য সৃষ্টি করার নামই ঈমান। ঈমান যখন মানুষের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ, কথাবার্তা, লেনদেন, কাজকর্ম তথা সকল কিছুকেই ঈমান প্রভাবিত করে। ঈমানের দাবী অনুসারে মানুষের জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। ঈমান মানুষকে দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ও বিনয়ী করে এবং নম্রতা ও বিনয়ই হলো ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ। বিনয়ের বিপরীত হলো অহঙ্কার আর অহঙ্কার হলো শয়তানের লক্ষণ।

নিজ পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল মানুষের সাথেই ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী আচরণ করা ঈমানের দাবী। প্রাণীসমূহের প্রতিও মমতা প্রদর্শন করাও

ঈমানের অন্যতম দাবী। নম্রতা, ভদ্রতা, বিনয়ী আচরণ ও উত্তম কথাবার্তা নেকীর পাল্লাকে ভারী করে। এ সকল গুণ থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত, সেই ব্যক্তির সাথে অন্যান্য লোকজন চলাফেরা করতে যেমন ভয় পায়, তেমনি এসব গুণের অভাবে মানুষ জাহান্নামের পথে অগ্রসর হয়। নবী করীম (সাঃ) নিজের সম্পর্কে বলেছেন–

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ–

"আমি তোমাদের সকলের মধ্যে উত্তম, আমি আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে উত্তম আচরণ করি। পক্ষান্তরে তোমাদের মধ্যে ঐ মুসলমানই সর্বোত্তম, যে নিজের পরিবারের সদস্যদের সাথে উত্তম আচরণ করে।" (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৮৯৫, ইবনে হাব্বান, হাদীস নং-৪১৬৫)

নবী করীম (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক মুসলমানকেই নিজ পরিবারের সদস্যদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীর সাথে সবথেকে সুন্দর আচরণ করতে হবে। পুরুষ মানুষ সাধারণত নানা ধরণের ঝামেলায় নিপতিত হয়। এসব কারণে ক্ষেত্র বিশেষে অনেক পুরুষ মানুষ মেজাযের ভারসাম্য রাখতে না পেরে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর তুচ্ছ কথার কারণে ক্রোধান্বিত হয়ে অশোভন আচরণ করে থাকে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও গোনাহের কাজ। বাইরের ঝামেলা বাইরে রেখে বাড়িতে প্রবেশ করে নিজ বাড়িতে শান্তির নীড় হিসেবে গড়তে হবে এর মধ্যে অসংখ্য-অগণিত সওয়াব রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَاءِهِمْ–

"ঐ ঈমানদারের ঈমানই হলো পরিপূর্ণ ঈমান যে স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে উত্তম। এবং তোমাদের মধ্যে সবথেকে উত্তম হলো সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে থাকে।" (তিরমিযী, ১১৬২, ইবনে হাব্বান, হাদীস নং-৪১৬৪)

আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, ঈমানের পরিপূর্ণতা সেই ব্যক্তি অর্জন করেছে, যে ব্যক্তি নিজ পরিবারের সদস্যদের সাথে অত্যন্ত কোমল আচরণ করে এবং মমতার সম্পর্ক রাখে। (তিরমিযী, হাদীস নং-২৬১২)

মনে রাখতে হবে, স্ত্রী সংসারের দাসী নয়। সংসারের কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়াই বিয়ের উদ্দেশ্য নয়। একজন নারী যখন নিজের অভিভাবকের সংসার ছেড়ে আরেকটি সংসারে প্রবেশ করে, তখন সেই সংসারটিই তার নিজের সংসারে

পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবেই সেই সংসারের অনেক দায়িত্বও তার ওপর অর্পিত হয় এবং সে দায়িত্ব তাকে অবশ্যই পালন করতে হবে। কিন্তু অনে পুরুষ রয়েছে, তারা বন্ধুদের কাছে বলে, 'এখন তো বিয়ে করার ইচ্ছাই ছিলো না, মা একা সংসারের কাজ করতে পারে না এ জন্যেই বিয়ে করা'। এ ণর কথা বলা অপরাধ এবং নারীর সম্মান-মর্যাদার বিপরীত কথা। পিতামাত দমত করতে পুত্রবধু বাধ্য নয়, তাদের খেদমত সন্তানকেই করতে হবে।

সমর্থ থাকলে স্ত্রীকে অবশ্যই একটি পৃথক ঘর, একটি আলমা ং দু'একজন কাজের লোক দিতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ। এম ার ঘরে অন্য কেউ প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) নারীদেরকে অতি উচ্চ সম্মান প্রদান করেছেন। নারীদের নামে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা মরিয়াম এবং সূরা নেসা অবতীর্ণ করেছেন। নারীদের সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে যখন প্রশ্ন করা হয়েছে, সেই প্রশ্নের জবাবও স্বয়ং আরশে আযীমের মালিক মহান আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে দিয়েছেন–

يَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ–

"হে নবী! তারা তোমার কাছে নারীদের ব্যাপারে 'ফতোয়া' জানতে চায়, তুমি তাদের বলো, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে 'ফতোয়া' দিচ্ছেন।" (সূরা নিসাঃ ১২৭)

উল্লেখিত আয়াতটি বেশ বড় আয়াত এবং এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা নারীদের উচ্চ সম্মান-মর্যাদা ও ফযিলতের বিষয় আলোচনা এবং নানা ধরণের 'মাসআলা'র অবতারণা করে নিজেই ফতোয়া দিয়েছেন। সমগ্র সৃষ্টি জগতের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে নারী সম্পর্কে স্বয়ং ফতোয়া দিয়েছেন, সেই নারীর সম্মান-মর্যাদা যে কত উচ্চে তা কল্পনাও করা যায় না। আর সেই নারীই পুরুষের স্ত্রী তথা জীবন সঙ্গিনী হিসেবে পিতামাতা, ভাইবোন এবং আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে অপরিচিত পরিবেশে পৃথক একটি সংসারে প্রবেশ করে, তাকে অবশ্যই সম্মান-মর্যাদা দিতে হবে। পবিত্র কোরআনে অনেক জায়গায় বলা হয়েছে, 'স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করো।'

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, 'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে উত্তম এবং আমি আমার স্ত্রীদের কাছে উত্তম।' তিনি আরো বলেছেন–

شَرُّ النَّاسِ الْمُضَيِّقُ عَلٰى أَهْلِهِ–

"মানুষের মধ্যে সবথেকে খারাপ লোক হলো সেই ব্যক্তি, যে নিজের পরিবার-পরিজনের সাথে অহেতুক খারাপ ব্যবহার করে।" (তাবারাণী)

قَالُوْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَكُوْنُ مُضَيِّقًا عَلٰى أَهْلِهٖ قَالَ الرَّجُلُ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ خَشَعَتْ اِمْرَأَتُهُ وَهَرَبَ وَلَدُهُ وَفَرَّ فَاِذَا خَرَجَ ضَحِكَتْ اِمْرَأَتُهُ وَاسْتَأْنَسَ أَهْلُ بَيْتِهٖ

"সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! মানুষ নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে কিভাবে খারাপ হিসেবে চিহ্নিত হয়? নবী করীম (সাঃ) জবাবে বললেন, সে যখন বাড়িতে প্রবেশ করে তখন স্ত্রী ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং সন্তান-সন্ততি ভয়ে তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। আর সে যখন বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় তখন স্ত্রী স্বাচ্ছন্দ বোধ করে এবং সন্তান-সন্ততির আতঙ্ক ও জড়তা কেটে যায়।" (ফয়যুল কাদীর, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫৯)

সুতরাং বাড়ির কর্তাকে স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির জন্যে বিরক্তিকর, অপসন্দনীয় ও ভীতিকার আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। বাইরের ঝামেলা বাইরে রেখে হাসিমুখে বাড়িতে প্রবেশ করে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে সাথে নিয়ে এক আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। অভাব-অভিযোগ সকল সংসারেই রয়েছে এবং আমাদের দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে অভাবী লোকজনের সংখ্যাই অধিক। এ জন্যে অল্পে তুষ্ট থেকে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে এবং অভাবকে দূরে নিক্ষেপ করে আনন্দকে প্রাধান্য দিতে হবে। অভাব বা বাইরের কোনো জটিলতার কারণে রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে স্ত্রী-সন্তানের সাথে খারাপ আচরণ করা বড় ধরণের গোনাহের কাজ।

নবী করীম (সাঃ)-এর সংসারে অভাব ছিলো নিত্য সাথী। দিনের পর দিন মাসের পর মাস তাঁর সংসারে উনুনে হাড়ি উঠতো না। ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি বাইরে থেকে বাড়িতে এসেছেন, দেখলেন এখন পর্যন্ত খাদ্য প্রস্তুত হয়নি। কিন্তু তিনি কখনো এ জন্যে স্ত্রীদের কাছে কৈফিয়ত তলব করেননি। চোখ লাল করে কারো দিকে তাকাননি। সহযোগিতা করার জন্যে দ্রুত স্ত্রীদের কাছে বসে গিয়েছেন।

অভাবের কারণে মেজায সপ্তমে চড়িয়ে রেখে স্ত্রী-সন্তানদের সাথে খারাপ আচরণ করে গোনাহের পাল্লা ভারী করা ঈমানদারের চিহ্ন নয়। নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসারী হিসেবে সকল অবস্থাতেই পরিবারে শান্তি বজায় রেখে স্ত্রী-সন্তানদের সাথে হাসিমুখে কথা বলে আমলনামা সওয়াবে পরিপূর্ণ করাই ঈমানের পরিচয়। নবী করীম (সাঃ) স্ত্রীর সাথে ভদ্রজনোচিত, নম্র ও বিনয়ী আচরণ করার জন্যে বিদায় হজ্জের ভাষণেও গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন—

أَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا أَلاَ اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَاءِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَاءِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا–

"অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শোনো! নারীদের ব্যাপারে সবসময় উত্তম ও কল্যাণকার অসিয়ত এবং উপদেশ দিচ্ছি। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনো! তোমাদের পুরুষগণের যেমন নারীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনি অধিকার রয়েছে তোমাদের ওপর তোমাদের স্ত্রীদের।" (ইবনে মাজাহ্, হাদীস নাং ১৮৫১, তিরমিযী, হাদীস নং-১১৬৩)

স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, এ অবস্থা বিরাজ করতে থাকলে উভয়ের আমলনামা সওয়াবে পরিপূর্ণ হতে থাকবে। এমনকি এই অবস্থায় যে স্ত্রী ইন্তেকাল করবে, তার জন্যে নবী করীম (সাঃ) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন–

أَيُّمَا اِمْرَاَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ–

"যে স্ত্রী এমন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছে যে, তার প্রতি তার স্বামী সন্তুষ্ট ছিলো, তাহলে সে স্ত্রী জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী, হাদীস নং-১১৬১, ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং-১৮৫২)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) স্বামীদের তুলনায় স্ত্রীদের জন্যে জান্নাতে প্রবেশ করা সহজ করে দিয়েছেন। পৃথিবীর সকল কঠিন বা শারীরিক পরিশ্রমের কাজগুলোর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন পুরুষদের ওপর আর নারীদেরকে বানিয়েছেন সংসার রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। সেই সাথে এ সুসংবাদ দিয়েছেন–

اِذَا صَلَّتِ الْمَرْاَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ–

"যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, রমজানের রোজা পালন করবে, নিজের সতীত্ব, সম্মান-সম্ভ্রম হেফাজত করবে এবং নিজের স্বামীর আনুগত্য করবে, কিয়ামতের দিন সেই নারীকে বলা হবে, তুমি জান্নাতের আটটি দরজার মধ্যে যে দরজা দিয়ে খুশী জান্নাতে প্রবেশ করো।" (মুসনাদে আহ্মাদ, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪১, মাজমাউ'য যাওয়ায়েদ, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৬)

মহান আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় বাক্য

হাদীসে অনেক তাস্বীহ ও তাহ্লীল সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উক্ত তাস্বীহ্-এর ফযিলতও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু দুটো বাক্য সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, এ দুটো বাক্য মহান আল্লাহর কাছে সবথেকে বেশী প্রিয় এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের তুলনায় ওজনে অনেক ভারী। নবী করীম (সাঃ) পক্ষ থেকে একটি হাদীসে বলা হয়েছে–

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ، قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ، سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, এমন দুটো কথা রয়েছে, যা মেহেরবান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। কথা দুটো উচ্চারণ করা খুবই সহজ কিন্তু ওজনে সীমাহীন ভারী। কথা দুটো হলো, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম। মহাপবিত্র আল্লাহ, তাঁর জন্য যাবতীয় প্রশংসা। মহাপবিত্র আল্লাহ, তিনি মহামহিম, সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন।" (বোখারী, হাদীস নং-৭৫৬৩, মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯৪)

মহান আল্লাহর রবুবিয়াত, উলুহিয়াত এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ় ঈমান করে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রশংসা করে– সেই প্রশংসা যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবথেকে বেশী পসন্দ করেন, তেমনি উক্ত ব্যক্তিও তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয় বান্দাদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তির সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যে বক্তি সবথেকে বেশী তাহ্মীদ ও তাস্বীহ বর্ণনা করতে থাকে অর্থাৎ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী এবং সুবহানাল্লাহিল আযিম, এই ছোট্ট বাক্যটি– যার মধ্যে তাস্বীহ ও তাহ্মীদ রয়েছে।

উক্ত বাক্যটির মধ্যে তাস্বীহ দুই বার, তাহ্মীদ একবার এবং মহান আল্লাহর সর্বোচ্চ সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কিত 'আযিমাত' শব্দের মূল ধাতু যে 'আযিম' শব্দটি, সেটিই এক বার ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম বোখারী (রাহঃ) বোখারী শরীফ রচনাকালে এই হাদীসটি বোখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীস হিসেবে সংযোজন করেছেন। হাদীস সম্পর্কে যাদের ধারণা রয়েছে, তারা জানেন যে, বোখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদীস

হলো, নিয়ত তথা ইখলাস বা আন্তরিকতা- একনিষ্ঠতা সম্পর্কে। উক্ত হাদীসটি হলো, হযরত আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস লাইসী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি শুনেছি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) মসজিদের মিম্বারের ওপরে আরোহণ করে বলছিলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, সকল কাজই নিয়ত অনুসারে হয়। আর সকল ব্যক্তি যা নিয়াত করে তাই লাভ করে। সুতরাং যার হিজরাত পৃথিবীর ধন-সম্পদ অর্জনের বা কোনো মেয়েকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হয়েছে তার হিজরাত সে লক্ষ্যেই হয়েছে। (বোখারী, হাদীস নং-১)

বোখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদীস হলো উদ্দেশ্যের একনিষ্ঠতা সম্পর্কে। মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে সকল কাজ করা হয়, সে সকল কবুল হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করবে নিয়াতের ওপরে। আমল কবুল হবার অন্যান্য শর্ত পালিত হলে আমলের নিয়ত যদি একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়, তাহলে সে আমল মহান আল্লাহ কবুল করবেন। আর যদি আমলটি প্রদর্শনীমূলক হয়, নাম-যশ, খ্যাতি, বীরত্ব, প্রশংসা অর্জন ইত্যাদির জন্যে হয়, তাহলে সে আমল আল্লাহ কবুল করবেন না।

বোখারী শরীফে সর্বপ্রথমে নিয়ত সম্পর্কিত হাদীস এবং সর্বশেষে মহান আল্লাহর তাস্‌বীহ সম্পর্কিত হাদীস সংযোজন সম্পর্কে বিশিষ্ট হাদীস বেত্তাগণ বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি নিজের সকল বৈধ কাজের সূচনায় মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়ত করে, তাহলে সেই মুসলমানের জন্যে সকল কাজেই আল্লাহ তা'য়ালা শুভ পরিণতি দান করেন এবং সে ব্যক্তির ইন্তেকালও হয় ঈমানের সাথে। শুধু তাই নয়, নিয়তের একনিষ্ঠতার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সেই বান্দার জন্যে তাঁর প্রশংসা করাও সহজ করে দেন।

সুতরাং মহান আল্লাহ তা'য়ালা যতক্ষণ হায়াতে রেখেছেন, ততক্ষণ মহান আল্লাহর গোলামীর জীবন-যাপনের মাধ্যমে সবসময় আল্লাহর প্রশংসা সূচক শব্দসমূহ অত্যন্ত মহব্বতের সাথে মুখে উচ্চারণ করতে হবে। 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম' খুবই ছোট্ট বাক্য এবং সহজেই যা উচ্চারণ করা যায়। এ দুটো বাক্য উচ্চারণ করলে আল্লাহ তা'য়ালা খুশী হয়ে আমলনামা সওয়াবে পূর্ণ করে দিবেন। সমগ্র সৃষ্টি এবং এই মহাবিশ্ব এক পাল্লায় রাখলে আর উক্ত বাক্যটি এক পাল্লায় রাখলে ওজনে বাক্যটির পাল্লা বেশী ভারী হবে।

আমরা মানুষ, কম বেশী সকলেই গোনাহ্‌গার। মানুষ গোনাহ্ করবে, কারণ গোনাহের প্রবণতা দিয়েই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ গোনাহ্ করবে এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করবেন। এ কারণেই তো মহান আল্লাহ

গুণবাচক নাম গ্রহণ করেছেন, রহমান, রাহীম, গাফ্ফার, কারীম- দয়ালু, দাতা, ক্ষমাশীল, ক্ষমাকারী, করুণাময়, মেহেরবান, তাওবা কবুলকারী ইত্যাদি। গোনাহ্গারদের জন্যে হতাশ হবার কোনো কারণ নেই, হতাশাবাদীকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন না এবং হতাশ হওয়াকে কুফরী হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বান্দাদেরকে ডাক দিয়ে বলেছেন, 'আমার রহমত থেকে হতাশ হয়ো না। তোমার গোনাহ্ যদি যমীন থেকে আকাশ স্পর্শ করে, তাহলে আমার রহমত আকাশকেও অতিক্রম করে গিয়েছে। তোমার গোনাহ্ যদি এর থেকেও বেশী হয়, তাহলে আমার রহমত সমগ্র সৃষ্টি জগতকে পরিবেষ্টিত করে রয়েছে। তুমি ভুল করেছো, আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি ক্ষমা করে দিবো। তুমি গোনাহ্ করেছো, তাওবা করো আমি তাওবা কবুল করবো। তুমি আমার বান্দা, আমি তোমাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবে সৃষ্টি করেছি। আমি তোমাকে জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করিনি, জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করেছি। জাহান্নামের পথে গিয়েছো, কোনো ভয় নেই। এখনো সময় রয়েছে, তুমি তাওবা করে জান্নাতের পথে ফিরে এসো। তুমি আমার দিকে এক হাত পরিমাণ ফিরে এলে আমার রহমত তোমার দিকে দুই হাত পরিমাণ এগিয়ে যাবে।'

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) তাঁর রবের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ বলেন– বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে এক বাহু পরিমাণ অগ্রসর হই। সে যখন আমার দিকে এক বাহু পরিমাণ এগিয়ে আসে আমি তখন তার দিকে দু'বাহু পরিমাণ অগ্রসর হই। বান্দা যদি আমার কাছে হেঁটে আসে, আমার রহমত তার দিকে দৌড়ে যায়। (বোখারী)

মানুষ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলে যতটা খুশী হয়, তার থেকে অধিক খুশী হন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন তাঁর কোনো বান্দা গোনাহের পথ ত্যাগ করে তাঁরই দিকে ফিরে আসে অর্থাৎ তাওবা করে। সুতরাং আসুন, আমরা সকলেই তাওবা করে অঙ্গীকার করি, আর কখনো ইচ্ছা করে গোনাহের কাজ করবো না এবং নেক আমলের মাধ্যমে নিজের আমলনামা সওয়াবে পরিপূর্ণ করবো।

এ কথা আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে স্মরণে রাখতে হবে, কিয়ামতের ময়দানে নেক আমল ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই উপকারে আসবে না। অতএব কোরআন-হাদীসের আলোকে এ গ্রন্থে বর্ণিত নেক আমলসমূহ আঞ্জাম দিয়ে কিয়ামতের ময়দানে নিজের নাজাতের ব্যবস্থা যেনো করতে পারি, আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

একটি আকর্ষণীয় হাদীসে কুদ্সী

১। হযরত আবু যর (রাঃ) বর্ণনা করেন নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, হে আমার বান্দারা! আমি আমার প্রতি 'জুলুম' হারাম করেছি এবং তোমাদের একের প্রতি অন্যের জুলুম করাও হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং একে অন্যের প্রতি জুলুম করো না।

২। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত, সেই ব্যক্তি ব্যতীত যাকে আমি হিদায়াত দিই। অতএব আমার কাছে হিদায়াত চাও, আমি তোমাদের হিদায়াত দান করবো।

৩। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত– সে ব্যতীত যাকে আমি খাওয়াই। অতএব আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদের খেতে দিবো।

৪। হে বান্দাগণ! তোমরা সকলেই বিবস্ত্র, সে ব্যতীত– যাকে আমি বস্ত্র পরিধান করাই। অতএব আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদের পরিধান করাবো।

৫। হে আমার বান্দারা! নিঃসন্দেহে তোমরা দিবারাত্রি গোনাহের কাজে লিপ্ত রয়েছো। আমি তোমাদের গোনাহ্ ক্ষমা করে দেই। অতএব আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিবো।

৫। হে আমার বান্দারা! বিশ্বাস করো তোমরা আমার কোনো অকল্যাণ করতে কখনো আদৌ উপযুক্ত নও– যদ্বারা তোমরা আমার অকল্যাণ করবে। আর এ কথাও স্মরণে রেখো, তোমরা আমার কোনো কল্যাণ সাধনেও আদৌ উপযুক্ত নও, যদ্বারা আমার কোনো কল্যাণ করতে পারো।

৬। হে আমার বান্দারা! এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তোমাদের পূর্বে গত হয়ে যাওয়া এবং তোমাদের পরে যারা আসবে, এ সকল মানুষ ও জ্বীন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুত্তাকীর মতো তোমাদের সকলের হৃদয়-মন মানসকিতা যদি মুত্তাকী হয়ে যায়, তাতে আমার রাজত্বে কণা পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি হবে না।

৭। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বে গত হয়ে যাওয়া এবং তোমাদের পরে যারা আসবে, এ সকল মানুষ ও জ্বীন সম্প্রদায়ের মধ্যে সবথেকে নিকৃষ্ট পাপী ব্যক্তির মতো তোমাদের সকলের হৃদয়-মন মানসকিতা যদি পাপাসক্ত হয়ে যায়, তাতে আমার রাজত্বে কণা পরিমাণ কিছু হ্রাস পাবে না।

৮। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বে গত হয়ে যাওয়া এবং তোমাদের পরে যারা আসবে, এ সকল মানুষ ও জ্বীন সম্প্রদায় কোনো উন্মুক্ত ময়দানে একত্রিত হয়ে

আমার কাছে চাইতে থাকো আর আমি তোমাদের প্রত্যেকের চাহিদা পূরণ করতে থাকি, এতে করে আমার অফুরন্ত ভান্ডার থেকে ঠিক ততটুকুই হ্রাস পাবে, একটি সূঁচ সমুদ্রে ডুবিয়ে উঠিয়ে আনলে সমুদ্রের পানি যতটুকু হ্রাস পায়।

৯। হে আমার বান্দারা! পরকালীন জীবনে তোমাদের পুরস্কার ও শাস্তি যেটাই হবে তা সবই তোমাদের কর্মের পরিণতি। আমি তোমাদের কর্মসমূহ হিসাব করে সংরক্ষণ করি এবং এসব কর্মের পরিপূর্ণ বিনিময় প্রদান করা হবে।

১০। অতএব তোমাদের মধ্যে যারা নেক আমল দিয়ে নিজেদের আমলনামা সমৃদ্ধ করতে পারবে, তারা বেশী বেশী আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। এর বিপরীত যারা– তাদের উচিত নিজের নফ্সকে ধিক্কার দেয়া। (মুসলিম)

دعائے دل وآرزوئے دل

اَللّٰهُمَّ لاَ تُعَذِّبْ لِسَانًا يَخْبِرُ عَنْكَ وَلاَ عَيْنًا تَنْظُرُ اِلٰى عُلُوْمٍ تَدُلُّ عَلَيْكَ وَلاَ قَدَمًا تَمْشِىْ اِلٰى خِدْمَتِكَ وَ عِبَادَتِكَ وَلاَ يَدًا تَكْتُبُ حَدِيْثَ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَبِعِزَّتِكَ لاَ تُدْخِلْنِى النَّارَ، فَقَدْ عَلِمَ اَهْلُهَا اَنِّىْ كُنْتُ اَذُبُّ عَنْ دِيْنِكَ– (امام ابن الجوزي)

"হে আল্লাহ! ঐ সকল জিহ্বাসমূহকে তুমি শাস্তি দিও না, যে সকল জিহ্বা অন্যের কাছে তোমার বাণী পৌঁছাতো। ঐ চোখসমূহকে তুমি শাস্তি দিও না, যে সকল চোখ তোমার বাস্তব নিদর্শনের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতো। ঐ সকল পা-সমূহকে তুমি শাস্তি দিও না, যে সকল পা তোমার দ্বীনের খেদমতে ও তোমার দাসত্বের লক্ষ্যে চলাফেরা করতো। ঐ হাতসমূহকে তুমি শাস্তি দিও না, যে সকল হাত তোমার রাসূল (সাঃ)-এর বাণীসমূহ লেখার কাজে নিয়োজিত থাকতো। হে আল্লাহ! তোমার সম্মান-মর্যাদার শপথ! আমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করায়ো না, কারণ জাহান্নামের অধিবাসীগণও জানতো যে, আমি তোমার দ্বীনের প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলাম।" (আল্লামা ইবনুল জাওযী রহঃ)

وَ اللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ-

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا حَبِيْبِنَا وَحَبِيْبِ رَبِّنَا وَطَبِيْبِ اَرْوَاحِنَا وَقُلُوْبِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ اَجْمَعِيْنَ-

সহায়িকা গ্রন্থপঞ্জী

১। কোরআনুল কারীম
২। সহীহ্ আল বোখারী
৩। সহীহ্ মুসলিম
৪। সহীহ্ তিরমিযী
৫। সহীহ্ ইবনে মাযাহ্
৬। সহীহ্ আবু দাউদ
৭। সহীহ্ নাসাঈ
৮। মুসনাদে আহ্মাদ
৯। তাফসীরে ইবনে কাসীর
১০। তাফসীরে কুরতুবী
১১। তাফসীরে বাগাবী
১২। তাফহীমুল কোরআন
১৩। ফী যিলালিল কোরআন
১৪। তাফসীরে উসমানী
১৫। আল আ'মালুল মাইসারাহ্
১৬। জামেউস সাগীর
১৭। সহীহ্ আল জামে'
১৮। উমদাতুল কারী
১৯। ফতহুল বারী
২০। ফতহুল কাদীর
২১। জাযাউল আ'মাল
২২। কানযুল উম্মাল
২৩। তাবারাণী
২৪। আত তারগীব ওয়াত্ তারহীব
২৫। ইবনু হাব্বান
২৬। ইবনে খুজাইমাহ্
২৭। মুস্তাদরাকে হাকেম
২৮। ফাইযুল কাদীর
২৯। সহীহ্ আল আয্কার
৩০। মাদারেজুস সালেকীন
৩১। আল বায্যার
৩২। আল মুফ্রাদাত
৩৩। মাআ'লিমুত তানযীল লিল বাগাবী
৩৪। সুনানুদ দারেমী
৩৫। আল আদাবুল মুফরাদ লিল বোখারী
৩৬। মাজমাউজ যাওয়ায়েদ

বিশ্বের অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাস্সীর

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

কর্তৃক রচিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থসমূহের কয়েকটি

তাফসীর বিষয়ক

১। তাফসীরে সাঈদী সূরা আল ফাতিহা

২। তাফসীরে সাঈদী সূরা আল আসর

৩। তাফসীরে সাঈদী সূরা লূকমান

৪। তাফসীরে সাঈদী- আমপারা

৫। তাফসীরে আয়াতুল কুরসী

৮। তা'লীমুল কোরআন-১

৯। তা'লীমুল কোরআন-২

১০। বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন-১

১১। বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন-২

১২। মানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন

ইবাদাত বিষয়ক

১৩। আল কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ

১৪। আল কোরআনের মানদন্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা

১৫। সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) অনুসরণের সঠিক পদ্ধতি

১৬। আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার দাবী

১৭। হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন

১৮। চরিত্র গঠনে নামাজের অবদান

১৯। আখিরাতের জীবন চিত্র

২০। যিয়ারতে বায়তুল্লাহ

২১। নাজাতের পথ

নারী ও শিশু বিষয়ক

২২। মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে-১

২৩। মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে-২

ইসলামী আন্দোলন বিষয়ক

রাজনীতি বিষয়ক

ইতিহাস বিষয়ক

ফাযায়েল বিষয়ক

বিজ্ঞান বিষয়ক

বিবিধ

জান্নাত লাভের সহজ আমল

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী